মুক্তিসংগ্রামে জনসেনা

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্রালয়

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা চার আনা

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রভু প্রেস, ৩০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

রাজনৈতিক জীবনে আদর্শের প্রেরণা থাকা ভাল, কিন্তু উচ্ছ্বাস মারাত্মক। উচ্ছ্বাসের বাষ্পে চলার পথ আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। বাগাড়ম্বর ও অহেতুক দাপাদাপিতে কেবল শক্তিক্ষয়ই হয়, সুফল ফলে না। শক্তিসঞ্চয়ের পথ সংযম, আর সঞ্চিত শক্তিকে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থায় পরিচালিত করতে পারলেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। তাই সংগ্রাম পর্বের আগে চাই উদ্যোগ পর্ব এবং তারও আগে দরকার অজ্ঞাতবাস পর্বের ; সেই পর্বে কেবল নীরব সাধনা, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণ এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মশক্তি সঞ্চয়। কালবোশেখীর একখণ্ড কালোমেঘেব অন্তরে যেমন থাকে তাণ্ডবের প্রচণ্ড শক্তি, তেমনি জাতীয় জীবন বাইরে স্থির, অচঞ্চল থাকলেও তার অন্তরে নিহিত থাকবে তপস্যালব্ধ এক মহাশক্তি। সেই শক্তি যেদিন রুদ্ররূপে দেখা দেবে সেদিন মহাঝঞ্ঝার কৃষ্ণমেঘেব ন্যায় তা ক্রমবিস্তার লাভ করে সমগ্র দেশে সৃষ্টি করবে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ; তার দুর্বার ধারাকে রোধ করবে কে !

আমাদের জাতীয় জীবনে সেই তপশ্চর্যা আমরা করেছি কিনা, কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার মতো শক্তিসঞ্চয় আমাদের হয়েছে কিনা, প্রয়োজন হলে আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা সহ্য করবার মতো মনোবল আমরা অর্জন করেছি কিনা, ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টির স্বার্থকে, স্বীয় পরিবারের চেয়ে জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখতে শিখেছি কিনা—এসমস্ত বিচার করবার দিন আমাদের উপস্থিত। তা যদি না হয়ে থাকে, তবে আজ আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো সেই প্রস্তুতির জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। তাতে বাহবা মিলবে না, ফুলের মালা জুটবে না, সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে নাম ছাপা হবেনা, জনসমুদ্রের মাঝে হাততালি পাওয়া যাবেনা—একান্তে নীরবে নিরলসভাবে সেবার দ্বারা আত্মত্যাগের দ্বারা

জাতির জীবনে শক্তিসঞ্চার করতে হবে। কেবল একটা ক্ষুদ্র অংশে নয়, সমগ্র জাতির জীবনেই সেই শক্তি সঞ্চারিত হওয়া দরকার। পরাধীনতা অসহ্য সন্দেহ নেই; কিন্তু অধৈর্য হলেই স্বাধীনতা আসে না। তপস্যা করে তার জন্যে শক্তি অর্জন করতে হয়। কর্মই হলো তপস্যা।

বিপ্লবে ব্যতিক্রম আছে, সে বাঁধাধরা পথে আসে না একথা সত্য; কিন্তু সকল বিপ্লবের মূলেই থাকে একটি করে অখণ্ড ধারা। সুতরাং আমরা যখন বিপ্লবের কথা বলি তখন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সেই মৌলিক অখণ্ড ধারাটি কি তাই জানা দরকার। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়েই এই অখণ্ড ধারা প্রবাহিত হয়েছে। কংগ্রেসকে সম্মুখে রেখেই ভারতবাসীরা বৈদেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছে। তাই কংগ্রেস কোন দল বিশেষে পরিণত না হয়ে মুক্তকাম সর্বদলের মিলনক্ষেত্র বলে গণ্য হয়ে এসেছে। কংগ্রেসের মধ্য দিয়েই ভারতের মর্মবাণী ব্যক্ত হয়েছে, সে বাণী শ্রেণীবিশেষের নয়, জনগণের। তাই বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে-আন্দোলনের সৃষ্টি তা থেকেই আবার গণমুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিই আজ আর যথেষ্ট নয়, দেশের জনগণের মনে শ্রেণী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্ন উঠেছে বলেই কংগ্রেস থেকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে হয়েছে, কিষাণ ও-মজদুর-রাজই হলো কংগ্রেসের কাম্য। মহাত্মাজীও আর এ প্রশ্নে নীরব থাকতে পারেননি, তাঁকেও একথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়েছে। আমরা যে-বিপ্লবের প্রতীক্ষা করছি, এটাই হলো তার মূল ধারা, এটাই হলো অখণ্ড প্রবাহ। এ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমাদের কোন আন্দোলনই যথার্থ মুক্তি আনতে পারবেনা; দেশের জনগণ তাতে সাড়া দেবে না।

এখন কথা হলো—বলাই সব নয়, করাও দরকার। কংগ্রেস থেকে যে-গণমুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছে তাকে সার্থক করে তুলবে কে? একমাত্র বামপন্থী দলগুলি সংহত হলেই কংগ্রেসকে এই বৈপ্লবিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিষাণ ও শ্রমিকদের মনে যদি এই প্রত্যয় জন্মানো যায় যে, কংগ্রেসের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়েই আসবে শ্রেণী-শোষণ থেকে মুক্তি তবেই তারা অকাতরে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবে। যারা শ্রমিকদের মধ্যে কিষাণদের মধ্যে থেকে কাজ করছে শুধু তারাই এই প্রত্যয় জন্মাতে পারে। সুতরাং শ্রমিক ও কিষাণ নেতারাই যদি কংগ্রেসে স্থান না পান তবে কংগ্রেস তার নিজস্ব বৈপ্লবিক ধারা হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়বে এবং স্থিতিশীল দক্ষিণপন্থী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এই অবস্থা থেকে কংগ্রেসকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র বামপন্থী দলগুলির সংহতি।

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম চালনার জন্যে আমাদের জাতীয় জীবনে যে ঐক্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন সেই ঐক্য ও দৃঢ়তা আনয়নের পথনির্দেশে অন্যান্য দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস খানিকটা সাহায্য করতে পারে সেই আশায়ই এই বই লেখা। অসম্পূর্ণ হলেও এই ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে একটি মূল ধারা খুঁজে বের করা হয়তো কষ্টকর হবেনা। আমাদের চলার পথে তা যদি সামান্য সাহায্যেও আসে তাতেই আমার শ্রম সার্থক হবে। ইতি—

কলিকাতা
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্যে যাঁর কাছে রাজনীতিতে
হাতেখড়ি হয়েছিল সেই মহাপ্রাণ
স্বর্গীয় ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে
উৎসর্গ করলাম



মুক্তিসংগ্রামে জনসেনা

আধুনিক যুদ্ধের গতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা গেরিলা-যুদ্ধ বা জনসেনার স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে বহুবিধ খবর পেয়েছি। বিভিন্ন দেশের জনযুদ্ধ সম্বন্ধে এমন সব চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে যে, সত্যি তা ভাবতে . েলে বিস্মিত হতে হয়। আত্মত্যাগ, স্বদেশপ্রেম, শৌর্যবীর্য, বীরত্ব ও ..াবলের অপূর্ব দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব এই অধ্যায় সমুজ্জ্বল। বিভিন্ন দেশে এই প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক সমন্বয় এবং সামবিক সংগঠনের যে পবিচয় পাওয়া গেছে, ঐতিহাসিক শিক্ষার দিক দিয়ে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীনেব গেরিলা-যুদ্ধ জগতে জনযুদ্ধের দিক দিয়ে আদর্শস্থল; কিন্তু ইওরোপে জার্মান-কবলিত দেশগুলিতে ফাসিস্ত ও নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে জনসেনার অভ্যুত্থানের ইতিহাসও কম বিস্ময়কর নয়। দুর্ধর্ষ জার্মান শক্তির কবলে থেকেও ইওরোপের ছোট বড় রাষ্ট্রের গণশক্তি কিভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনকে গড়ে তোলে এবং নাৎসী ও ফাসিস্তদের নানাভাবে বিব্রত করে, তা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এর পেছনে রয়েচে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা; আর এই জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক সামরিক সত্য। এখানে এই সামরিক সত্যটি সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা

করব ; কেননা সুসজ্জিত যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গেও কিভাবে নিরস্ত্রপ্রায় জনগণের যুদ্ধ করা সম্ভব হলো, তা যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে এই সামরিক সত্যটিকে জানা একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ট্যাঙ্ক ও বিমান। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইতালী ও জার্মানীর অস্ত্রসাহায্য পেয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কো যখন ট্যাঙ্ক ও বিমানবলে প্রাধান্য লাভ করেন, তখনি স্পেনের রিপাব্লিকান বা প্রজা-তন্ত্রী দলের লোক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে যে, ট্যাঙ্ক এবং বিমান না থাকলেও প্রতিপক্ষের যান্ত্রিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা চলে। স্পেনের রিপাব্লিকান পক্ষ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে কতক ট্যাঙ্ক এবং বিমান সাহায্য পেয়েছিল সত্য, কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইতালী ও জার্মানীর কাছ থেকে যে পরিমাণ ট্যাঙ্ক ও বিমান সাহায্য পেয়েছিলেন, তার তুলনায় সোভিয়েট-সাহায্য ছিল অপ্রচুর। ইতালী ও জার্মানীর তুলনায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দূরত্ব ও চলাচল-পথের দিক দিয়ে স্পেনে সাহায্য পাঠানো অসুবিধেজনক তো ছিলই ; তদুপরি ফ্রান্স ও বৃটেনের তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে সোভিয়েট-সাহায্য এসে স্পেনের রিপাব্লিকানদের হাতে না পৌছাতে পারে। এই সব কারণে অস্ত্রবলের দিক দিয়ে স্পেনের রিপাব্লিকানরা ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীনবল হয়ে পড়ে ; কিন্তু স্পেনের রিপাব্লিকান গবর্ণমেণ্টের পেছনে ছিল তথাকার গণশক্তি। অস্ত্রবল কম থাকলেও এই গণশক্তি মনোবলে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর চেয়ে অধিকতর বলীয়ান ছিল। সেজন্যে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে বেশী বিমান এবং ট্যাঙ্ক দেখেও তাদের যুদ্ধস্পৃহা দমে গেল না ; তারা উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেল যে ট্যাঙ্ক ছাড়াও কিভাবে প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করা চলে এবং প্রচ্ছন্নভাবে থেকে কি কি করে প্রতিপক্ষের বিমানহানা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। এ

থেকেই সেখানে গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। অবশ্য স্পেনের রিপাব্লিকান পক্ষের বিমানধ্বংসী ও ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান না ছিল এমন নয়। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীকে ঠেকাবার পক্ষে সেগুলো পর্যাপ্ত ছিল না। কাজেই প্রতি-পক্ষের ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রিপাব্লিকান যোদ্ধাদের নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। ট্যাঙ্ক-আক্রমণ থেকে তারা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টাই করেনি; ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান ছাড়াও মাইন, হাতবোমা, পেট্রলপূর্ণ বোতল প্রভৃতির সাহায্যে কিভাবে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা যায়, তা পরীক্ষা ক'রে দেখতে আরম্ভ করে এবং অল্প-দিনের মধ্যেই তারা এদিকে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। উত্তরকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশের গেরিলা-যুদ্ধে ট্যাঙ্কধ্বংসের এই কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অধিকৃত দেশগুলিতে অ্যাক্সিস সাঁজোয়া বাহিনীকে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছে।

এই রণকৌশল সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হ'লে আধুনিক পদাতিক বাহিনীর প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো এই: (১) মোটরযানে পদাতিক বহনের ব্যবস্থা এবং সাঁজোয়া বাহিনীর সঙ্গে পদাতিক বাহিনীর ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা; (২) ট্যাঙ্ক-শিকার ও ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি; এবং (৩) গেরিলাযুদ্ধের প্রণালী ও কৌশল আয়ত্ত করা। মোটরযানে পদাতিক প্রেরণের ব্যবস্থা এতটা উন্নত হয়েছে যে, আজকাল বিস্তর পদাতিক ট্যাঙ্কবাহিনীর সঙ্গে সমান গতিতেই অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু মোটর-বাহিত পদাতিকদের একটা অসুবিধে হলো এই যে, প্রতিপক্ষ মেশিন-গান দাগতে সুরু করলেই তাদের গাড়ী থেকে নেমে পড়তে হয় এবং তখন তাদের হামাগুড়ি দিয়ে এগুনো ছাড়া উপায় থাকে না। এই জন্যে সোভিয়েট সৈন্যরা ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

অক্ষুণ্ণ রাখবার উদ্দেশ্যে তুষারময় অঞ্চলে ট্যাঙ্কের পেছনে বেঁধে পদাতিক-পূর্ণ বহু সাঁজোয়া স্লেজ্ গাড়ী টেনে আনে ; এ ছাড়া সেখানে সোভিয়েট ট্যাঙ্কগুলির মধ্যেও কতক কতক মেশিনগান-চালক এবং অটোমেটিক রাইফেল্‌ধারী সৈন্য বসিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। বর্মাচ্ছাদিত ব্যবস্থায় এভাবে পদাতিক সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা ক্রমশ উন্নতিলাভ করছে ; কিন্তু জার্মান সমর-বিশেষজ্ঞদের নজর গোড়ায় এদিকে না পড়ায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের আক্রমণে অগ্রগামী ট্যাঙ্কবাহিনী থেকে জার্মান পদাতিকদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নাজেহাল হতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, ট্যাঙ্কবাহিনী থেকে পদাতিক বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করতে হ'লে প্রচ্ছন্ন অবস্থা হতে অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে তা করাই সর্বাপেক্ষা সুবিধেজনক। এই জন্যেই যে দেশে গেরিলাযুদ্ধ যত প্রবল, সেই দেশে জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী তত বেশী বিপর্যস্ত হয়েছে ; কেননা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ চালানোই গেরিলা-যুদ্ধের প্রধান কৌশল।

পদাতিক ও ট্যাঙ্কবাহিনীর মধ্যে চরম শক্তিপরীক্ষা হয়েছে কি না আজো পর্যন্ত নিশ্চয় করে বলা যায় না। ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে পদাতিক নিয়োগ করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও অনেকদিন পর্যন্ত একটা ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছিল এবং সেজন্যেই ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেল ও ট্যাঙ্কধ্বংসী ছোট কামান প্রভৃতি এমন সব অস্ত্র পদাতিক বাহিনীকে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলির সাহায্যে কেবল দূর থেকেই ট্যাঙ্ক ঘায়েল করা চলতো ; অর্থাৎ পদাতিক বাহিনীর ট্যাঙ্কধ্বংসী প্রধান অস্ত্রই ছিল রাইফেল ও কামান। কিন্তু কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করতে হ'লে যত কাছে গিয়ে আক্রমণ করা যায় ততই সুবিধে। ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে আক্রমণ চালাতে হ'লে পদাতিকদের এমন শিক্ষা থাকা দরকার যাতে তারা প্রচ্ছন্নভাবে ট্যাঙ্কের নিকটে এগিয়ে যেতে পারে। ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে উগ্র-বিস্ফোরকের সাহায্যে আক্রমণ

চালাতে সুবিধে ; তা ট্যাঙ্কধ্বংসী গ্রেনেড্ বা ট্যাঙ্কধ্বংসী মাইনও হ'তে পারে—অথবা উগ্র বিস্ফোরকপূর্ণ ঐ জাতীয় অন্য কোন অস্ত্রও নিক্ষেপ করা চলে। মোট কথা, যে অস্ত্রই হোক ট্যাঙ্কের বর্ম ভেদ করার চাইতে বিস্ফোরণের দ্বারাই এই সব ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ককে ঘায়েল করতে পারে বেশী। ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেলের নিরেট গুলী অথবা ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের নিরেট গোলা যখন বর্ম ভেদ ক'রে ট্যাঙ্কের কোন মারাত্মক স্থানে আঘাত করে, একমাত্র তখনি ঐ ধরণের গোলাগুলী নিক্ষেপ সার্থক হয় ; কিন্তু উগ্র বিস্ফোরকপূর্ণ কোন অস্ত্র ট্যাঙ্কের গা ঘেঁষে বিস্ফুরিত হলে সহজেই ট্যাঙ্কের চাকা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, গীয়ার বিগড়ে যেতে পারে, এমন কি বর্মেও ছিদ্র হওয়া অসম্ভব নয়। ট্যাঙ্কধ্বংসী গোলাগুলী অত্যন্ত দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়া দরকার ; কিন্তু ট্যাঙ্কধ্বংসী বিস্ফোরক-অস্ত্র হাতে কিংবা অন্য কোন উপায়ে অপেক্ষাকৃত অনেক কম গতিতে ছুঁড়লেও চলে। কোন কোন শ্রেণীর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আগুনে বোমা জাতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রত্যেক ট্যাঙ্কেই বাইরে থেকে বায়ু গ্রহণ করতে হয় ; কাজেই ট্যাঙ্কের কাছে হাওয়ায় যদি আগুন লাগিয়ে দেওয়া যায় তবে হাওয়ার সঙ্গে আগুন ট্যাঙ্কের ভেতরে প্রবেশ করবেই। এই জন্যেই অনেক সময় গ্যাসোলিনপূর্ণ বোতল ছুঁড়ে ট্যাঙ্ক আক্রমণ করা হয় ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থাও থাকে। ট্যাঙ্ক-আক্রমণের এই কৌশলও যতদূর জানা যায় স্পেনের গৃহযুদ্ধেই প্রথম প্রয়োগ করা হয়। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের রাজপথ দিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ট্যাঙ্ক বাহিনী যখন অগ্রসর হতে থাকে তখন রাস্তার দু'পাশের অনেক বাড়ীর দ্বিতল ত্রিতল থেকে রিপাব্লিকান পক্ষের লোকেরা এইভাবে পেট্রল ঢেলে এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ট্যাঙ্কগুলিকে আক্রমণ করে। এভাবে আক্রমণ করাটা খুবই সহজ। এক বোতল পেট্রল ও একটি জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়েই একটি ট্যাঙ্কে

আগুন লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গেরিলা-যোদ্ধারা অনেক ক্ষেত্রেই ট্যাঙ্ক-আক্রমণের এই কৌশলটি কাজে লাগায়।

যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়, দূর থেকে বর্মভেদী অস্ত্র নিক্ষেপ করেই সাধারণত বর্মকে জয় করা হয়েছে। বিমান এবং কামানের সাহায্যেও বর্মকে জয় করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একভাবে বর্মকে জয় করা যায়, সেটা হলো উগ্র বিস্ফোরকের সাহায্যে আক্রমণ চালানো। শত্রুর কাছাকাছি বিস্ফোরণের জন্যে মানুষ বহু খরচ ক'রে অত্যন্ত জটিল সব অস্ত্র নির্মাণ করে—যেমন বড় বড় কামান, বোমারু বিমান, টর্পেডো, মাইন ইত্যাদি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে প্রতিপক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, অথবা কঠিন বর্মের অন্তরালে তারা আত্মগোপন করে, সেখানে দূর থেকে নিক্ষিপ্ত উগ্র বিস্ফোরক অস্ত্রের অতি সামান্য অংশই কার্যকরী হয়। কিন্তু কোন পদাতিক যদি আত্ম-গুপ্তির দ্বারা অথবা ধূমজালে গা-ঢাকা দিয়ে বা অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে হাতে কোন বিস্ফোরক ছুঁড়ে মারতে পারে তবে তার অস্ত্রের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে কম; কারণ কাছে থেকে তাক্ ক'রে যথাস্থানে অস্ত্র নিক্ষেপ করা তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে খুব সাহসী, সতর্ক ও কৌশলী যোদ্ধা না হ'লে এ কাজ করা চলে না। এজন্যে বাছাই করা বিশেষ শ্রেণীর পদাতিক থাকা চাই। এভাবে ট্যাঙ্ক ঘায়েল করা যে সম্ভব, স্পেন এবং সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধে তা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

বর্ম এবং গতিপ্রধান যুদ্ধে রণাঙ্গনে পদাতিকদের পরিখায় আত্মরক্ষা করা তেমন সম্ভব নয়। কাজেই সে অবস্থায় পদাতিকদের আত্মরক্ষার প্রধান উপায় হলো প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করা; কেবল প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্ক এলেই নয়, তাদের বিমানও যখন মাথার ওপর উড়তে থাকে তখনো

পদাতিকদের আত্মগুপ্তি একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক পদাতিক বাহিনীর সমরপ্রণালী ও রণকৌশল ক্রমশ গিয়ে গেরিলা-যুদ্ধের সমরপ্রণালী ও রণকৌশলে দাঁড়াচ্ছে। অতি আধুনিক মারণাস্ত্র আণবিক বোমার আক্রমণ থেকেও আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বোধ হয় আত্মগুপ্তি। গেরিলা বাহিনীকে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকতে হয়; তারা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে, শহরের নির্জন উপকণ্ঠ থেকে এবং দুর্গম পাহাড় পর্বত থেকে নেমে এসে অকস্মাৎ হানা দিয়ে আবার সরে পড়ে অথবা হানা দিয়েই ছত্রভঙ্গ হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আধুনিক রণকৌশল প্রয়োগ করে যে-কোন ছোট পদাতিক বাহিনী এই গেরিলা-কৌশলে আক্রমণ চালাতে পারে; তবে তাদের খুব নিপুণ যোদ্ধা হওয়া চাই। প্রতিপক্ষের দ্রুতগামী সাঁজোয়া বাহিনী যখন অনেক দূর এগিয়ে যায় তখন পেছন থেকে এই গেরিলা-কৌশলে পদাতিক বাহিনী প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশে হানা দিয়ে খুবই সুবিধে করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে সমগ্র বাহিনী কতকগুলি খণ্ডে পরিণত হয় এবং যুদ্ধও খণ্ড খণ্ড ভাবে চলতে থাকে। সোভিয়েট দেশে যখন জার্মানরা আক্রমণ চালায় তখন সোভিয়েট পদাতিকগণ এইভাবে পেছনে থেকে এক একটি জার্মান বাহিনীকে খণ্ড খণ্ড করে দেয় এবং তার ফলে জার্মান সমর-নায়কদের ব্লিৎসনীতি ব্যর্থ হয়ে যায়, অর্থাৎ বিনা বাধায় জার্মান সাঁজোয়া ও পদাতিক বাহিনীর একটানা এগিয়ে যাওয়া সেখানে সম্ভব হয়নি। কাজেই দেখা যায়, যান্ত্রিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে গিয়ে যাঁরা মনে করেছিলেন যে, পদাতিক বাহিনীর কাজ হলো শুধু প্রতিপক্ষের পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা অথবা সাঁজোয়া বাহিনী যেখান দিয়ে এগিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে সেই এলাকাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশত্রু করে তা দখল করা, তাঁদের এই ভুল হয়েছিল

যে, পদাতিক বাহিনীর কর্তব্য শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ট্যাঙ্ক, বিমান ও পদাতিক বাহিনীর সমবায়ে একযোগে আক্রমণ চালাবার যে কৌশল তা ক্ষুণ্ণ হয়; কারণ এইক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনীকে আক্রমণের শক্তি হিসেবে নিয়োজিত করা হয় না। কিন্তু পদাতিক বাহিনীকে রণক্ষেত্রে যদি তাদের নিজস্ব কর্তব্য সম্পাদন করতে দেওয়া হয় এবং তারা যদি নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী নিজেরাই আত্মরক্ষা ও আক্রমণের সুযোগ পায় তবে সৈন্যদলে পদাতিক বাহিনীর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেজন্যেই আধুনিক পদাতিক বাহিনীকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা দরকার যাতে আত্মরক্ষার সময় তারা জোঁকের মত কামড়ে লেগে থাকতে পারে এবং আক্রমণের সময় অদৃশ্য স্থান থেকে পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসে আবার অল্প সময়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এতে করে পদাতিক বাহিনীর তৎপরতা অনেকখানি বেড়ে যায় এবং স্থলযুদ্ধে বিভিন্ন বাহিনীর সমবেত আক্রমণে পদাতিক বাহিনী এক বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই প্রণালীতে পদাতিক বাহিনীকে যুদ্ধ করতে হ'লে বেশী করে ধূমজাল সৃষ্টি করতে হয়; কেননা তার আড়ালে আত্মগোপন করতে সুবিধে। পদাতিক বাহিনীর যাঁরা রক্ষণশীল সেনাপতি তাঁরা কিন্তু বেশী করে ধূমজাল ব্যবহার করা তেমন পছন্দ করেন না; কারণ তাঁরা তাঁদের সৈন্যদের ওপর কর্তৃত্ব নিয়েই ব্যস্ত, সৈন্যরা তাঁদের চোখের আড়াল হয় এটা তাঁরা চান না; কিন্তু ধূমজালের বেশী সাহায্য নিলে সৈন্যদের খানিকটা আড়ালে পড়তে হবেই। আর তাছাড়া এ বিষয়ে ভালভাবে অভ্যস্ত না হ'লে সৈন্যদের এগিয়ে যাবার সময় দিকহারা হবারও সম্ভাবনা। কিন্তু রক্ষণশীল সেনানীরা একথা ভেবে দেখেন না যে, আধুনিক যুদ্ধে তাঁদের পেছনে থেকে আগের সমস্ত ছোট ছোট সৈন্যদলের উপর অবিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব নয়। অথচ আগেই

দেখানো হয়েছে যে, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে পদাতিকের আত্মরক্ষার পক্ষে পরিখায় আশ্রয় নেওয়ার চাইতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করাই বেশী নিরাপদ এবং সেদিক দিয়ে ধূমজালের অন্তরালে বা অন্ধকারে আত্ম-গোপন করাই সুবিধেজনক। সুতরাং সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অসুবিধের অজুহাতে যাঁরা পদাতিক বাহিনীর ধূমান্তরালে অথবা অন্ধকারে আত্ম-গোপনের বিরোধী তাঁরা আধুনিক স্থলযুদ্ধের একটি অপরিহার্য রণকৌশল সম্বন্ধে উদাসীন, একথা বলা চলে। মালয়ে জাপানী অভিযানের সময় দেখা গেছে যে, জাপানীরা সাধারণত অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার পর আর অগ্রসর হতো না। তখন তারা থেমে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারতো এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিশ্রাম করতো, তার পরেই আবার তাদের অগ্রগতি সুরু হোত। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তারা এমন ভাবে অগ্রসর হোত যে, সকাল বেলা দেখা যেত এক একটি এলাকায় বৃটিশ সৈন্যের চারদিকেই জাপানী সৈন্য উপস্থিত। বলা বাহুল্য, এটা একেবারে খাঁটি গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল এবং জাপানীরা চীনা সৈন্যদের কাছ থেকেই এ কৌশল আয়ত্ত করে। চীনা পদাতিক বাহিনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, সোভিয়েট পদাতিকদের ন্যায় তারাও গেরিলা-যুদ্ধে বিশেষ পটু। তারপর দেখা যায়, পদাতিকদের শহরে রাস্তায় বাস্তায়ও বিস্তর যুদ্ধ করতে হয়। ব্লিৎসক্রীগের নীতি যেখানে সফল হয়েছে সেখানেও পদাতিকদের শহরের রাস্তায় যুদ্ধ করা যেমন দরকার হয়েছে, তেমনি ব্লিৎসনীতির ব্যর্থতার পর যে নতুন সমরনীতির উদ্ভব হচ্ছে তাতেও পদাতিকগণ শহরের রাস্তায় যুদ্ধ করছে। ব্লিৎস-আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দ্রুত এগিযে গিয়ে আঘাতের পর আঘাত করা। কাজেই দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাঁজোয়া বাহিনী সড়ক ধরে অগ্রসর হয়; কিন্তু একাধিক সড়কের সংযোগস্থলে যেসব শহর বা গ্রাম থাকে, দৃঢ়চেতা পদাতিকগণ যদি সেগুলিতে থেকে প্রতিরোধ করে তবে

ব্লিৎসের গতি মন্থর হয়ে আসে এবং সাঁজোয়া বাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, পশ্চাতের লরীবাহিত সৈন্যগণ ও রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আগের দিনে কোন সুরক্ষিত এলাকা কামান দেগে ধ্বংস করে দেওয়া হোত, কিন্তু তাতে যথেষ্ট সময় লাগতো এবং প্রচুর গোলা খরচ হোত। যথার্থ ব্লিৎস-কৌশলে আক্রমণ করতে হ'লে কোন সুরক্ষিত এলাকা ধূলিসাৎ করে দেওয়া যায় না; কেননা তেমন সময় হাতে থাকে না। কোন শহরকে লণ্ডভণ্ড করতে হ'লে একমাত্র ট্যাঙ্কের দ্বারা তা করা সম্ভব নয়। শহরের রাস্তায় যে যুদ্ধ হয় তাতে ট্যাঙ্কের অনেক অসুবিধে আছে। ট্যাঙ্কে এত গোলা নিয়ে যাওয়া যায় না যা দিয়ে রাস্তার দুপাশের সমস্ত বাড়ী ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব। বিধ্বস্ত বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের আড়ালে যেসব প্রতিরোধকারী পদাতিক থাকে তাদের নিশ্চিহ্ন করা ট্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনেক সময় আস্ত ইমারতের চাইতে ভাঙ্গা ইমারতেই প্রতিরোধকারী পদাতিকদের আশ্রয় নিতে সুবিধে হয় বেশী। তারপর রাস্তার দু'পাশ থেকে পদাতিকগণ হাতের কাছে ট্যাঙ্ক পেয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে সহজেই তা ঘায়েল করতে পারে; সেজন্যে শহরের রাস্তা ট্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। শহরের রাস্তায় যুদ্ধের সময় বোমারু বিমানগুলিও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে না, কেননা তারা তাদের লক্ষ্যসমূহ ঠিক দেখতে পায় না। কাজেই শহরের রাস্তায় যুদ্ধ প্রধানত পদাতিকের কাজ; সাধারণতই এই যুদ্ধের গতি মন্থর এবং আক্রমণকারীদের তুলনায় আত্মরক্ষাকারীদের সুবিধে খুব বেশী। কোন সুরক্ষিত এলাকায় অর্থাৎ বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে যখন প্রতিরোধকারীরা বাধা দেয় তখন ব্লিৎস-আক্রমণকারীদের অবশ্যই সেখানে পদাতিক ও কামান আমদানী করতে হয়। সোভিয়েট দেশের লোক তাদের শহরগুলিতে বাধা দেয় এবং সেই জন্যেই জার্মান ব্লিৎস-বাহিনীর মেরুদণ্ড পানৎসার ডিভিসন-

গুলিকে যুদ্ধের কৌশল বদলাতে হয় এবং তাদের গতি মন্থর হয়ে আসে। এইরূপ কোন সুরক্ষিত সহরের রক্ষীরা যখন অনমনীয় ও কৌশলী হয়ে ওঠে, যেমন সেবাস্তোপোলে হয়েছিল—তখন সেই শহর দখল করবার জন্যে সমস্ত শহরটিকে লণ্ডভণ্ড করা দরকার হয়। সেবাস্তোপোলের পতন হতে কয়েক মাস সময় লেগেছিল; ১৯৪২ খৃস্টাব্দের সমগ্র বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগ জার্মানদের সেখানে নষ্ট করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে দেখা যায়, ১৯৪২ খৃস্টাব্দে জার্মানরা উত্তর আফ্রিকায় তোব্রুক অতি সহজেই দখল করতে পেরেছিল; কারণ সেখানে নগরের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ হয়নি বললেই চলে।

সুতরাং দেখা যায়, শহরের রাস্তার যুদ্ধ এবং গেরিলা-যুদ্ধকে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক'রে ব্লিৎসক্রীগ বা ঝটিতি-যুদ্ধকে কার্যকরী ভাবে প্রতিরোধ করা চলে। শহরের রাস্তার যুদ্ধে ব্লিৎসক্রীগকে যে রোধ করা সম্ভব তার স্পষ্ট প্রমাণ স্ট্যালিনগ্রাড। জার্মানরা ট্যাঙ্ক, বিমান, বড় বড় কামান এবং অনেকগুলি পদাতিক ডিভিসন নিয়ে এক সঙ্গে উক্ত শহরে আক্রমণ চালায়। ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দের মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্দুনের যুদ্ধ অবশ্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের সঙ্গে ভার্দুনের যুদ্ধের পার্থক্য এই যে, জার্মানরা যেমন স্ট্যালিনগ্রাডের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করেছিল, গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা ভার্দুনে তেমন সুরক্ষিত এলাকায় কখনও প্রবেশ করেনি। স্ট্যালিনগ্রাড যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যই এই যে, সেখানে শহরের সুরক্ষিত এলাকায় এবং রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হয়েছে। জার্মানদের বড় বড় কামানের গোলা এবং বোমা প'ড়ে স্ট্যালিনগ্রাডে যে-সব গহ্বরের সৃষ্টি হয়, স্ট্যালিনগ্রাডরক্ষীরা সেগুলিতে আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ করে। কোন শহরের বুকে যুদ্ধ যে কতদূর চরমে পৌছাতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্ট্যালিনগ্রাড। অথচ ঠিক

এর বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে। রাস্তার যুদ্ধে এবং গেরিলা-যুদ্ধে অভ্যস্ত না থাকায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরে বৃটিশ পক্ষের এক বিরাট বাহিনীকে একরূপ বিনাবাধায় জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এই উভয় দেশই তাদের শত্রু-অধিকৃত এলাকায় বহু সক্রিয় যোদ্ধা রাখতে সক্ষম হয়। আধুনিক যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য হলো প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশে দুর্বল স্থানগুলিতে সৈন্য ও অস্ত্র রাখা। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ব্লিৎসক্রীগ যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং তদুদ্দেশ্যে বহু ব্যয়ে দ্রুতগামী সাঁজোয়া বাহিনীর সৃষ্টি। বোমারু বিমান ও বিমানবাহিত বাহিনীর সৃষ্টিও এই উদ্দেশ্যেই; প্যারাশুটিরাও এই একই উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশে অবতরণ করে। গেরিলা বাহিনীও এই একই উদ্দেশ্য সাধন করে; তারা প্রচ্ছন্নভাবে সশস্ত্র অবস্থায় প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশে থেকে যায় এবং প্রতিপক্ষের দুর্বলতম স্থানে তারা আক্রমণ করে। প্রতিপক্ষের সমরসম্ভার গেরিলারা রাস্তার মধ্যে লুট করে, গুদাম জ্বালিয়ে দেয়। ফলে প্রতিপক্ষের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। পৃষ্ঠদেশে থেকে গেরিলারা যেমন অতর্কিত আক্রমণ চালায় তাতে প্রতিপক্ষের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়; কারণ গেরিলারা যেখানে আক্রমণ চালায় সেখানে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তেমন সুদৃঢ় থাকে না বলেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে বেশী। সরবরাহ কম থাকে বলে রেগুলার সৈন্যদের মতো গেরিলারা তত বেশী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের সুবিধে পায় না, সেই জন্যেই প্রতিটি অস্ত্র, প্রতিটি গুলী তাদের হিসেব ক'রে ব্যবহার করতে হয়; গেরিলা বাহিনীতে অস্ত্র ও রসদের অপচয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এ ছাড়া প্রচ্ছন্ন অবস্থায় গেরিলারা প্রতিপক্ষের অত্যন্ত কাছে যেতে পারে বলেই আঘাত তাদের প্রায়ই নির্ভুল হয় এবং তাদের সমর-প্রণালীতেও জটিলতা কম।

ব্লিৎসক্রীগে মোহ্ড়ার দিকে আঘাত হানার জন্যে যে প্রধান বাহিনী থাকে তা অত্যন্ত শক্তিশালী ; তার পেছনে আসে পেট্রলের লরী, সরবরাহের গাড়ী, চলন্ত কারখানা, অফিসারদের গাড়ী এবং এই ধরণের আরো অনেক যানবাহন। আধুনিক যুদ্ধের কৌশল হলো প্রতিপক্ষের এই দুর্বল স্থানে ঘা দেওয়া। ব্লিৎস বাহিনীকে এমন একটি মানুষের সঙ্গে তুলনা করা চলে যার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত কঠিন বর্মে আচ্ছাদিত, কিন্তু কোমরের নীচে কোন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেই। কাজেই অরক্ষিত এই কটিবন্ধের নীচে আঘাত হানাই ব্লিৎস বাহিনীকে কাবু করার প্রধান উপায়। কোন শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনীর ব্লিৎসক্রীগ ঠেকাতে হ'লে প্রতিরোধকারীদের কেবল শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনীই যথেষ্ট নয়, তার পেছনে থাকা চাই সশস্ত্র জনগণের সমর্থন। প্রতিপক্ষের আঘাতকারী যান্ত্রিক বাহিনীকে প্রতিরোধ করা এবং তার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালাবার জন্যে চাই ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান, লরীবাহিত পদাতিক এবং আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ; কিন্তু তাদের সাহায্য করবে জনগণ। জনগণের অস্ত্রশস্ত্র হবে সহজ ও সস্তা। যেমন টমিগান, মাইন ও গ্রেনেডের জন্যে বিস্ফোরক, মেশিন-রাইফেল ইত্যাদি। রেগুলার বাহিনীর সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ রাখতে হবে ; বেসামরিক যানবাহন এবং বেতার এই যোগাযোগ রক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। তারা শহরে, পাহাড়ে এবং জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। তারা যেমন মাঠে যুদ্ধ করবে, তেমন শহরের রাস্তায়ও যুদ্ধ করবে। চূড়ান্ত আঘাত হানার উপযোগী বাহিনী না থাকলে কেবল গেরিলা বাহিনীর দ্বারা যুদ্ধের চরম ফললাভ সম্ভব নয়। অতীতের ইতিহাসেও এর নজীর রয়েচে। স্পেনীয় গেরিলারা নেপোলিয়নের বাহিনীকে পরাজিত করতে পারেনি—তারা কেবল নেপোলিয়নের বাহিনীর শক্তিক্ষয় ক'রে চলেছিল। তারপর ওয়েলিংটনের আঘাতকারী বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ

হ'লে পর নেপোলিয়নের পরাজয় হয়। তবে গেরিলা বাহিনীর সাহায্য পেলে অপেক্ষাকৃত অনেক কম আঘাতকারী সৈন্যদল নিয়েও প্রতিপক্ষের অধিকতর শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ইওরোপে বিভিন্ন দেশেব গেরিলা বাহিনী মিত্রপক্ষের অভিযানকে অনেকখানি সাহায্য করেচে।

ইতিহাসে দেখা যায়, যখনি কোন রণনীতি বা রণকৌশলের পরিবর্তন হয়েছে, কেবল উন্নততর অস্ত্র উদ্ভাবন বা বর্ম আবিষ্কারের দ্বারাই তা হয়নি; তার পেছনে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবও ছিল। পুরাতন জীবনযাত্রা-প্রণালীকে পরিহার ক'রে যখন নতুন জীবনযাত্রা-প্রণালীর জন্যে লোকের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হয় তখন যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধেও তাদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা আসে। যারা অন্ধের মতো পুরাতন ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায় যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধেও তারা পুরাতন পথেই চিন্তা করে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জগতের বিভিন্ন দেশে যে গেরিলা-যুদ্ধের প্রাবল্য দেখা যায় তার পেছনেও রয়েচে এক রাজনৈতিক চেতনা। ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সমবেতভাবে বাধাদানের প্রচেষ্টা থেকেই গেরিলা-যুদ্ধের উদ্ভব এবং সেই জন্যেই বিভিন্ন দেশে ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধ জনসাধারণের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। যান্ত্রিক বাহিনীর সহিত গেরিলা বাহিনীর সমন্বয়ে এক নতুন রণকৌশল আত্মপ্রকাশ করেছে। বলা বাহুল্য, জনচেতনার মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে সেই যুদ্ধ এক বিপ্লবী ফলই প্রসব করবে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক দিয়ে যারা বিপ্লবী তাদেরই হাতে এই নতুন রণকৌশলের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব।

যুগোস্লাভিয়া

১৯৪১ খৃস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল হিটলারের বাহিনী যুগোস্লাভিয়ায় প্রবেশ করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা উক্ত দেশ দখল করতে সমর্থ হয়। নরওয়ের মতোই যুগোস্লাভিয়ারও একদল বিশ্বাসঘাতক হিটলারের বাহিনীকে সাহায্য করে এবং তার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই যুগোস্লাভিয়ার পতন ঘটে। সৈন্যদল বিধ্বস্ত হয়, কতক সৈন্য বাধ্য হয়ে জার্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং জেনারেল সিমোভিশের গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যুগোস্লাভিয়ার 'কুইসলিং দল' জার্মানদের সাহায্য করতে থাকে। সাময়িকভাবে তখন মনে হয়েছিল, যুগোস্লাভিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে যারা ফাসিস্তবিরোধী তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে যুগোস্লাভিয়ায় বুঝি আর কেউ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল সে ধারণা ভুল। যারা মনে করেছিল, যুগোস্লাভিয়ার আর উত্থানের শক্তি নেই তারা সেখানকার জনসাধারণের সাহস ও সামর্থ্যের পরিমাপ ঠিক করতে পারেনি। হিটলার যেদিন ঘোষণা করলেন, যুগোস্লাভিয়া তাঁর সম্পত্তি, সেদিন থেকেই স্বরু হলো সেখানকার জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম। বাইরে থেকে সমরাস্ত্র পাবার আশায় তারা বসে রইল না, বা চূড়ান্ত জয় তাদের হবে কিনা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামালো না, যুগোস্লাভিয়ার সহস্র সহস্র স্বদেশ-ভক্ত, সহস্র সহস্র নরনারী পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রাণপাতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো। তাদের অস্ত্র ছিলনা, সম্বল ছিলনা, কিন্তু প্রাণে ছিল সুতীব্র স্বদেশপ্রেম। সেই স্বদেশ-প্রেমের বলেই তারা এক শক্তিশালী গণসেনায় সংগঠিত হয়ে উঠলো। বিদেশী আক্রমণকারী জার্মান ও ইতালীয়গণ এবং স্বদেশের বিশ্বাস-

ঘাতকদের বিরুদ্ধে চালালো তারা বিরামহীন সংগ্রাম। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই এই জনসেনার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় তিন লক্ষে। সেই সময়ের মধ্যে যুগোস্লাভিয়ার বিদেশী-অধিকৃত এলাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ তারা দখল করলো। উত্তরে কারাভাংকে পর্বতমালা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের শার-প্লানিলা পর্যন্ত শ' শ' মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে যুগোস্লাভ গেরিলারা ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালো। একমাত্র সোভিয়েট রণাঙ্গন ছাড়া ইওরোপে তখন ফাসিস্তশক্তির বিরুদ্ধে এতবড় রণাঙ্গন আর কোথাও ছিল না। কাজেই ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিবর্গের যুদ্ধের ইতিহাসে যুগোস্লাভ গেরিলা বাহিনীর বীরত্ব-গাঁথা এক উজ্জ্বল অধ্যায়। জাতির দুর্দিনে দলগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কিভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হয়, যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিসংগ্রাম তারও স্পষ্ট নির্দেশ দেয়।

যুগোস্লাভিয়া হিটলারের কুক্ষিগত হবার পরই সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, বোসনিয়া, স্লোভেনিয়া, হার্জেগোভিনা, ক্রোশিয়া, ডালমাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকা থেকে জনসাধারণ এসে গেরিলা বহিনীতে যোগ দেয়। কারখানার শ্রমিকরা তাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে অস্ত্রগ্রহণ করে। বহু চাষী এসে গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র, চিকিৎসক, সাংবাদিক, এঞ্জিনিয়ার, কেরাণী, দোকানদার প্রভৃতি সকল-শ্রেণীর লোকই গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করে। প্রথম অবস্থায় গেরিলা যোদ্ধাদের খুবই অসুবিধের মধ্যে কাটে। সমগ্র দেশব্যাপী গেরিলা বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ সাধন করতে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তাদের বিপক্ষে ছিল বিপুল শক্তিশালী জার্মান বাহিনী। তাদের তুলনায় গেরিলাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অত্যন্ত কম। কিন্তু অদম্য মনোবল ও অপূর্ব সাহস থাকায় গেরিলারা কিছুদিনের মধ্যেই শক্তিশালী প্রতিরোধ-বাহিনীতে পরিণত হলো। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লালফৌজ,

সোভিয়েট গেরিলা এবং সমগ্র সোভিয়েট জাতির দৃঢ় প্রতিরোধের কাহিনী শুনে যুগোস্লাভ গেরিলারা অধিকতর অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। হিটলার-বিরোধী সম্মিলিত শক্তিবর্গ কবে জার্মানীকে পরাজিত ক'রে যুগোস্লাভিয়াকে স্বাধীনতা এনে দেবে এই ভরসায় তারা বসে রইল না; যুগোস্লাভ গেরিলারা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে গেরিলারা যুগোস্লাভিয়ার বহু জায়গায় আক্রমণ স্থরু করে। পার্বত্য জেলাগুলিতে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যগণ যে আক্রমণ চালায় গেরিলারা তা ব্যর্থ করে দেয়। তারা বিভিন্ন শহর অবরোধ ক'রে জার্মান ও ইতালীয়দের বিতাড়িত করে। বিশেষভাবে সার্বিয়া, বোসনিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোতে যুদ্ধ প্রসার লাভ করে। সার্বিয়ায় গেরিলারা কয়েকটি জেলা থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। সেই সব জেলায় সার্বিয়ানরা ক্ষমতা লাভ করে। এমন কি গেরিলারা যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড পর্যন্ত ঘিরে ফেলে তা অবরোধ করে রাখে। কেবল যে সংঘবদ্ধ গেরিলা বাহিনীর অধিকৃত এলাকায়ই যুদ্ধ চলে এমন নয়, শত্রু-অধিকৃত শহর এবং গ্রামগুলিতেও জনসাধারণ খণ্ডখণ্ড ভাবে যুদ্ধ চালায়। পার্বত্য এলাকার ন্যায় সমতলক্ষেত্রেও যুদ্ধ চলে। যুগোস্লাভিয়ার জনসাধারণ লড়াই ক'রে যেসব বিষয়ে সাফল্য লাভ করে তার মধ্যে একটি হলো প্রতিপক্ষের সমরাস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলি ধ্বংস করে দেওয়া। যুগোস্লাভিয়ার অস্ত্র, গোলাবারুদ, এঞ্জিন এবং বিমান নির্মাণের নিজস্ব কারখানা ছিল। ফাসিস্ত আক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যেই যুগোস্লাভিয়ার দেশভক্তরা শত্রুর অধিকৃত এলাকায় যেসব অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পরিত্যক্ত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশ ধ্বংস ক'রে দিতে সক্ষম হয়। সব চেয়ে বড় অস্ত্রের

২

কারখানাটি তারা উড়িয়ে দেয়। এইসব সত্ত্বেও যুগোস্লাভিয়ার কতকগুলি সমরশিল্পোৎপাদনের কারখানা ফাসিস্তদের হাতে পড়ে; কিন্তু সেগুলি আর তারা কাজে লাগাবার অবসর পায়নি। যুগোস্লাভিয়ায় জনসাধারণ প্রতিটি অস্ত্রের কারখানা ধ্বংস করে ফেলে। ফলে সেখানে জার্মান ও ইতালীয়দের কোনরূপ সমরশিল্প উৎপাদন করাই আর সম্ভব হয়নি।

যুগোস্লাভ জনসেনা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চমৎকার পন্থা উদ্ভাবন করে। কিছুদিন পর্যন্ত জার্মান বিমান বাহিনীর আক্রমণে যুগোস্লাভরা খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে। জার্মানদের বোমারু বিমান নিরীহ আবালবৃদ্ধবনিতা কাউকেই রেহাই দিত না। গেরিলারা এর একটা প্রতিকার বের করলো। তারা প্রতিপক্ষের বিমানীদের ধরে ধরে হত্যা করতে লাগলো। জাগ্রেব-এ একদিন দিনের বেলা প্রতিপক্ষের একদল বিমানী একখানি মোটর বাসে চড়ে হোটেল থেকে নিকটবর্তী বিমানঘাঁটিতে যাচ্ছে—গেরিলারা একটি বোমা দিয়ে তাদের উড়িয়ে দিলে। প্রায় দশ বার জন বিমানী মারা গেল। সেই শহরেই যুগোস্লাভিয়ার যুব কম্যুনিস্ট সংঘের সদস্য এক তরুণী টেলিফোন-অপারেটরের কাজ করতো। সে একদিন টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একটি মারাত্মক যন্ত্র বসিয়ে রেখে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই প্রায় সমস্ত জায়গাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। ফলে জার্মানরা সংবাদ আদান-প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হারালো। কম্যুনিস্ট তরুণী পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে গিয়ে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিল।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে গেরিলা দলগুলি পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন ক'রে সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পেল। প্রথমে তারা সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, ক্রোশিয়া ও স্লোভেনিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করলো এবং ক্রমশ দেশের অন্যান্য অংশের গেরিলাদের সঙ্গেও যোগাযোগ

স্থাপন করা সম্ভব হলো। এইভাবে গেরিলা ও স্বেচ্ছাবাহিনী সকল দল মিলে একদলে পরিণত হলো এবং তাদের একটি সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলও গঠিত হলো। অবশ্য মিহাইলোভিশের দল এর মধ্যে এলো না। তাদের কথা পরে বলব।

বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবার ফলে গেরিলা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেল। জার্মান ও ইতালীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেসব স্বদেশভক্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদের ওপর গেরিলাদের নেতৃত্বভার দেওয়া হলো। নিজেদের কাজের দ্বারা তারা প্রমাণ করেছিল যে দেশপ্রেম তাদের কত গভীর। সেই জন্যেই তারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলো এবং গেরিলা যোদ্ধারা সহজেই তাদের নেতৃত্ব মেনে নিল। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিয়েই গেরিলা বাহিনীব সেনানীমণ্ডল গঠিত হয়। যুগোস্লাভ বাহিনীর কোন কোন অফিসার স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সেখানকার রিপাব্লিকান পক্ষে যুগোস্লাভিয়াব যে স্বেচ্ছাবাহিনী লড়াই করেছিল তারা, যুগোস্লাভ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিরা, শ্রমিকগণ এবং ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দে যেসব বিদ্রোহী কৃষক জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল তারা এই গেরিলা বাহিনীর সেনানীমণ্ডলে স্থান পায়।

মাসের পর মাস গেরিলাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে তাদের সংখ্যা এসে প্রায় এক লক্ষে দাঁড়ায়। জার্মানরা তখন বুঝতে পারে যে, যুগোস্লাভিয়া জয় করা হয়েছে বলে তারা যে ধারণা করেছিল সেই ধারণা ভুল। কাজেই তারা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে বাধ্য হলো। নতুন নতুন সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী করে তারা যুগোস্লাভ গেরিলাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযান সুরু করলো।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে জার্মানরা যুগোস্লাভ গেরিলাদের বিরুদ্ধে কয়েক ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করলো। যুগো-

স্লাভিয়ার যেসব বিশ্বাসঘাতক রাজনীতিক ফাসিস্তদের দলে ভিড়েছিল তারা তাদের তাঁবেদার সৈন্য (উস্তাসিগণ) ও পুলিশদের সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো এবং ক্রোশিয়ার গ্রামাঞ্চলে গেরিলাসমর্থক গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার করবার জন্যে পাঠিয়ে দিল। গেরিলাদের সঙ্গে জার্মানদের তুমুল যুদ্ধ বাধলো। উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত জার্মানদের সঙ্গে গেরিলারা পেরে উঠলো না; বাধ্য হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করলো। যেসব শহর গেরিলারা উদ্ধার করেছিল তার মধ্যে কতকগুলি আবার জার্মানদের হাতে পড়লো। তবে জার্মানরা সহজে সেগুলি দখল করতে পারেনি, তার জন্যে তাদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। এই সকল যুদ্ধে হাজার হাজার জার্মান ও ইতালীয় সৈন্য মারা যায়।

শীতকালে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা কমে এল। তার একটা কারণও ছিল। পার্বত্য এলাকায় শীতের মধ্যে যুদ্ধ করতে জার্মান সৈন্যরা অভ্যস্ত ছিল না। কাজেই তারা আক্রমণ বন্ধ রেখে জনবহুল এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। জার্মানরা ভেবেছিল শীতকালটায় তারা খানিকটা বিশ্রাম নেবে। কিন্তু যুগোস্লাভ গেরিলারা তাদের মোটেই বিশ্রাম দিল না। শীতকালে তারা পাল্টা আক্রমণ সুরু করলো এবং কতকগুলি জনাকীর্ণ এলাকা থেকে জার্মানরা বিতাড়িত হলো।

এই সময় খবর এল মস্কোর কাছে জার্মানরা পরাজিত হয়েছে এবং কালিনিন, কালুগা, মোজাইস্ক এবং আরো কতকগুলি সোভিয়েট শহর লাল ফৌজ মুক্ত করেছে। এই খবরে যুগোস্লাভ স্বদেশভক্তরা নতুন প্রেরণা লাভ করলো; তাদের মধ্যে যুদ্ধোদ্যম বেড়ে গেল। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে গেরিলারা প্রতিপক্ষের একটি বড় সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করলো। সেই সৈন্যদলে জার্মানদের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার তাঁবেদার সৈন্যদলও ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত এই বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল বোসনিয়ার স্বদেশভক্তদের

সায়েস্তা করতে। কিন্তু গেরিলাদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হলো; কিন্তু সবাই ফিরে যেতে পারলো না—অনেককে যুদ্ধে প্রাণ হারাতে হলো। কোন কোন যুদ্ধে তাদের একশো থেকে দু'শো পর্যন্ত লোক মারা গেল। অনেকে বন্দীও হলো। তাছাড়া বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও তাদের খোয়া গেল।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে মণ্টেনিগ্রোর গেরিলারা বিশেষ সাফল্য লাভ করে। গোড়ার দিকে ইতালীয়রা সেখানকার যে-সকল জেলা দখল করে বসেছিল গেরিলারা তার অধিকাংশ জেলা থেকেই ইতালীয়দের বিতাড়িত করে। বিমান, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী এবং মেশিনগান থাকা সত্ত্বেও ইতালীয়রা গেরিলাদের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধে করে উঠতে পারেনি, মণ্টেনিগ্রোর একটা বিস্তৃত অঞ্চল তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে জার্মান ও ইতালীয়রা আবার গেরিলাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়। তারা বহু সৈন্য এবং অনেক কামান, মেশিনগান ও ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নিয়োজিত করে। তারা ভেবেছিল, এত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গেরিলাদের একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে এবং মুক্ত এলাকার অধিবাসীদের প্রাণে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার করবে। যুগোস্লাভিয়ায় হিটলারের তাঁবেদার শাসনকর্তা জেনারেল ব্যাডার ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাবার আদেশ দিলেন। জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যগণ এবং তাঁদের তাঁবেদাররা গেরিলা-অধিকৃত জেলাগুলিকে ঘেরাও করে তাদের উচ্ছেদ করবার জন্যে চেষ্টিত হলো। উভয় দিকেই বহু সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিল। গেরিলা ব্যাটেলিয়ন এবং ব্রিগেডসমূহ জার্মান ও ইতালীয় ডিভিসনগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। প্রতিপক্ষের অস্ত্র ও সৈন্যবল বেশি থাকা সত্ত্বেও গেরিলারা নিজেদের অধিকৃত এলাকা দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করলো এবং প্রতিপক্ষ যুদ্ধে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মণ্টেনিগ্রো,

বোসনিয়া এবং হারজেগোবিনায় যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহব্যাপী চললো। ফোকা নামক শহর দখলের জন্যে যুদ্ধ প্রায় একমাস স্থায়ী হলো। শহরটি বার কয়েক হাতবদল হলো। প্রতিপক্ষের উন্নততর বাহিনীর চাপে গেরিলারা বাধ্য হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে এবং দূরবর্তী এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে তারা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে শক্তি বাড়ালো এবং আক্রমণ চালাবার জন্যে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করলো। শক্তিবৃদ্ধি করে তারা আবার আক্রমণ স্থুরু করলো। প্রতিপক্ষ সেই আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পরাজিত হলো।

এই কয়েক মাসব্যাপী যুদ্ধে যুগোস্লাভিয়ার সর্বত্রই যে গেরিলারা পশ্চাদপসরণ করলো এমন নয়। স্লোভেনিয়ায় তারা বরঞ্চ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করলো। স্লোভেনিয়ায় এবং আরো কয়েকটি জেলায় গেরিলাদের অভিযানের ফলে প্রতিপক্ষ আর কোনো একটি বিশেষ এলাকায় শক্তি সংহত ক'রে যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ওপর চরম ঘা দেবার স্থযোগ পেল না।

সমগ্র স্লোভেনিয়ার জনসাধারণ স্বাধীনতার যুদ্ধে মেতে ওঠে। সেজন্যেই সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সংখ্যাও ক্রমশই বেড়ে যায়। স্লোভেনিয়ার রাজধানী যুবলজানা, ত্রিয়েস্তে জেলা, কোসেভ্জে, গোরিকা এবং দিবাক শহরে, অস্ট্রিয়ার নিকটবর্তী জেলা এবং আরো বহু এলাকায় ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনল জ্বলে ওঠে এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে।

কোন কোন স্থানে গেরিলারা ইতালীয় সৈন্যদের সরাসরি আক্রমণ করে এবং স্থানীয় সশস্ত্র অধিবাসীরা পৃষ্ঠদেশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে অস্থির করে তোলে। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ব্যেপে স্লোভেনিয়ার জনসাধারণ জার্মান ও ইতালীয়দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং একটা বৃহৎ অঞ্চলকে তারা মুক্ত করে।

স্লোভেনিয়ার মুক্ত এলাকা এবং শত্রু-অধিকৃত শহর ও গ্রামগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব করে মুক্তি সংঘ। জার্মান ও ইতালীয়দের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যে যে সব স্বদেশ-ভক্ত সংগ্রাম চালায় মুক্তি সংঘ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে।

এই সময়ে গেরিলারা বোসনস্কা, ক্রাজিনা, বোসনিয়া, ক্রোশিয়া, ডালমাশিয়া এবং সমগ্র আদ্রিয়াটিক উপকূলে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। বহু জার্মান, ইতালীয় এবং উস্তাসি সৈন্যকে পরাজিত করে গেরিলারা কাঞ্জিকা, ক্রেসেভো, লুবুস্কি, প্রিজেডর, প্রোজর, গর্নজি ভাকুফ, গ্রামক, বোসানস্কিপেট্রভাক, বোসনস্কাক্রুপা, ডবরলিন, ব্রড, সানস্কিমস্ত এবং আরো অনেক শহর দখল করে। আদ্রিয়াটিক উপকূলের এই অঞ্চল সামরিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে ইতালীয়রাও এই অঞ্চল হাতে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে। যাকে বলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ঠিক সেই ভাবে ইতালীর সৈন্যরা এই অঞ্চলের প্রতি পাদভূমি রক্ষার চেষ্টা করে ; এ সত্ত্বেও গেরিলারা বহু গ্রাম ও শহর থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ঐ সমস্ত শহর ও গ্রাম ইতালীয়রা প্রায় বৎসরাধিককাল দখল করে বসেছিল।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে অনেকগুলি বড় রকমের যুদ্ধ হয়। জার্মান ও ইতালীয়গণ গেরিলা-অধিকৃত শহরগুলি ফিরে পাবার জন্যে তাদের সমস্ত সৈন্য নিয়োজিত করে, কিন্তু গেরিলারাও ক্রমশই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলে। কোন কোন জায়গায় গেরিলারা শহর পরিবেষ্টিত করে জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গেরিলারা ইতালীয় আর্মির স্যাভয় ডিভিসনের একটি বৃহৎ অংশকে নিশ্চিহ্ন করে ; উক্ত সৈন্যদলের সেনানীরা বন্দী হন, একমাত্র সেনাপতি জেনারেল মাৎসা বিমানযোগে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। যুদ্ধে জয়লাভ করে যুগোস্লাভ গেরিলারা

জার্মান রাইখ সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। গেরিলা-আন্দোলনের ঢেউ স্লোভেনিয়া থেকে অস্ট্রিয়ার প্রদেশ কারিন্থিয়া এবং স্টাইরিয়া পর্যন্ত পৌছে। এই গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন গেরিলা-অভিযানে যুগোস্লাভিয়ার প্রতিপক্ষের অবস্থা এতটা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় যে, মুসোলিনী যুগোস্লাভ সীমান্তে অবস্থিত গৈরিকায় চলে আসতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি ইতালীয় বাহিনীর সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষ জেনারেল কাভালেরো এবং স্লোভেনিয়া ও ডালমাশিয়ার ইতালীয় বাহিনীর সেনাপতিদের সংগে পরামর্শ করেন। তিনজন জার্মান জেনারেল ক্রোশিয়ায় প্রেরিত হন, ফাসিস্ত পক্ষ গেরিলাদের বিরুদ্ধে বেশি করে সৈন্য নিয়োজিত করে, কয়েকটি ডিভিসনে ট্যাঙ্ক, বিমান এবং বড় বড় কামান দেওয়া হয়। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ১৭টি ইতালীয়, ৪টি জার্মান, ৪টি হাঙ্গারীয় এবং ৭টি বুলগেরিয় অর্থাৎ মোট ৩২টি ডিভিসনকে যুগোস্লাভ গেরিলাদের বিরুদ্ধে সন্নিবেশ করা হয়। কিন্তু নতুন বল আমদানী করেও তারা কোন দিকে সুবিধে করে উঠতে পারলো না। ফাসিস্তদের নতুন অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার ফল দাঁড়ালো এই যে, গেরিলারা বহু জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে তাদের অনেক অস্ত্র হাত করে ফেললো এবং এতে করে তাদের অস্ত্রের অভাব খানিকটা মিটলো।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে দেখা যায়, যুগোস্লাভ গেরিলারা প্রতিপক্ষের হাত থেকে প্রায় ৪৮ হাজার বর্গ 'কিলোমিটার' পরিমিত স্থান উদ্ধার করেছে; তার অধিকাংশই হলো বোসনিয়া এবং বোসনস্কা-ক্রাজিনায়। জব্দ হওয়া তো দূরের কথা, গেরিলারা বরঞ্চ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ক্রোশিয়া, ডালমাশিয়া, স্লোভেনিয়া প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার জার্মান ও ইতালীয় সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে।

যুগোস্লাভ গেরিলারা জার্মান ও ইতালীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে যে রণ-কৌশল প্রয়োগ করে, বুলগেরিয়দের বেলায় ঠিক সেইরূপ করেনি।

গেরিলারা বুলগেরিয়ার সৈন্যদের উদ্দেশে আবেদন করে যে, তারা যেন তাদের স্লাভ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে জার্মান ও ইতালীয় ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই আবেদনে ফল হয়, বহু বুলগেরিয় সৈন্য গেরিলাদলে এসে যোগ দেয়। বুলগেরিয় গেরিলাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায় এবং তাদের কয়েকটি দল বুলগেরিয়া-যুগোস্লাভ সীমান্তে জার্মান ও ইতালীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

যুগোস্লাভিয়ায় গেরিলা-আন্দোলন এতটা প্রসার লাভ করে এবং সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে এই গণ-আন্দোলনকে পরিচালনার জন্যে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি গণপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার হয়ে পড়ে। সুতরাং সেখানে একটি জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়।

যুগোস্লাভিয়ায় গেরিলাদের সাফল্য এবং জার্মান ও ইতালীয়গণ কর্তৃক অধিকৃত অন্যান্য দেশের এই গেরিলা-আন্দোলনের প্রভাব দেখে জার্মান ও ইতালীয়রা বিষম সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর অবতরণ এবং রোমেলের সৈন্যদলের পরাজয়ে তাদের ভয় আরো বেড়ে যায়। যুগোস্লাভিয়ায় গেরিলারা যুদ্ধ চালাবার ফলে উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যদের প্রত্যক্ষ-ভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে অনেক সাহায্য হয়; কেননা যুগোস্লাভ গেরিলাদের দমনের জন্যে যেসব জার্মান ও ইতালীর সৈন্যকে সেখানে নিয়োজিত রাখতে হয়েছিলো তাদের উত্তর আফ্রিকায় পাঠানো চলতো। এছাড়া আদ্রিয়াটিক উপকূলে গেরিলারা চলাচল-ব্যবস্থা নষ্ট করে দেবার ফলেও উত্তর আফ্রিকায় জার্মান এবং ইতালীয় সৈন্য পাঠাতে অসুবিধে হয়; কারণ আদ্রিয়াটিক উপকূলে সমাবেশ করে সেখান থেকে ত্রিপলি ও তিউনিসে অ্যাক্সিস সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল।

এই সমস্ত কারণে জার্মান ও ইতালীয়গণ যুগোস্লাভিয়ায় জাতীয়

মুক্তি আন্দোলন ও গেরিলা সৈন্যদলকে বিলুপ্ত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে জার্মান ও ইতালীয়রা গেরিলাদের বিরুদ্ধে তাদের চতুর্থ অভিযান সুরু করে। এই অভিযানে তারা বিমান, ট্যাঙ্ক ও কামানের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দেয়। ঐ বছর মার্চ মাসের গোড়ার দিকে অন্তত ৭টি জার্মান ও ৬টি ইতালীয় ডিভিসন এবং তাদের সঙ্গে পাভেলিক ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকের সৈন্যরা গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বিহাক, পেট্রোভাক, প্রোজর, বুগোনো, গর্ণজি-ভাকুফ এবং কঞ্জিকা শহরে তুমুল যুদ্ধ বাধে। কোন কোন এলাকায় প্রতিপক্ষের চাপে গেরিলারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়; কিন্তু সরে যাবার সময় তারা প্রভূত ক্ষতি করে যায়। একমাত্র গ্ল্যামক-ম্লিনিস্তে এলাকাযই প্রতিপক্ষের কয়েক হাজার সৈন্য হতাহত হয়। মাজকা ক্যাপর্ নামক একটি গ্রাম ঘেরাও করে গেরিলারা প্রতিপক্ষের প্রায় ১৫ শত সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে। গেরিলারা কেবল আত্মরক্ষারই জন্যে যুদ্ধ করেনি, তারা পাল্টা আক্রমণও চালায় এবং আকস্মিক ভাবে আক্রমণ চালিয়ে প্রোজর নামক শহরটি দখল করে। এইটি ছিল গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার একটি বড ঘাঁটি। এই শহর দখলের যুদ্ধে একমাত্র ইতালীরই ১১৫০ জন সৈন্য মারা যায়। গেরিলারা প্রতিপক্ষের ৫টি ট্যাঙ্ক, ৬টি কামান, ১০০ মেশিনগান, ৫০০ রাইফেল, ৪ লক্ষ কার্তুজ, ১০০০ গোলা এবং আরো অনেক সমরোপকরণ হস্তগত করে। প্রোজর দখলের পর গেরিলারা মস্টার-সারাজিভো রেলপথ ধরে আক্রমণ সুরু করে, কারণ এই রেলপথেই জার্মান ও ইতালীয়রা সৈন্য ও সমরোপকরণ আড্রিয়াটিক উপকূলে পাঠিয়ে সেখান থেকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠাচ্ছিলো। গেরিলারা ৮০ থেকে ১০০ শত কিলোমিটারের মতো রেলপথ ধ্বংস করে দেয় এবং প্রতিপক্ষের যোগাযোগপথ বিছিন্ন করে ফেলে। এর ফলে গেরিলারা

বিপক্ষের অনেক সৈন্যকে ধ্বংস করবার সুবিধে পায়। মস্টার—প্রোজর-কঞ্জিকা এলাকায় ইতালীর "মুরগে" ডিভিসন একরকম নিশ্চিহ্ন হয় বললে চলে। উক্ত ডিভিসনের ৪৫ জন অফিসার এবং ২০০০ সৈন্য নিহত এবং ২৫ জন অফিসার ও ১২০০ সৈন্য বন্দী হয়। তাছাড়া জার্মান ও বিশ্বাসঘাতক পাভেলিকের উস্তাসি সৈন্যদের মধ্যে ৩৫০ জন প্রাণ হারায়। এই এলাকা থেকে জার্মান ও ইতালীয়গণ তাড়াতাড়ি সরে পড়তে গিয়ে অক্ষত অবস্থায় ১৭টি ট্যাঙ্ক, ১৬টি কামান, ২৩০টি মেশিনগান, ২০ লক্ষ কার্তুজ এবং আরো অনেক সমরোপকরণ ফেলে রেখে যায়। গেরিলাদের সর্বাপেক্ষা বড জয় হয় গর্ণজি-ভাকুফ-বুগোনো এলাকায়। সেখানে তারা ৮ দিন ধরে ২টি জার্মান ডিভিসন এবং কয়েক ব্রিগেড উস্তাসি সৈন্যের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে এবং তারপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ৭১৮ নং এবং ৩৬ নং জার্মান ডিভিসন দুটি বিধ্বস্ত হয় বললে চলে। একটি যুদ্ধে ৮৫০ জন ফাসিস্ত সৈন্য মারা যায় এবং কয়েক হাজার সৈন্য আহত ও বন্দী হয়। লিচ নামক একটি এলাকায় গেরিলারা অফিসার ও সৈন্যে মিলে ১৬০০ জার্মানকে নিশ্চিহ্ন করে। এছাড়া ডালমাশিয়া, আদ্রিয়াটিক উপকূল এবং আরো বহু স্থানে গেরিলারা প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়। কয়েকটি গেরিলাদল একত্র হয়ে ইয়োটস্কি শহর দখল করে এবং সেটিকে ঘাঁটি করে তাঁরা ইয়োটস্কো-লুবুস্কি ও আদ্রিয়াটিক উপকূলে ত্রিধারা আক্রমণ চালায়।

স্লোভেনিয়ায় গেরিলারা ইতালীয় সৈন্যদের ওপর নিয়ত আক্রমণ চালিয়ে তাদের ক্লান্ত করে তোলে এবং বহু ইতালীয় সৈন্য মারাও যায়।

ফাসিস্ত সৈন্যরা গেরিলাদের বিরুদ্ধে কেবল অস্ত্র চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যুগোস্লাভিয়ায় জাতীয় মুক্তিকামীদের মধ্যে যাতে বিভেদের

সৃষ্টি হয় তার জন্যে তারা নানারূপ ঘৃণ্য প্রচারকার্যও চালাতে আরম্ভ করে। গেরিলাদের সম্বন্ধে তারা নানারূপ মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনা করতে থাকে এবং গেরিলা-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব উদ্ভট গুজব ছড়িয়ে দেয়। ফাসিস্তদের এই ধরণের প্রচারকার্যের সব চেয়ে বড় অস্ত্র ছিল "বলশেভিক" জুজুর ভয় দেখানো; অর্থাৎ যুগোস্লাভিয়ায় যারা মুক্তি-আন্দোলনে নেতৃত্ব করছিলো তারা মস্কোর চর ছাড়া আর কিছুই নয়—এ কথাটা জোর করে প্রচার করা। যুগোস্লাভিয়ার একদল বিশ্বাসঘাতককে দিয়েই এই প্রচারকার্য চালানো হয়। প্রথম দিকটায় তারা কপট স্বদেশপ্রেমের মুখোস পরে লোককে খানিকটা ধাপ্পা দিতে পেরেছিল, কিন্তু বেশিদিন তা চললো না। যতই প্রকাশ্যে তারা বিদেশী ফাসিস্ত সৈন্যদের সাহায্য করতে লাগলো, ততই লোকের কাছে তাদের স্বরূপটা প্রকাশ হয়ে পড়লো। এই সব বিশ্বাসঘাতকের কারসাজিকে প্রকাশ করে দেবার জন্যে গেরিলা বাহিনীর নেতৃবর্গ জাতীয় পরিষদের সংগে এক হয়ে তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জনসাধারণের নিকট এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। সেই বিবৃতিতে বলা হলো—প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক ও যুগোস্লাভিয়ার প্রত্যেক সুসন্তানের প্রধান লক্ষ্য হলো বিদেশীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করা। তা না হওয়া পর্যন্ত কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যবসা বাণিজ্যে ও কারো ব্যক্তিগত অধিকারে কোনক্রমে হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং সামাজিক জীবনে অথবা শাসন ব্যাপারে কোনরূপ আমূল পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করা হবে না। দেশের মুক্তি সংগ্রামেই সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত হবে। দেশ থেকে শত্রু বিতাড়িত হ'লে পর সমগ্র দেশবাসিগণ কর্তৃক স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা সমাজ ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর সমস্যার সমাধান করা হবে।

গেরিলারা সর্বত্র এই বিবৃতি-বর্ণিত নীতি মেনে চলে এবং যেখানেই জনসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে জার্মান ও ইতালীয়দের প্রতিরোধ করে সেখানেই তাদের প্রতিনিধিরা গেরিলাদের সমর্থন পায়। গেরিলারা কি সামরিক, কি বেসামরিক জীবনে মানুষের বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনতাকে মান্য করে চলে। তাদের ইস্তাহারে একথাও জোর দিয়ে বলা হয় যে, যুগোস্লাভিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে সফল করে তুলতে হ'লে ক্রোশিয়া, সার্বিয়া এবং স্লোভেনিয়ার জাতীয় অধিকারসমূহকে স্বীকার করতে হবে। আরো বলা হয় যে, এই সমস্ত প্রদেশের জনসাধারণ জার্মান ও ইতালীয়দের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যথার্থ সৌভ্রাত্র্য এবং বন্ধুত্বের পাকা ভিত্তি রচনা করছে। বলা বাহুল্য, এই বিবৃতি প্রচারের ফলে যুগোস্লাভিয়ায় গেরিলাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল তাদের সেই সন্দেহটুকুও দূর হলো এবং দেশের সর্ব-সাধারণ মুক্তি-সংগ্রামে অধিকতর উৎসাহী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলো। গেরিলাদের যুদ্ধচালনার পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধে ছিল উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব। প্রথম দিকে বহুদিন পর্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট থেকে যে-সব অস্ত্র তারা হস্তগত করতো সেগুলি দিয়েই তাদের যুদ্ধ চালাতে হতো। পরে অবশ্য মিত্রপক্ষের কাছ থেকে কিছুটা অস্ত্র সাহায্য তারা পায়। অস্ত্রের মতো আর এক সমস্যা ছিল তাদের খাদ্যের। জার্মান ও ইতালীয়রা যা পেত লুটতরাজ করে নিয়ে যেত এবং কোন গ্রাম বা শহর ত্যাগ করবার সময় তারা আগুন লাগিয়ে দিয়ে যেত। এর ফলে কোন খাদ্য অবশিষ্ট থাকলেও তা পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এসব কারণে গেরিলাদের খুবই খাদ্যের অভাব ঘটে। ফাসিস্ত-অধিকৃত এলাকায় অধিবাসীরা জার্মানদের খাদ্য রপ্তানী বন্ধ করবার একটা কৌশল আবিষ্কার করে। ফসল পাকার সময় হ'লেই কৃষকরা ফসল মলনের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলতো, তার ফলে প্রতিপক্ষ রপ্তানীর জন্যে

আর কোন মলন দেওয়া শস্য পেত না। কৃষকরা কাঠ দিয়ে ফসল মলন দিত এবং তারা তা নিজেদের কাজে লাগাতো।

অস্ত্র ও খাদ্যের অভাব তো ছিলই, তদুপরি যুগোস্লাভ গেরিলাদের পথে আর এক বড় অন্তরায় ছিল সেখানকার ফাসিস্তঘেঁষা তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট। সার্বিয়ার নেডিক এবং ক্রোশিয়ার পাভেলিক ছিলেন এই বিশ্বাসঘাতকদলের বড পাণ্ডা। এঁরা গোড়ার দিকে নিজেদের হিটলার-বিরোধী ব'লে প্রচার করতেন, কিন্তু পরে তাঁদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ড্রাজা মিহাইলোভিশও ছিলেন এঁদেরই দলে। তাঁরই কাহিনী এবার কিছু বলা যাক।

যুগোস্লাভিয়ার গেরিলাযুদ্ধের কথা যখন প্রথম বহির্জগতে প্রকাশ পায় তখন তার সঙ্গে মিহাইলোভিশের নামও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। ইস্তাম্বুল, কায়রো এবং লণ্ডন থেকে যুগোস্লাভিয়ার সম্বন্ধে যেসব প্রচার হতো তাতে এ কথাটাই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেত যে, মিহাই-লোভিশ এবং সার্বিয়ার চেৎনিকরাই যুগোস্লাভিয়ায় অসাধ্য সাধন করছে অর্থাৎ সেখানকার মুক্তি-আন্দোলনের যা কিছু কৃতিত্ব সবই তাদের প্রাপ্য। কিন্তু ১৬ই জুন যুগোস্লাভ জনসেনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের বেতার-কেন্দ্র থেকে ঘোষনা শুনে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। মণ্টে-নিগ্রো, বোকা কোটরস্কা এবং সান্দজাকের জনসেনার নায়কগণ একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে লণ্ডনে নির্বাসিত যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের সমর-সচিব ড্রাজা মিহাইলোভিশের স্বদেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কেবল তাই নয়, বিদেশী ফাসিস্তদের সঙ্গে সহযোগিতায় জন্যে তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগও আনা হয়। স্বাধীন যুগোস্লাভ বেতারে এই খবর প্রচারিত হবার পর মস্কো থেকে কতকগুলি খবরেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

ওপরে যে প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তাতে যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন

দলের প্রায় ৭৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত ছিল। গণসেনার নায়কগণ মিহাইলোভিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে লণ্ডনে যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন যে, প্রতিপক্ষের সহিত মিহাইলোভিশের সহযোগিতার পথ বন্ধ করা হোক। মিহাইলোভিশ গবর্ণমেণ্টের নাম করে গণসেনার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালান তাও বন্ধ করবার জন্যে লণ্ডনের যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। নায়কগণ ঘোষণা করেন যে, জনসেনা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেশের মুক্তির জন্যে সেই জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এর পরে স্লোভেনিয়ার গেরিলা বাহিনীর কর্তৃপক্ষও মিহাইলোভিশের বিরুদ্ধে একই রূপ অভিযোগ জানায়। ১০ই অগাস্ট যুগোস্লাভ জনসেনার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ মিহাইলোভিশ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন :

"যুগোস্লাভিয়ার বাইরে সংবাদপত্রসমূহে এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, যুগোস্লাভিয়ায় রেলপথসমূহ ধ্বংস এবং বিদেশী দখলকারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ড্রাজা মিহাইলোভিশের অধিনায়কত্বে হচ্ছে। জনসেনা ও স্বেচ্ছাসেনার সুপ্রিম কমাণ্ড যুগোস্লাভিয়ার জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম সম্পর্কে এই খবর অত্যন্ত মিথ্যা বলে মনে করে ; কেননা বিদেশী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ড্রাজা মিহাইলোভিশ কোন সংগ্রাম করছেন না। যুগোস্লাভিয়ায় জনসেনা ও স্বেচ্ছাবাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ড কর্তৃকই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। মিহাইলোভিশের চেৎনিকরা কার্যত রেলপথ-গুলি পাহারা দিচ্ছে। গণসেনা যাতে ধ্বংস না করতে পারে তজ্জন্য সারাজিভো ব্রড লাইনে বহু চেৎনিক মোতায়েন রয়েছে। জনসেনা ও স্বেচ্ছাবাহিনীর সেনাপতি তিতো কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই বিবৃতি প্রকাশ করা হলো।"

এর তিনদিন পরে মণ্টেনিগ্রোর ভ্লাডিমির ভ্লাহোভিশ নামক

একজন যুব নেতা মস্কো থেকে মিহাইলোভিশের বিরুদ্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগপূর্ণ বিবৃতি পাঠান। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগদান করে সেখানকার রিপাব্লিকানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। মাদ্রিদে ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর একখানি পা কাটা যায়। তিনি তাঁর বিবৃতিতে দেখান যে, ১৯৪১ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাস থেকে মিহাইলোভিশ বিশ্বাস-ঘাতকতা সুরু করেন; মেজর কালাবিশ নামে ড্রাজা মিহাইলোভিশের একজন অনুচর যুগোস্লাভিয়ার মুক্ত এলাকায় ফাসিস্তদের প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হবার আগেই গণসেনার বিরুদ্ধে চেৎনিকদের নিয়োজিত করেছিলেন। উজিচ্কা ও পোঝেগার নিকটে চেৎনিকগণ এবং গণসেনার মধ্যে লড়াই হয়। চেৎনিকরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকে বুঝতেও পারে যে নেতারা তাদের কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর গণসেনার সঙ্গে আর একটি যুদ্ধে কালাবিশ আহত হয়ে বেলগ্রেডের একটি হাসপাতালে নীত হন। যুগোস্লাভিয়ার 'কুইসলিং' নেডিক হাসপাতালে গিয়ে তাঁর প্রশংসনীয় কাজের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসেন। কেবল তাই নয়, লণ্ডন থেকে যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট সেই অবস্থায় কালাবিশকে হাসপাতালে একখানি মেডেল পাঠিয়ে দিয়ে সম্মানিত করেন।

ড্রাজা মিহাইলোভিশের আর একজন অনুচর কর্ণেল স্ট্যানিশিস মণ্টেনিগ্রোর মুক্ত এলাকায় ইতালীয়দের ব্যাপক অভিযান সুরু হবার আগেই মণ্টেনিগ্রোর কুখ্যাত গোয়েন্দা ক্রস্ট পোপোভিশের সংস্রবে আসেন। ইতালীয়দের কাছ থেকে অস্ত্র পেয়ে স্ট্যানিশিস যুগোস্লাভ গেরিলাদের বিরুদ্ধে চেৎনিকদের যুদ্ধে নিয়োজিত করে এবং চেৎনিকরা ইতালীয় মাউণ্টেন ডিভিসনগুলির সম্মুখভাগে থাকে।

এই সব যুগোস্লাভ বিশ্বাসঘাতকের কাণ্ড এবং তাদের প্রতি

লণ্ডনস্থ যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি দেখে কর্নেল অরোভিশ 'স্বাধীন যুগোস্লাভিয়া' শিরোনামায় এক বিবৃতি প্রচার করেন। তাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকদের সম্মানিত করে যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে যেসব ঘোষণা করা হয় সেগুলির নিন্দা করেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, প্রবাসী গবর্ণমেণ্টের এই আচরণের দ্বারা যুগোস্লাভিয়ার মুক্তির জন্যে সত্যই যেসব স্বদেশভক্ত প্রাণপাত করছে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে।

যুগোস্লোভিয়ার মুক্তিকামীদের এ আবেদন সত্ত্বেও লণ্ডন থেকে প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ড্রাজা মিহাইলোভিশের প্রতি পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেন এবং অ্যাক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আরো বলা হলো যে, যুগোস্লাভিয়ার যারা 'দ্বন্দ্বকলহপ্রিয়' তিনি তাদের সঙ্গে বেশ বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করে যাচ্ছেন। এই সময় নিউইয়র্কে একমাত্র 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় মিহাইলোভিশের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল সেইগুলি ছাপা হয়। এছাড়া আমেরিকা এবং ইওরোপের অধিকাংশ কাগজই তখন মিহাইলোভিশের গুণকীর্তন করছিলো; এমন কি কোন কোন কাগজে মিহাইলোভিশের বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা সব কল্পিত অভিযোগ প্রকাশ করা হচ্ছিলো। এসব সত্ত্বেও লণ্ডনের যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। তাঁরা তখনই বুঝতে পারছিলেন যে, মিহাইলোভিশের সুনাম আর বেশি দিন বজায় থাকবে না। তাঁরা তখন যুগোস্লাভিয়ায় হিটলারের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের কথা বড় করে না দেখে কেবল ভাবতে লাগলেন, কি করে মিহাইলোভিশকে বড় করে তোলা যায়। তাই তাঁরা জনসেনার বিরুদ্ধে মিহাইলোভিশের অভিযানকে 'কম্যুনিস্টদের সঙ্গে গোলযোগ' বলে প্রচার করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, এতে অ্যাক্সিস পক্ষেরই

সুবিধে হচ্ছিল ; কারণ তারাও চাইছিলো কম্যুনিস্টদের ধুয়া তুলে যুগোস্লাভিয়ার সর্বসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট এমনভাবে প্রচার করতে লাগলেন যেন অ্যাক্সিস পক্ষের বিরুদ্ধে যা কিছু সাফল্য সবই মিহাইলোভিশের চেষ্টায় হচ্ছে এবং অল্প সংখ্যক কম্যুনিস্ট তাতে বাধা দিচ্ছে। ওয়াশিংটনের যুগোস্লাভ দূত কন্‌স্ট্যান্টিন ফোতিশ স্পষ্টভাবেই বলে বসলেন ঃ

"যুদ্ধের আগেও যুগোস্লাভিয়ায় মণ্টেনিগ্রো কম্যুনিস্ট-আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে বিশেষ পরিচিত ছিল। মিহাইলোভিশ ঘোর কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী এবং সেই জন্যেই হয়তো তার ক্রমবর্ধমান শক্তি, প্রভাব ও জনপ্রিয়তা দেখে যুগোস্লাভিয়ার কম্যুনিস্টরা ভীত হয়ে পড়েছে। এই কারণেই তারা তাঁকে লোক চক্ষে হেয় করবার চেষ্টা করছে। কেননা তা হ'লেই যুগোস্লাভিয়ায় বলশেভিকবাদ-প্রতিষ্ঠার পথের একটি বড় কণ্টক দূর হয়ে যায়।"

মিহাইলোভিশকে যারা সমর্থন করতো তারা প্রচার করে বেড়াতো যে, মণ্টেনিগ্রোতে মিহাইলোভিশ কম্যুনিস্টদের সায়েস্তা করে সেখানকার বেয়াদপ 'পার্টিজান'দের (জনসেনা) চূর্ণ করে দিয়েছেন। এই খবর প্রচারিত হবার দিন কয়েক আগেই মস্কোর মারফৎ 'স্বাধীন যুগোস্লাভ' বেতারে প্রচার করা হয় যে, মিহাইলোভিশের অনুচর বাজো স্ট্যানিশিশের অধীনে চেৎনিকদের সহায়তায় ইতালীয়রা মণ্টেনিগ্রোর প্রায় তিন শ' স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে।

প্রায় ষোল মাসকাল বাইরে মিহাইলোভিশের সমর্থকরা যুগোস্লাভ জনসেনার সাফল্যের খবরগুলিকে মিহাইলোভিশের কৃতিত্ব বলে প্রচার করে। এই প্রচারের মূলে খানিকটা ছিল অজ্ঞতা এবং খানিকটা ছিল স্বার্থপরতা। স্বাধীন যুগোস্লাভ বেতারে জনসেনার যে-সমস্ত সাফল্যের কথা প্রচারিত হতো লণ্ডনে যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট সেগুলিকে তাদের

দেশের 'স্বদেশভক্তদের' অর্থাৎ মিহাইলোভিশের লোকদের কৃতিত্ব বলে প্রচার করতো। ২১শে অক্টোবর লণ্ডন থেকে প্রচার করা হলো, "জেনারেল ড্রাজা মিহাইলোভিশের পার্বত্য এলাকাস্থিত হেডকোয়াটার্স থেকে বেতারে বলা হয়েছে, দক্ষিণ বোসনিয়ায় তুমুল যুদ্ধ চলেছে। সেই যুদ্ধে জার্মান ও তাদের তাঁবেদার সৈন্যে মিলে ১২০০ লোক নিহত হয়েছে; আর ৬০০ থেকে ৯০০ এর মত দেশভক্ত হতাহত ও বন্দী হয়েছে।"

বিস্ময়ের কথা যে, এই পার্বত্য বেতার-কেন্দ্রটি ছিল যুগোস্লাভিয়ার জনসেনার সুপ্রিম কমাণ্ডের। বেতারে তাদের নামও বলা হতো। এই বেতারকেন্দ্র থেকে ড্রাজা মিহাইলোভিশ কোন দিনই কিছু বলেননি বা তাঁর কোন ঘোষণাও সেখান থেকে প্রচারিত হতো না। এইটিই স্বাধীন যুগোস্লাভিয়া বেতারকেন্দ্র নামে পরিচিত। এই বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মিহাইলোভিশ অ্যাক্সিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন না। অথচ লণ্ডনের যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট বহুদিন পর্যন্ত এই বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবরগুলিকে মিহাইলোভিশের খবর বলে চালাত। স্বাধীন যুগোস্লাভিয়ার বেতারে লিভনো দখলের খবর প্রচারিত হবার দশ দিন পর লণ্ডন থেকে ঘোষণা করা হলো যে, মিহাইলোভিশ লিভনো দখল করেছেন। যুগোস্লাভ জনসেনার সুপ্রিম কমাণ্ড কর্তৃক ক্লজুশ দখলের খবর প্রচারিত হবার একমাস পর লণ্ডন থেকে প্রচার করা হলো, "মিহাইলোভিশের সৈন্যরা এই শহর দখল করবার পর ইতালীয়রা বিমানাক্রমণে এটাকে বিধ্বস্ত করেছে। ক্লজুশের যুদ্ধে চেৎনিকরা অ্যাক্সিস পক্ষের ৭০ জনকে নিহত এবং ১০০ জনকে আহত করে।"

মজার ব্যাপার হলো এই যে, এক মাস আগে যুগোস্লাভিয়ার "পার্বত্য বেতারকেন্দ্র" থেকে প্রচারিত খবরকে মিহাইলোভিশের খবর

বলে চালাবার পর আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় মিঃ রে ব্রক নামে এক ভদ্রলোক এই স্বাধীন যুগোস্লাভ বেতার-কেন্দ্র সম্বন্ধে এক গবেষণা করে বসলেন যে, সম্ভবত ইতালী থেকে এই বেতার প্রচার করা হচ্ছে এবং এর পিছনে অ্যাক্সিস পক্ষের হাত রয়েছে; তারা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে নানা রকম অসুবিধার জন্যেই তাদের সৈন্যরা যুগোস্লাভিয়ায় মার খাচ্ছে। অথচ স্বাধীন যুগোস্লাভ বেতারে প্রচারিত খবরগুলি মস্কো বেতারে প্রায়ই প্রচার করা হচ্ছিল। আন্‌কারা থেকে একদল সুবিধেবাদী মস্কো বেতারে প্রচারিত খবরগুলিকে "কোন এক সূত্রে প্রাপ্ত" খবর বলে প্রচার করতো এবং সেইগুলিকে মিহাইলোভিশের কৃতিত্ব বলে চালিয়ে দিত।

যুগোস্লাভ গেরিলাদের বিরুদ্ধে মিহাইলোভিশের সমর্থকরা এই প্রচারকার্য চালাতে থাকে যে, তারা একদল কম্যুনিস্ট ছাড়া আর কেউ নয়; অর্থাৎ যুগোস্লাভিয়ায় সর্বসাধারণের সমর্থন তাদের পিছনে নেই। শুধু তাই নয়, এই সব প্রচারকের দল একথাও রটাতে থাকে যে, বাইরে থেকে এক দল লোক এসে যুগোস্লাভিয়ায় গোলমাল করছে এবং এরাই যুগোস্লাভ কম্যুনিস্ট গেরিলাদল নামে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই প্রচারকার্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্লোভেনিয়া, ক্রোশিয়া, সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, বোসনিয়া, ডালমাশিয়া, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি সকল এলাকার লোকই যে যুগোস্লাভ জনযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল একথা গোড়ার দিকেই বলা হয়েছে। সকল শ্রেণীর লোকই এই জনবাহিনীতে ছিল। জাতিবর্ণনির্বিশেষে লোক জনবাহিনীতে যোগ দেবার ফলেই যুগোস্লাভ জনসেনা অল্পদিনের মধ্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিদেশী বলতে একমাত্র সেখানে দু'টি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড জনসেনার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে। ইতালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারী এবং জার্মানীর সৈন্যদলের যে-সমস্ত ফাসিস্তবিরোধী সৈন্য দলত্যাগ করে

চলে আসে তাদের নিয়ে এই আন্তর্জাতিক ব্রিগেড দুটি গঠিত হয়; কিন্তু যুগোস্লাভ জনসেনার তুলনায় তারা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়। আপামর জনসাধারণ থেকে যে জনসেনার সৃষ্টি হয় তাতে নানা ধর্মাবলম্বী, নানা রাজনৈতিক মতে বিশ্বাসী এবং ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোকই তাকে পরিপুষ্ট করে। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে তারা দেশের বৃহত্তম স্বার্থকে স্থান দেয় এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফাসিস্ত কবল থেকে নিজেদের জন্মভূমিকে উদ্ধারের জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগ্রাম চালায়। অথচ যুগোস্লাভিয়ার পলাতক গবর্ণমেণ্ট এবং তাদের অনুচর ও সমর্থকবৃন্দ বিদেশ থেকে এদেরই নামে নানারূপ অপপ্রচার করতে থাকে। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে!

মার্শাল তিতো

যাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম জগৎবাসীর নিকট বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ওঠে সেই মার্শাল তিতো সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা যাক। যোশেফ ব্রজ্ তিতো ১৮৯০ খৃস্টাব্দে জাগ্রেবের নিকটে জাগোরজে নামক স্থানে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ক্রোট এবং মা ছিলেন চেক। ক্রোশিয়ায় তাঁর জন্ম হওয়ায় তিনি শৈশব থেকে এক বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে পরিবর্ধিত হন; সেই বিপ্লবী আবহাওয়ার মূলে ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে সৈন্যদলে ডাক পড়ায় তিনি একজন সাধারণ সৈনিক রূপে রুশিয়ায় যুদ্ধে যান। কিন্তু ১৯১৫ খৃস্টাব্দে তিনি দলত্যাগ করে রুশদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে তখন এক রুশ বন্দী-শিবিরে রাখা হয়। তার পর রুশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবে

তিনি জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বলশেভিকরা তাঁকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে দেয়। রুশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব দেখে তাঁর চোখ খুলে যায় এবং গণশক্তিতে তিনি বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তারপর বলশেভিক বিপ্লবকে শ্বাসরোধ করে মারবার জন্যে যখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গ রুশিয়ার বিরুদ্ধে চারদিক থেকে আক্রমণ চালায় তখন তিতো লালফৌজে যোগ দিয়ে তিন বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। সেখানে তিনি প্রথম স্বাধীনতার আস্বাদ পান এবং উপলব্ধি করতে পারেন যে, স্বাধীনতা লাভ ও তা রক্ষা করতে হ'লে কি কঠোর সংগ্রাম করতে হয়।

১৯২১ খৃস্টাব্দে তিনি যুগোস্লাভিয়ায় ফিরে আসেন। যুগোস্লাভিয়া তখন স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু সেই তথাকথিত স্বাধীনতায় তিনি খুশি হতে পারলেন না; কেননা তিনি দেখতে পেলেন যে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর আধিপত্যের বদলে সেখানে সার্বদের দলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ভাবলেন এই সার্বিয়ান আধিপত্য খর্ব করতে না পারলে যুগোস্লাভিয়ার যথার্থ মুক্তি নেই। তিনি অবিলম্বে এক কম্যুনিস্ট দল গঠনে হাত দিলেন; একজন ক্রোট শ্রমিক নেতা তাঁর ট্রেড ইউনিয়নসহ তিতোর কম্যুনিস্ট দলে এসে যোগ দিলেন এবং তার ফলে দলের শক্তি অনেকখানি বেড়ে গেল। এর ফলে ১৯২৩ খৃস্টাব্দে তিতো গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কারাগারে তিনি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর পড়াশুনা করলেন। মুক্তি পাবার পরে কর্মোদ্যম তাঁর আরো বেড়ে গেল এবং অবিচলিত ভাবে স্বীয় আদর্শের প্রতি তিনি এগিয়ে চললেন। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সার্বিয় দল যুগোস্লাভিয়ায় ডিক্টেটরতন্ত্র প্রবর্তন করে। প্রকাশ্যে কাজ করা অসম্ভব হওয়ায় তিতো তখন গুপ্তভাবে থেকে দলের কাজ চালান। তাঁর অনেক সহকর্মী ধৃত হয়ে পরে নিহত হন;

যুগোস্লাভ কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ডায়কোভিশও তাঁদের মধ্যে একজন। কম্যুনিস্ট পার্টিকে দমন করাই যুগোস্লাভ ডিক্টেটরতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে কিছুদিনের জন্যে দল খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু জোসেফ তিতো এবং তাঁর সহকর্মীরা দলকে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলবার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দে ডিক্টেটরতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্যে যুগোস্লাভিয়ায় সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলিকে নিয়ে এক সম্মিলিত দল কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হয়। তাদের কর্মসূচীর প্রথমে স্থান দেওয়া হয় ক্রোট, স্লোভেনিজ এবং বোসনিয়ার মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া; অর্থাৎ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়ায় তারা সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যুগোস্লাভ কম্যুনিস্ট পার্টি আবার অনেকখানি শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার স্টোয়াডিনোভিশের গবর্ণমেণ্ট যখন প্রকাশ্যেই ইতালীয় এবং জার্মান ফাসিস্তবাদের সমর্থক ও সহায়ক হয়ে উঠলো তখন ফাসিস্তবিরোধী দলগুলি সেই গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করবার জন্যে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক দলেব মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। এই সময় স্পেনের গৃহযুদ্ধে সেখানকার জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে জোসেফ তিতো স্পেনে গিয়ে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিলেন। সেখানে সামরিক ব্যাপারে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে আবার তিনি যুগোস্লাভিয়ায় ফিরে এলেন। হিটলার যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করলে পর সেখানকার প্রতিরোধ যখন এক সপ্তাহের মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে, জোসেফ তিতো তখন সদলবলে পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান এবং যুগোস্লাভ প্রতিরোধ বাহিনীকে গড়ে তোলেন। স্পেনে ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়েছিল এমন আরো কয়েকজন

সহকর্মী তিতোর পাশে এসে দাঁড়ান ; তাঁদের মধ্যে মণ্টেনিগ্রোর জনসেনা-অধিনায়ক ড্রাবসেভিক এবং বোসনিরার জনসেনার সেনাপতি নাদ্‌জ্‌এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলেছি হিটলারের বাহিনী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করলে সেখানকার জনসাধারণ যে অপূর্ব প্রতিরোধশক্তির পরিচয় দেয় তার কাহিনী শুনে যুগোস্লাভ জনসাধারণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। যুগোস্লাভিয়ায় যারা সার্বদের আধিপত্যকামী তারা বিশ্বাসঘাতক মিহাইলোভিশের দলে যোগ দিয়ে জার্মান ও ইতালীয় ফাসিস্তদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আরম্ভ করে। অপর দিকে যুগোস্লাভিয়ার যারা প্রকৃত স্বদেশভক্ত তারা তিতোর দলে যোগ দিতে থাকে এবং এইভাবে ক্রমশ তিতো-পরিচালিত জনসেনার শক্তি বেড়ে চলে। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার জাতীয় পরিষদ আহূত হয় এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দের যুগোস্লাভিয়ার গণপরিষদের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর আইভান রিবার এই জাতীয় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। জোসেফ তিতো যুগোস্লাভ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রীপদে নির্বাচিত হন। আপামর জনসাধারণ এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। বহুকাল যাবৎ যুগোস্লাভিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা ক্রোট, স্লোভেনিজ, বোসনিয়ান, মণ্টেনেগ্রিন, সার্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করে আসছিলেন, মার্শাল তিতোর অধিনায়কয়ত্বে সেই দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন জাতি একযোগে ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিল। যুগোস্লাভিয়ার প্রত্যেক জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে পরস্পর বিবদমান জাতিগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করার মধ্যেই রয়েছে সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির কৃতিত্ব।

মার্শাল জোসেফ তিতো অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তিনি

অত্যন্ত আমুদে লোক ; হাস্য পরিহাসে তিনি বিশেষ পটু এবং অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও তিনি তাঁর সহকর্মী ও সাধারণ সৈন্যদের সুখসুবিধের প্রতি দৃষ্টি রাখতে ভোলেন না। একজন উচ্চপদস্থ অফিসার থেকে একজন সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত সকলেই তাঁর নিকট সমব্যবহার পেয়ে থাকে। একজন সাধারণ সৈন্যের মৃত্যুসংবাদও তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তোলে ; আত্মীয়বিয়োগের তুল্য বেদনা তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পায়। তিনি অনেক বড় জিনিস নিয়ে ভাবেন, কিন্তু তাঁর সহকর্মী ও অনুচরদের ছোটখাট সুখদুঃখ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নন। তাঁর আচরণে এমন একটা মাধুর্য আছে যে, লোকে বিষাদপূর্ণ চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে এসে উৎফুল্ল মনে ফিরে যায়। মার্শাল তিতো যখন কোন বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন তখন তাঁকে পায়চারী করতে দেখা যায়। তাঁর চরিত্রে সর্বাপেক্ষা বড় গুণ আত্মপ্রত্যয়। তাঁর সংস্পর্শে যারা আসে তাদের মধ্যেও তিনি এই আত্মপ্রত্যয়কে জাগিয়ে তোলেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আত্মবিশ্বাসের অভাবেই মানুষ যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ে এবং সেই ক্ষেত্রে শৃংখলা শৃংখলে পরিণত হয়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী লোক যখন নিয়মানুবর্তী হয় তখন তাদের কর্মশক্তি অনেক বেড়ে যায়। মার্শাল তিতো তাঁর সহকর্মী ও অনুচরদের মধ্যে এই মনোভাবটাই সর্বদা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন।

রণনীতি সম্বন্ধে মার্শাল তিতো কেতাবী বিদ্যার ওপর বেশি আস্থাবান নন ; তিনি রণবিদ্যার বাস্তব দিকটার কথাই বেশি করে ভাবেন। মার্শাল তিতোর সহকর্মী মিলোভান জিলাস নামে এক ব্যক্তি মার্শাল তিতোর সম্বন্ধে লিখেছেন :

"১৯৪৩ খৃস্টাব্দে বসন্তকালের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। ড্রিনা নামে একটি খরস্রোতা নদী আমাদের পার হতে হবে। ইতালীয় সৈন্য এবং মিহাইলোভিশের চেৎনিক দল মিলে নদীটি কড়া ভাবে

পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে নদী পেরুবার জন্যে সেতুনির্মাণের কোন সরঞ্জাম ছিল না। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করলেন যে, সেই অবস্থায় নদী পার হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মার্শাল তিতোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নদী পার হওয়া যাবে এবং পার হতেই হবে। কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে মার্শাল তিতো বিস্তর ভাবেন; কিন্তু একবার সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে আর কোন বাধাই তাঁকে ঠেকাতে পারে না। ড্রিনা নদী পার হওয়ার জন্যে সকলে প্রস্তুত হচ্ছে, এই সময় তিতোকে আমি জিগ্যেস করলাম যে, আমরা নদী পার হতে পারব এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন কি করে? তিনি উত্তর দিলেন, 'বিশেষজ্ঞরা তাঁদের কাজ ভালভাবে জানেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময় সব জিনিস তাঁরা হিসেব করতে পারেন না। তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষের ইচ্ছা এবং জনসাধারণের উদ্যমের কোন শেষ সীমা নেই। আমাদের সেনাপতি ও সৈন্যদের দৃঢ় সংকল্প এবং উদ্যম আছে। তাতেই তারা পার হতে পারবে।' সত্যিই তাই হলো। আমাদের সৈন্যরা একরকম বিনা আয়োজনেই ড্রিনা নদী পার হলো এবং পাব হয়ে প্রতিপক্ষকে চূর্ণবিচূর্ণ করলো।

"যুগোস্লাভিয়ায় হিটলারের বাহিনী যখন চতুর্থবার অভিযান শুরু করে তখন তারা আমাদের বাহিনীকে পরিবেষ্টন করে নিশ্চিহ্ন করবার প্রয়াস পায়। আমরা সত্যই পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লাম। প্রতিপক্ষ চারদিক থেকে ক্রমশ আমাদের ওপর চেপে আসতে আরম্ভ করলো এবং মারাত্মক ভাবে আক্রমণ চালালো। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটা সহজ পথ তিতো বাৎলালেন। প্রতিপক্ষের পরিবেষ্টনের দুর্বল স্থান তিনি খুঁজে বার করলেন এবং সেই স্থান দিয়ে ব্যূহ ভেদ করে সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের পালাবার জন্যে নেরেটভা নদীর ওপর যেসকল সেতু ছিল সেগুলি তিনি ধ্বংস করবার আদেশ দিলেন।

জার্মানরা ভাবলো আমরা তাদের পরিবেষ্টনের মধ্যেই আছি। তিতো এদিকে তাড়াতাড়ি তাঁর সৈন্যদের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নেরেটভা নদীর ওপর অল্প সময়ের মধ্যে কতকগুলি কাঠের সেতু নির্মাণ করালেন এবং সেই সেতুর ওপর দিয়ে তাঁর সমস্ত বাহিনীকে নদীর অপর তীরে পাঠালেন। এমন কি তাঁর দলের চার হাজার আহত সৈন্যকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। নেরেটভা তীরে আমাদের ধ্বংস করবার জন্যে তিনটি জার্মান ডিভিসন প্রেরিত হয়েছিল। তারা বহু অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পেল যে আমরা তাদের ফাঁদ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। পাকা সেতুগুলি ভেঙ্গে দেওয়ায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে জার্মানরা নদী পেরিয়ে আর আমাদের পশ্চাদ্ধাবনও করতে পারল না। তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

"যুগোস্লাভিয়ায় জার্মানদের পঞ্চম অভিযানের সময় আমাদের প্রধান বাহিনী মণ্টেনিগ্রো এবং হার্টজেগোভিনায় ইতালীয় ফাসিস্ত সৈন্য ও মিহাইলোভিশের চেৎনিকদের উচ্ছেদ করছিলো। জার্মানরা সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অকস্মাৎ আমাদের মূল বাহিনীকে পৃষ্ঠ দেশ থেকে আক্রমণ করে বসলো। গোড়ার দিকে অবশ্য আমরা বুঝতে পারিনি যে, আমাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক; কিন্তু মার্শাল তিতো আগে থেকেই অবস্থা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং শত্রুর আক্রমণের পরিকল্পনাও টের পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। সময় তখন আমাদের হাতে অত্যন্ত কম, যা কিছু করবার তা তাড়াতাড়ি করতে হবে। তিতো আর কালবিলম্ব না ক'রে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করবার জন্যে আমাদের আদেশ করলেন এবং প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানের কথাও বলে দিলেন। আগের বারের মতো এবারও আমরা প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে পড়তে সমর্থ হলাম। মার্শাল

তিতো আমাদের যে-দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন সে দিকে না গিয়ে আমরা অন্য দিকে গেলে আর উপায় ছিল না; প্রতিপক্ষ আমাদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত। প্রতিপক্ষের পরিবেষ্টনের বাইরে এসে আমরা একথা বুঝতে পারলাম; কিন্তু তিতো টের পেয়েছিলেন অনেক আগেই। এ থেকেই বোঝা যায়, সেনাপতি হিসেবে মার্শাল তিতো কিরূপ বিচক্ষণ এবং তাঁর দূরদৃষ্টি কত বেশি।

"১৯৪২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ফাসিস্ত বাহিনীর তৃতীয় অভিযানের সময় আমাদের মধ্যে একটি সমস্যা দাঁড়ায় যে আমরা কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করব। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়; কিন্তু মার্শাল তিতো আমাদের অবিচলিত ভাবে কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে তার নির্দেশ দিলেন। তদনুসারে আক্রমণ করে আমরা জয়ী হলাম এবং আমাদের শক্তি বেড়ে গেল। এ ক্ষেত্রে পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, মার্শাল তিতোর নির্দেশিত পথে না গেলে আমাদের কি বিপদ হতো।. বলা বাহুল্য, মার্শাল তিতোর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সামরিক বিচক্ষণতাই যুগোস্লাভ মুক্তিবাহিনীকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তোলে।"

রাজনৈতিক ঐক্য

কেবল সামরিক ক্ষেত্রেই মার্শাল তিতো ঐক্য আনেননি, যুগো-স্লাভিয়ার বিভিন্ন জাতি ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও তিনি স্থায়ী ঐক্য স্থাপনে সমর্থ হন। আগেই বলেছি, যুগোস্লাভিয়ায় একটি মাত্র জাতির বাস নয়; ক্রোট, স্লোভেন, বোসনিয়ান, মুসলমান, মেসি-ডোনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির দক্ষিণাঞ্চলে বাস। যুগোস্লাভিয়ার প্রধান জাতি হলো সার্বগণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের ইতিহাসে দেখা

যায়, যুগোস্লাভিয়ায় সার্বদের প্রাধান্য নষ্ট করবার জন্যে বিভিন্ন জাতি চেষ্টিত ছিল। সার্ব জমিদার ও পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই কতকগুলি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। এই সব রাজনৈতিক দলের পিছনে জনসাধারণের সমর্থন না ছিল এমন নয়, কিন্তু দলগুলিতে নেতৃত্ব করতেন স্থানীয় জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিরা। কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে এই সব দলে ভাঙ্গন ধরে। বিভিন্ন জাতির প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে ভীত হলেন ; তাঁদের মধ্যে একদল গিয়ে হিটলার ও মুসোলিনীর পক্ষে যোগ দিলেন এবং আর একদল লণ্ডনপ্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ নিলেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণ ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা মার্শাল তিতোর দলে এসে যোগ দিলেন।

সার্বিয়া আগাগোড়াই যুগোস্লাভ প্রতিক্রিয়াশীলতার কেন্দ্র ছিল। ১৯২৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সার্ব র‍্যাডিক্যাল পার্টির উগ্র নীতি সেখানে প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। উক্ত দলের নীতি ছিল যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য জাতির ওপর সার্বদের আধিপত্য করা। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের পরেও ডিক্টেটরতন্ত্র চালু থাকে সত্য, কিন্তু সার্বগণ তাদের পুরণো র‍্যাডিক্যাল পার্টিকে ভেঙে পর পর দুটি আধা ফাসিস্ত সরকারী দল গঠন করে। একটির নাম যুগোস্লাভ ন্যাশনাল পার্টি (জে, এন, এস) এবং অপরটির নাম যুগোস্লাভ র‍্যাডিক্যাল ইউনিয়ন (জে, আর, জেড)। প্রথমোক্ত দলের নেতা হন ডিক্টেটর জেভিশ ও জিভকোভিশ এবং দ্বিতীয় দলের নেতা হন অ্যাক্সিস সমর্থক প্রধানমন্ত্রী স্টোজাডিনোভিশ। উত্তরকালে এই দুই সরকারীদলের একদল বেলগ্রেডে হিটলারের তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন এবং আর একদল কায়রোতে প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন। এঁদের সঙ্গে 'জবর্' নামে ছোট একটি ফাসিস্ত দলও যোগ দেয়। জেভিশ লণ্ডনে রাজদূত এবং জিভকোভিশ রাজা পিটারের

সামরিক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী পুরিশ এবং স্বরাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণ সচিবও যুগোস্লাভ র‍্যাডিক্যাল ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সার্বিয়ায় জে, এন, এস ও জে, আর, জেড-এর বিরুদ্ধে তথাকথিত সম্মিলিত সার্ববিরোধী দল নামে একটি দল গঠিত হয়; র‍্যাডিক্যাল, সার্ব ডেমোক্রাট ও সার্ব কৃষকদল মিলে এই বিরোধী দল গঠন করে। গোড়ার দিকে লণ্ডনে পর পর যে প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তার মূলে ছিল এই তিন দলের হাত। পরে অবশ্য ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের শরৎকালে প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট লণ্ডন থেকে কায়রোতে স্থানান্তরিত হয় এবং পুরিশ তার প্রধানমন্ত্রী হন। লণ্ডনে গোড়ার দিকে যাঁরা যুগোশ্লাভ গবর্ণমেণ্ট গঠন করেছিলেন স্বদেশ থেকে দূরে থাকায় ক্রমশ তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় এবং তাঁরাও কায়রোর যুগোস্লাভ কর্তাদের সমপর্যায়ে নেমে আসেন।

এদিকে যুগোস্লাভিয়ায় ডেমোক্রাট ও কৃষকদলের কয়েকজন নেতা তাঁদের দলের ঘোষিত নীতির মর্যাদা রক্ষা করে মার্শাল তিতোর সঙ্গে এসে যোগ দেন। বলা বাহুল্য, যুগোস্লাভিয়ার মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেণ্ট আইভান রিবার এই ডেমোক্রাট দলের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং উক্ত পরিষদের পাঁচজন ভাইস প্রেসিডেণ্টের অন্যতম সেনেটর মার্কো বুযাশিষ কৃষক দলের একজন প্রাচীন নেতা।

সার্বিয়ার এসব প্রাচীন বিরোধী দলের সঙ্গে ক্রোশিয়ার ক্রোট কৃষক দল এবং স্বাধীন গণতন্ত্রী দলের যোগাযোগ ছিল; এই দল দুটি ক্রোশিয়ায় সার্বদের প্রতিনিধিত্ব করতো। এই দুটি দল মিলে একটি কৃষক গণতন্ত্রী সম্মিলিত দল গঠিত হলো এবং ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে সম্মিলিত সার্ব বিরোধী দলের-সঙ্গে এক চুক্তি করলো। কৃষক দলের নেতা ছিলেন ডক্টর ম্যাচেক এবং এই দলের পেছনে ক্রোটদের শতকরা প্রায় ৯০

জনের সমর্থন ছিল। এর মধ্যে গণতন্ত্রী দরিদ্র কৃষক শ্রেণী এবং ইতালীয়-দের প্রতি অনুরক্ত ও ক্যাথলিক রাজতন্ত্রের ভক্ত ক্রোট পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী দুইই স্থান লাভ করেছিল। কিন্তু হিটলারের আক্রমণের পর এই দলে ভাঙ্গন ধরে। দলের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা ক্রোশিয়ায় জাতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং প্রতিপক্ষের ফাসিস্ত কবল থেকে ক্রোশিয়াকে উদ্ধার করার পর নিজেদের দলকে যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ঢেলে সাজেন। অপর দিকে দলের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যে দেশদ্রোহী পাভেলিক কর্তৃক নিযুক্ত ডক্টর ম্যাচেকের ক্রোট গবর্ণমেণ্টে যোগ দেন এবং কেউ কেউ অন্তরালে থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করেন। এই দলেরই একজন নেতা ক্রান্‌জেভিশ বিদেশে থেকে প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টে বারংবার মার্শাল তিতোর বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করেন। অবশ্য এই দলের কোন কোন প্রবাসী নেতা মার্শাল তিতোকে প্রকাশ্যে সমর্থনও করেন; তাঁদের মধ্যে বিকানিশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্রোশিয়ার স্বাধীন গণতন্ত্রী দলেব মধ্যেও ঠিক একই রূপ বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং এই দলের অনেক প্রভাবশালী নেতা মার্শাল তিতোর পক্ষে যোগ দেন।

স্লোভেনিয়ায়ও ঠিক একই অবস্থা ছিল; সেখানকার ক্যাথলিক স্লোভেন পিপ্‌ল্‌স্ পার্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক ধর্মযাজকগণ, জমিদার ও শিল্পপতিদের প্রাধান্য ছিল। তবে এই দলের পিছনে কৃষক-শ্রেণীর সামান্য সমর্থন ছিল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে স্লোভেনিয়ায় এই দলের নেতারা ইতালীয়দের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয় এবং নাটলাসেন ও আরলীশ নামে দু'জন প্রধান দেশদ্রোহী জনসেনা কর্তৃক নিহত হন। বলা বাহুল্য, স্লোভেন পিপ্‌ল্‌স পার্টির যেসব নেতা রাজার সঙ্গে দেশ থেকে পালিয়ে যান তাঁরা লণ্ডন ও কায়রোতে নানাভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয়

দেন। স্লোভেনিয়ায় পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কার্যকরী বিরোধিতা করতো একমাত্র সেখানকার ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি। দলটি ক্ষুদ্র হ'লেও বিপ্লবী ছিল। এই দলেরই কয়েকজন নেতা প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং মুক্তি পরিষদে বিশেষ দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দেন।

যুগোস্লাভিয়ার এইগুলি ছিল প্রধান রাজনৈতিক দল। এছাড়া আর একটি দলের নাম করা যায়, সেটি হলো বোসনিয়ান মোসলেম পার্টি। অনগ্রসর মোসলেম জমিদার শ্রেণী এবং সারাজিভোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রভৃতি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা এই দলে প্রাধান্য করতো। আগাগোড়া এই দল ডিক্টেটরী গবর্ণমেণ্টগুলিকে সমর্থন করে এসেছে এবং যুগোস্লাভিয়ায় জার্মান অভিযানের পর তাঁবেদার পাভেলিকের গবর্ণমেণ্টকেও এই দল সমর্থন করেছে। এই দলের কোন প্রতিনিধি প্রবাসে ছিলনা বা যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিসংগ্রামেও এই দলের কোন প্রতিনিধি যোগ দেয়নি; তবে স্বাধীন ভাবে অনেক মুসলমান মার্শাল তিতোর সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভায় বন বিভাগের মন্ত্রী হন একজন মুসলমান।

ম্যাসিডোনিয়ায় ডিক্টেটরতন্ত্রের ফলে আইনত কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিলনা; কিন্তু সেখানকার বে-আইনী ব'লে ঘোষিত সম্মিলিত স্বাধীনতাকামী দল (ইউনাইটেড ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স মুভ্‌মেণ্ট) মুক্তি-সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই দলের নেতা ডিমিটর ভ্লাহফ তিতোর মুক্তি-পরিষদে একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট হন।

যুগোস্লাভ মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেখানকার প্রাচীন রাজনৈতিক দলগুলির প্রগতিশীল অংশসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯১৮ থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যা সম্ভব হয়নি, যুগোস্লাভ জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়। এছাড়া আরো বড় কথা হলো এই যে, যুগোস্লাভিয়ার যে লক্ষ লক্ষ

লোক এই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ছিল, তারাও এই মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক সূত্রে গ্রথিত হয়। অজ্ঞ, নিরক্ষর চাষী ও দিনমজুর যাদের মধ্যে কোনো রকম রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, তারা দেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়ে এক নতুন চেতনা লাভ করে; এই জাগ্রত জনমতের কাছে প্রতিক্রিয়াশীলদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থের ঊর্ধে উঠে যুগোস্লাভ জাতি জগতের সমক্ষে স্বাধীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মার্শাল তিতোর অধিনায়কত্বে যুগোস্লাভিয়ার রূপান্তর ঘটে।

প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট মার্শাল তিতোকে স্বীকার করে নিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধে মিত্রপক্ষ অবশ্য মার্শাল তিতোকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। বৃটিশ বিমান-সেনা এবং স্থলসেনা যুগোস্লাভ জনসেনাকে বিমান ও ট্যাঙ্কচালনা শিক্ষা দেবার জন্যে যুগোস্লাভিয়ায় প্রেরিত হয়। এদিকে প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টেও পরিবর্তন ঘটে। প্রতিক্রিয়াশীল পুরিশকে গবর্ণমেণ্ট থেকে সরিয়ে রাজা পিটার একটা আপোষের চেষ্টা করেন এবং সার্ব ডেমোক্রাট দলের দক্ষিণপন্থী নেতা মঃ যোভানাভিশকে পুনরায় মন্ত্রিসভার ভার দেন; কিন্তু তিতোর সমর্থক প্রবাসী যুগোস্লাভ নেতারা তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে ক্রোট নেতা ডক্টর সুবাসিক একাই এক গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন এবং তাঁর প্রথম চেষ্টা হয় মার্শাল তিতোর সঙ্গে একটি চুক্তি করা। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ডক্টর ইভান সুবাসিকের সঙ্গে মার্শাল তিতোর এবং যুগোস্লাভ মুক্তি-আন্দোলনের অন্যান্য নেতার মধ্যে তিনদিন আলোচনার পর এক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এর পর ৭ই অগাস্ট লণ্ডনে ডক্টর সুবাসিকের নতুন মন্ত্রিসভা কর্তৃক এই চুক্তি সমর্থিত হয় এবং তারপরে সুবাসিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে

যুগোস্লাভ জাতির উদ্দেশে এক বেতার ঘোষণায় বলা হয় যে, তিতোর জাতীয় মুক্তি পরিষদই অস্থায়ীভাবে যুগোস্লাভিয়ায় শাসনকার্য পরিচালনার অধিকারী; সমস্ত যুগোস্লাভ যেন মার্শাল তিতোর মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয়। এ ছাড়া আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যুগোস্লাভ বাহিনীর জন্যে বাইরে থেকে সরবরাহ পাঠাবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করা হবে। যুগোস্লাভিয়ায় যারা প্রকাশ্যে বা গোপনে জার্মানদের সাহায্য করছিল তাদের আচরণের নিন্দা করে উক্ত বেতার ঘোষণায় বলা হয় যে, তাদের বিচার একদিন জনসাধারণের আদালতে করা হবে। এক গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বেতার ঘোষণায় স্বীকার করা হয়। এই ভিত্তিতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে আবেদন জানিয়ে বলা হয় যে, দেশের অন্যান্য আভ্যন্তর সমস্যার সমাধান দেশ স্বাধীন হবার পর করা হবে।

লণ্ডনে মার্শাল তিতোর প্রতিনিধি জেনারেল ভেলেবিট প্রবাসী যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের এই বেতার ঘোষণা সন্তোষজনক বলে মেনে নেন। এর পর রাজা পিটার ও মার্শাল তিতোর মধ্যে আর একবার শক্তির পরীক্ষা হয়ে যায়। যখন স্থির হয় যে, স্বাধীন যুগোস্লাভিয়ায় গণভোট না হওয়া পর্যন্ত রাজা পিটার দেশে ফিরতে পারবেন না, তখন রিজেণ্ট অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ নিয়ে এক গোলোযোগ বাধে। রাজা পিটার নানা টালবাহানা করে তিতো-সুবাসিক চুক্তি নাকচ করে দিতে চান, কিন্তু মার্শাল তিতো তাতে বেঁকে বসেন। চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত সুবাসিককে রাজার মেনে নিতে হয় এবং মার্শাল তিতোর মতানুসারেই রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয়। রাজা পিটার ও তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থকগণ ভালোভাবেই বুঝতে পারেন যে, যুগোস্লাভিয়ায় মার্শাল তিতোর বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব

নয়। ত্যাগ, সেবা ও শৌর্যবীর্য দ্বারা মার্শাল তিতো যুগোস্লাভ জাতির মনে যে দৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেখান থেকে তাঁকে সরানো মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির কাজ নয়। নব জাগ্রত যুগোস্লাভিয়ায় মার্শাল তিতো আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক। তাঁর নেতৃত্বে আত্মকলহ ভুলে গিয়ে যুগোস্লাভিয়ার আপামর জনসাধারণ মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে তা' থেকে তাদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা যারাই করবে তাদেরই বিরুদ্ধে সেখানকার জনশক্তি নির্ভীক চিত্তে উন্নত শিরে রুখে দাঁড়াবে—এ কথা নিশ্চয় করেই বলা যায়।

ফ্রান্স

১৯৪০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্স জার্মান-কবলে যায়। সেখানেও দেশ-প্রেমিকরা গুপ্তভাবে জার্মানদের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে মিত্র বাহিনীর অবতরণ ও পাল্টা অভিযানের পথ ফ্রান্সের এই প্রতিরোধ-বাহিনী অনেকখানি সুগম করে রেখেছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীর সংগ্রামের ইতিহাসও কম গৌরবোজ্জ্বল নয়। কবে এবং কোথায় এই ফরাসী প্রতিরোধ-সেনার উৎপত্তি হয়েছিল বলা কঠিন। তবে প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং জার্মান বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণে ফ্রান্সের মেরুদণ্ড যেদিন ভেঙ্গে পড়লো সেদিন সেখানকার যুবশক্তির মধ্যে এক নতুন চেতনা দেখা দিল এবং তারা তখন মুক্তির নতুন পথ খুঁজতে লাগলো। এ থেকেই ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীর উৎপত্তি। এই প্রতিরোধবাহিনী ফ্রান্সে গোড়ার দিকে

'মাকি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তার পরে এই সেনার নাম হয় অন্তর্বর্তী ফরাসী বাহিনী (F. F. I.)। ফ্রান্সের এই প্রতিরোধ-বাহিনী অর্থাৎ ফরাসী জনসেনার কথাই এখানে বলা যাক।

যে স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় ফরাসী জনসেনা গড়ে ওঠে তার দু'একটা দৃষ্টান্ত গোড়ার দিকেই দেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সের কোনো একটি স্থানে আমেল নামক বার বছর বয়সের একটি ফরাসী বালককে যখন জার্মানরা গুলী ক'রে মারে তখন সে চিৎকার ক'রে বলে ওঠে, "তোমরা আমাকে খুন করতে পার, কিন্তু প্যারিসকে খুন করবার শক্তি তোমাদের নেই।" ফ্রান্সের আইনসভার ডেপুটি পরিষদের সদস্য গাব্রিয়েল পেরি যখন জার্মানদের গুলীতে প্রাণ বিসর্জন দেন তখন তিনিও বলে যান, "ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যেই আমি মৃত্যুকে বরণ করছি। আমার যদি পুনর্জন্ম হয় তবে আমি আবার এই একই পথ অনুসরণ করব।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীরা তাঁকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করে। ফরাসী রেলওয়ে শ্রমিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক পিয়ের সামারকে হত্যার জন্যে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "আমার অমরত্ব লাভের সময় এগিয়ে আসছে; কিন্তু আমি জানি, হিটলারের যে অনুচরেরা আমাকে গুলী করবে তাদের পরাজয় ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্স আবার তার বৃহৎ সংগ্রাম শুরু করতে সমর্থ হবে।" ১৯৪০ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ফ্রান্সের পতন হবার পর থেকে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার পর্যন্ত বহু ফরাসী স্বদেশ-প্রেমিককে এইভাবে নাৎসীদের গুলীর মুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। মৃত্যুর আগে তাদের সবারই মুখে একবাক্য ধ্বনিত হয়েছে, "ফ্রান্স মরেনি, আপন বলে সে আবার তার নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করবে।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলাদলি অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং তারই সুযোগ নিয়ে ফরাসী ফাসিস্তপন্থীরা ফ্রান্সকে পৃষ্ঠদেশ

থেকে ছোরা মেরে হিটলারের হাতে তুলে দেবার সুযোগ পেয়েছিল। ফ্রান্সের পতনের পর প্রগতিশীল দলগুলি একত্র হবার চেষ্টা করলো এবং তা থেকেই ফরাসী মুক্তি পরিষদের সৃষ্টি হলো। এই মুক্তি পরিষদই ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলো এবং ফরাসী গেরিলারাও মুক্তি পরিষদের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে এক শক্তিশালী জন-সেনায় পরিণত হলো। আগেই বলেছি, ফরাসী জনসেনার উৎপত্তি কবে কোথায় হয়েছিল ঠিক করে বলা কঠিন। সম্ভবত একই সময়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে ফরাসী গেরিলা বাহিনীর উৎপত্তি হয় এবং পরে সেগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে সংহত ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীর সৃষ্টি হয়।

ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের গোড়ার দিকের ইতিহাস যা-কিছু পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৯৪০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্যাঁ-দেনি নামক স্থানে কফীখানা ও রেস্তোরাঁগুলিতে একদল ফরাসী যুবক সমবেত হতে আরম্ভ করে এবং সব গুপ্ত ইস্তাহার প্রচার করতে থাকে। ঐ সব ইস্তাহারে সাধারণত এই ধরণের আবেদন থাকত, "ফরাসী জাতির প্রতি আবেদন। আমাদের জাতি কখনো মরবে না। বিদেশী বিশ্বাসঘাতক, শোষক ও লুণ্ঠনকারীরা স্বদেশপ্রেমকে ধ্বংস করতে পারবে না।" অপর দিকে লণ্ডন থেকে জেনারেল দ্য গল্‌ও ফ্রান্সের মুক্তির জন্যে ফরাসী জাতির উদ্দেশে আবেদন করেন। বলা বাহুল্য, দু'দিক থেকে আবেদন আসবার ফলেই ফরাসী জাতি মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৪০ খৃস্টাব্দে প্যারিসে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে যার ফলে প্যারিসবাসীদের মধ্যে আপনা থেকেই প্রতিরোধস্পৃহা জেগে ওঠে। ঐ বছর ৫ই অক্টোবর নাৎসীরা প্যারিসে ব্যাপকভাবে ধরপাকড়ের আদেশ দেয়। শ' শ' প্যারিসবাসী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়; মেয়র,

ফরাসী ডেপুটি পরিষদের ডেপুটিগণ, কাউন্সিলর, ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারি কেউ তা থেকে বাদ পড়েননি। এক বছর পরে এই সব বন্দীর অনেককে শাতোব্রিয়াঁতে গুলী করে হত্যা করা হয়। সে বছরই ১১ই নবেম্বর অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধবিরতি দিবসে প্যারিসের ছাত্ররা গত যুদ্ধের মৃত সৈনিকদের স্মৃতিতর্পণের জন্যে রাস্তা দিয়ে মার্চ করে আঁর্ক দ্য-ত্রিয়ঁফ-এ যায়। নাৎসীরা তাদের অনেককে গুলী করে হত্যা করে এবং বহু ফরাসী ছাত্র বন্দীও হয়। এই ব্যাপারে ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠেন। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের মে মাসে পা-দ্য কালের খনির শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। সেখানে ফাসিস্তদের সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল। এভাবে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা দেশের মুক্তির জন্যে এক সূত্রে আবদ্ধ হয়। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন জার্মানরা যখন সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করে তখন ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনে আশ্চর্য রকম জোর ধরে। এই আন্দোলন দমনের জন্যে সমগ্র ফ্রান্স জার্মান গোয়েন্দায় ছেয়ে যায় এবং ভিশির তাঁবেদার ফরাসী কর্তৃপক্ষও এই আন্দোলন-দমনে নাৎসীদের সাহায্য করতে থাকে। নানারূপ কঠোর আইনের বেড়াজাল ফেলে নাৎসীরা ফরাসী স্বদেশপ্রেমিকদের সায়েস্তা করবার জন্যে চেষ্টা করে। বহু ফরাসীকে তারা নজরবন্দী রূপে আটক করে রাখে এবং ফরাসী জনসেনার আক্রমণে জার্মানদের ক্ষতি হয়েছে শুনলে তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে নাৎসীরা সেই সব ফরাসী নজরবন্দীদের হত্যা করতে থাকে। এর ফলে অনেক নিরপরাধ ফরাসীকেও প্রাণ হারাতে হয়। নাৎসীদের এই অত্যাচার ফরাসীদের প্রাণে প্রতিরোধস্পৃহা আরো বাড়িয়ে তোলে।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে আমিয়াঁর ডেপুটি জাঁ কাতলা নাৎসীদের বিচারে নিহত হন। কিন্তু মৃত্যুর আগে কারাগার থেকে তিনি এক বাণী দিয়ে যান, "ফ্রান্সের অধিবাসিগণ, তোমরা সশস্ত্র হও।

নিজেদের ব্যাটেলিয়নসমূহ গঠন কর।" এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্সে যে প্রথম প্রতিরোধকারী দলের উদ্ভব হয় তার নাম এফ-টি-পি-এফ (অর্থাৎ ফরাসী গেরিলা ও পার্টিজান দল)। অবশ্য প্রায় একই সময়ে ফ্রান্সের অন্যান্য স্থানেও এই ধরণের প্রতিরোধী দল গড়ে ওঠে।

এফ-টি-পি-এফ-এর গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে। এই ভাবে সৈন্যদল গঠিত হয়ঃ স্কোয়াড, ডিটাচ্‌মেণ্ট, কম্পানী এবং ব্যাটেলিয়ান। প্রত্যেক স্কোয়াডে সাত জন করে সৈন্য ও একজন করে নায়ক ছিলো। এছাড়া নায়ককে দু'জন ডেপুটি সাহায্য করতেন। একজন ডেপুটির কাজ ছিল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা, অপর জনের কাজ ছিল প্রতিপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করা। এ ছাড়া প্রত্যেকটি স্কোয়াড তিনজন সৈন্য নিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাদের একজন করে পরিচালক থাকতেন। এই দু' দলের মধ্যে এক দল আর এক দলের কোন খবর রাখত না। একমাত্র পরিচালক স্কোয়াডের ডেপুটি লীডারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। তিনটি কি চারটি স্কোয়াডে মিলে একটি ডিটাচ্‌মেণ্ট গঠিত হতো। ডিটাচ্‌-মেণ্টেরও একজন নায়ক এবং দু'জন করে ডেপুটি লীডার অর্থাৎ সহকারী নায়ক ছিলেন। এছাড়া রাজনৈতিক ব্যাপারে ও প্রচারকার্যে সহায়তার জন্যে ডিটাচ্‌মেণ্ট-নায়কের একজন করে দেহরক্ষী থাকতেন। তিন বা ততোধিক ডিটাচ্‌মেণ্টনিয়ে এক একটি এলাকার জন্যে এক একটি কম্পানী গঠিত হতো এবং স্থানীয় মিলিটারী কমিটি কর্তৃক কম্পানী পরিচালিত হতো। কম্পানীর সেনানীমণ্ডলে থাকতেন একজন করে ক্যাপ্‌টেন, একজন রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্রচার, সরবরাহ ও সৈন্য-সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসার। কোন একটি এলাকায় একাধিক কম্পানী গঠিত হ'লে রিজিয়নাল মিলিটারী কমিটি ব্যাটেলিয়ান-সেনানীমণ্ডলে পরিণত হতো। রিজিয়নাল মিলিটারী কমিটিগুলি

ইণ্টার-রিজিয়নাল মিলিটারী কমিটির অধীন ছিল এবং শেষোক্ত কমিটিগুলি ছিল ন্যাশনাল মিলিটারী কমিটির অধীন।

এই ফরাসী প্রতিরোধী সৈন্যদলের খানকয়েক গুপ্ত পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাগুলিতে শত্রু-সৈন্যের অবস্থান, তাদের গতিবিধি, সরবরাহ প্রভৃতির খবর থাকতো এবং সেই খবর দেখে গেরিলারা প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাতো। এ ছাড়া এই সব পত্রিকায় মুক্তিসংগ্রামে যোগদানের জন্যে ফরাসী জাতির উদ্দেশে আবেদন করা হতো।

ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের প্রতিরোধী দল গড়ে ওঠে। গোড়ার দিকে অবশ্য সকল দলের নাম এক ছিল না এবং সেগুলির মধ্যে যোগাযোগেরও অভাব ছিল। পরে বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের পার্বত্য অঞ্চলেই ছিল গেরিলাদলের প্রধান ঘাঁটি।

প্রতিরোধী দলে কেবল যে সশস্ত্র যোদ্ধারাই ছিল এমন নয়, তাদের পিছনে ছিল ফরাসী জনগণের সমর্থন। অসামরিক দিকে ফ্রান্সের ট্রেড-ইউনিয়নগুলি ছিল সেখানকার জনসেনার প্রধান সহায়ক। ফ্রান্সেব এই প্রতিরোধীদের মধ্যে যারা নিয়মিত সৈন্য ছিল তাদেরই বলা হতো মাকি। মাকি কথাটির উৎপত্তি কর্সিকায়। সেখানে যে সকল পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলে সমাজবহির্ভূত লোকেরা বাস করতো সেই অঞ্চলকেই মাকি বলা হয়। ফ্রান্সেও গেরিলাদলের প্রধান ঘাঁটি পার্বত্য এলাকায় বলে তারা মাকি নামটি বেছে নেয়। গোড়ার দিকে মাকিরা প্রধানত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : (ক) প্রথম দল ছিল কম্যুনিস্টগণ এবং তাদের সংগৃহীত জনসেনা ; এবং (খ) দ্বিতীয় দল ছিল গুপ্ত সেনা অর্থাৎ ফ্রান্সে সামরিক বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোক নিয়ে গঠিত প্রতিরোধ বাহিনী।

মাকি দলে ১৮ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত সকল বয়েসেরই লোক ছিল। বনে-জঙ্গলে এবং পাহাড়ে-পর্বতে তাদের গুপ্তভাবে অবস্থান করতে হতো। ফ্রান্সের সাধারণ আইনের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। দেখামাত্রই তাদের গ্রেপ্তার করবার হুকুম ছিল এবং রাত্রে দিনে যে কোন মুহূর্তে তাদের গুলী করে মারা হতো। জার্মান-কবলে যাবার পর ফ্রান্স নাৎসী গুপ্তচরে ছেয়ে গিয়েছিল; তদুপরি ফরাসী তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টও মাকিদের ধরিয়ে দেবার ব্যাপারে জার্মানদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করতো। এইভাবে দেশী ও বিদেশী শত্রুর মধ্যে থেকে ফ্রান্সের স্বদেশপ্রেমিকদের কি কষ্টে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কেউ এসে মাকি দলে যোগ দিলেই তাকে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভূলে যেতে হতো। বাড়ীঘর ছেড়ে তাকে গিয়ে পর্বতে কিংবা অন্য কোন গুপ্ত আলয়ে আশ্রয় নিতে হতো। দেশের জন্যে কেবল জীবন নয়, তাকে সর্বস্ব পণ করতে হতো। অনেক সময় এমন স্থানে এমন অবস্থায় গিয়ে তাদের পড়তে হতো যে, যেখানে জীবনধারণের অতি প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটাবারও ব্যবস্থা থাকতো না। নানা দুঃখকষ্ট ও কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাকিদের স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে হয়। খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের কোন নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না, তাদের নিজেদেরই তা সংগ্রহ করতে হতো। কৃষক ও ছোট ছোট দোকানদারেরা তাদের সাধ্যানুসারে এই ব্যাপারে মাকিদের সাহায্য করতো। বাকীটা পূরণ হতো জার্মানদের গুদাম লুট করে। জার্মানদের শিবিরে অথবা পথিমধ্যে অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে ফরাসী গেরিলারা কেবল খাদ্য ও বস্ত্রই লুট করতো এমন নয়, অস্ত্রশস্ত্রও তারা কেড়ে নিতো এবং এভাবেই তাদের অস্ত্রবল ক্রমশ বেড়ে যায়।

মাকিদের অত্যন্ত কঠোর শৃংখলা মেনে চলতে হতো; তবে এই

শৃংখলাবোধ তাদের ভেতর থেকে জন্মাত বলে কারো মধ্যে এ নিয়ে কখনো আপত্তি দেখা দিত না। কেউ মাকিদল ছেড়ে গেলে তার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। শৈথিল্য বশত কেউ নিজের অস্ত্র হারিয়ে ফেললে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো। মাকিদলে যোগ দেওয়ার সময় কতকগুলি শপথ গ্রহণ করতে হতো; তার মধ্যে কয়েকটি এই :

(ক) আমি মাকিদের কঠোর শৃংখলা রক্ষা করে চলতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি। আমি আমার নায়কের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবে।

(খ) যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট কোন চিঠিপত্র লিখব না।

(গ) আমি আমার অবস্থান এবং আমার সহকর্মী ও নেতাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখব।

(ঘ) আমি জানি যে, এই সব নিয়মের কোন একটি ভঙ্গ করলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। আমি এও জানি যে, নিয়মিত বেতন আমি নাও পেতে পারি: এমন কি আমার খাদ্য এবং অস্ত্র সরবরাহেরও কোন নিশ্চয়তা নেই।

মাকিদলে কেউ যোগদান করতে এলেই তাকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হতো এবং নতুন যোগদানকারীকে অন্তত পাঁচ দিনের খাদ্য সঙ্গে করে আনতে হতো। গোড়ার দিকে অস্ত্রের অত্যন্ত অভাব ছিল বলেই জীবনের চেয়েও অস্ত্রের মূল্য বেশি বলে বিবেচিত হতো। বহুদিন পর্যন্ত শত্রুর অস্ত্র লুট করেই তাদের অস্ত্রবল বাড়াতে হয়, তারপর অবশ্য মিত্রপক্ষ তাদের অস্ত্র পাঠিয়ে সাহায্য করে। এক এক জন নায়কেব অধীনে ছোট ছোট এক একটি দল বিভক্ত করে মাকিদের গেরিলাযুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হতো। প্রতিপক্ষের ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কি ভাবে তাদের জব্দ করতে হয় এবং অল্পকালের মধ্যে

কিভাবে আত্মগোপন করতে হয়, এটাই ছিল তাদের প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়। এ ছাড়া নিয়মিত ভাবে তাদের ব্যায়াম করতে হতো এবং নানাবিধ সামরিক৷ কসরৎ, আত্মরক্ষার উপায়, অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল প্রভৃতিও শিখানো হতো। গেরিলাযুদ্ধ সম্বন্ধে সামরিক শিক্ষকগণ বক্তৃতা করতেন।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মানীতে দাস-শ্রমিক রূপে খাটাবার জন্যে জার্মানরা ফ্রান্সের মাজামে শহরের যুবকদের পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে। এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। শহরের যুবকদের যখন ধ'রে ধ'রে জার্মানীতে পাঠানো হতে থাকে তখন তারা তার প্রতিবাদ জানায়। সেখানকার টাউন হলে গিয়ে তারা এই দাবী জানায় যে, মেয়রের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। মেয়র চেষ্টা করে দেখবেন বলে মৌখিক আশ্বাস দেন। তাতে তারা আশ্বস্ত হতে না পেরে রেলওয়ে স্টেসনের দিকে ছুটে যায়। স্টেসনে ৬০ জন ফরাসী যুবককে জার্মানীতে পাঠাবার জন্যে নিয়ে রাখা হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেনের এঞ্জিন থেকে জল ছেড়ে দেয়, কয়লা ফেলে দেয় এবং সেই ৬০ জন ফরাসী যুবককে স্টেশন থেকে মুক্ত করে এনে তাদের স্ব স্ব পরিবারে ফিরিয়ে দেয়। সেইদিন রাত্রেই জার্মানরা উক্ত শহরে ব্যাপকভাবে হানা দেয় এবং নানাভাবে অত্যাচার চালায়। বহু লোককে গ্রেপ্তার করে নাৎসীরা তাদের বন্দী শিবিরে পাঠায়। এর দু'দিন পর আবার ফরাসী যুবকদের জার্মানীতে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু জার্মানদেব সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অধিকাংশ ফরাসী যুবক ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায় এবং ফরাসী গেরিলা বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেয়। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে World Digest নামক পত্রিকায় এই মর্মে একটি খবর প্রকাশিত হয়:

"তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে, ফ্রান্সের জন্যে, প্রতিরোধ

আন্দোলন চালাবার জন্যে এই অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ১৯২৩ খৃস্টাব্দে যেসব ফরাসী যুবক জন্মগ্রহণ করেছ তারা জার্মানীতে যেও না।” ফরাসী জনযোদ্ধাদের “অনোর এ পাত্রি” নামক গুপ্ত বেতারকেন্দ্র থেকে ফরাসী যুবকদের উদ্দেশে এই আহ্বান করা হয়। দাস-শ্রমিক রূপে খাটাবার জন্যে ফ্রান্স থেকে আট লক্ষ ফরাসী জার্মানীতে প্রেরিত হয়; তাদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে হিটলার ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে যখন আরো ফরাসী যুবককে জার্মানীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন, ফরাসী জনযোদ্ধাদের এই গুপ্ত বেতারকেন্দ্র থেকে তখনই এই আবেদন করা হয়। সেই বেতার-আহ্বান শুনে ফরাসী যুবকরা দলে দলে এসে মাকি দলে যোগ দেয়।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের এই জনসেনার সংখ্যা গিয়ে দু'লক্ষে দাঁড়ায়। তবে সংখ্যার অনুপাতে তাদের অস্ত্র ছিল অত্যন্ত কম এবং অস্ত্রাভাবের দরুণ তাদের মুক্তিসংগ্রাম চালাতে অসুবিধেও বিস্তর হয়। তা সত্ত্বেও ফরাসী জনসেনার শক্তি দেখে নাৎসী পক্ষ এবং তাদের সমর্থক ফ্রান্সের ভিশি কর্তৃপক্ষ ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়ায় ফরাসী পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে যখন বহু ভিশি-সমর্থক ফরাসী নেতাকে গ্রেপ্তার এবং কয়েকজনকে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়, তখন তার প্রতিশোধ স্বরূপ ফ্রান্সের ভিশি কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধীদের ওপর ভীষণ অত্যাচার চালায়। এখানে বলা দরকার যে, আলজিরিয়ায় যে ১০৩ জন সদস্যকে নিয়ে ফরাসী পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে ৪৯জনই ছিল ফ্রান্সের প্রতিরোধ পরিষদের প্রতিনিধি। ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ছিল এই প্রতিরোধ পরিষদ। প্রতিরোধ পরিষদের যে-সকল প্রতিনিধি আলজিরিয়ায় ফরাসী পরামর্শ পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন তাঁদের নাম গোপন রাখা হয়েছিল: কেননা ফ্রান্সে প্রতিরোধ পরিষদে ফিরে

যোগদানের জন্যে যে-কোন সময়েই আবার তাদের ডাক পড়তে পারতো। বলা বাহুল্য, প্রতিরোধ পরিষদের এই সকল সদস্যের নাম খুঁজে বের করতে না পারলেও ভিশি কর্তৃপক্ষ একথা জানতে পেরে-ছিলেন যে, আলজিরিয়ায় ফরাসী পরামর্শ পরিষদে ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের বহু নেতা রয়েচেন। একথা জানতে পেরেই ভিশি কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের প্রতিরোধীদের ওপর আরো বেশী খাপ্পা হয়ে ওঠেন। তার ফলে ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের ১০ জন নেতাকে প্রাণ দিতে হলো। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মঃ লাভাল তার পুলিশ বাহিনীর শক্তি বাড়ালেন এবং এই ব'লে শাসালেন যে, ভিশি সমর্থকদের যদি বিচার ও শাস্তি দেওয়া চলতে থাকে তবে তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ফরাসী প্রতিরোধীদের ওপর আরো নির্মম অত্যাচার তিনি চালাবেন। ফরাসী পরামর্শ পরিষদ মঃ লাভালের এই শাসানীতে ভীত না হয়ে আরো কঠোরভাবে ভিশি-সমর্থকদের শাস্তি দিতে লাগলেন। এর ফলে ফাসিস্তদের এক দুবল স্থানে ঘা পড়লো। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ফরাসী পরামর্শ পরিষদ গঠিত হওয়ায় ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তি বেড়ে গেল এবং ফরাসী জনসেনা মাসে হাজার থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক কাজ চালাতে লাগলো। এই ধ্বংসাত্মক কাজ এমন ব্যাপকতা লাভ করলো যে, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ২৩শে মে প্যারিস বেতারে রবার্ট দ্য বোপ্লাঁ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন: "ফরাসী রেলওয়েগুলিতে সম্পূর্ণ বিশৃংখলা চলেছে। মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী যে ধ্বংসকার্য চালাতে পারছে না, ফ্রান্সের গুপ্ত ও অভিজ্ঞ ধ্বংসকারীরা তা অনায়াসে সাধন করছে। ফ্রান্সের সমস্ত চলাচল-ব্যবস্থা একরূপ অচল হতে বসেচে।" ঐ বছরই এপ্রিল মাসে হুট স্যাভয় নামক পাহাড়ে পাঁচশ' ফরাসী গেরিলা পাঁচ হাজার জার্মান সৈন্যের সঙ্গে পনের দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে। অথচ জার্মানদের সঙ্গে সব বড়

বড় কামান ও বিমান ছিল। তা সত্ত্বেও জার্মান পক্ষের সাত শতাধিক সৈন্য হতাহত হয়। এদিকে ফাসিস্ত পক্ষ থেকে ফরাসীদের ওপর নিপীড়নও অবাধ গতিতেই চলতে থাকে; প্রায় দশ লক্ষ ফরাসী দাস-শ্রমিক রূপে খাটবার জন্যে জার্মানীতে প্রেরিত হয়; ফাসিস্তদের হাতে প্রায় তিন লক্ষ ফরাসী বন্দী এবং ৮০ হাজার ফরাসী প্রাণ হারায়। কোন ফরাসী গেরিলা ধরা পড়লেই তার ওপর নির্যাতন চলতো এবং তারপর তাকে গুলী ক'রে হত্যা করা হতো। এ সব সত্ত্বেও ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চলে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হ'লে পর অর্থাৎ মিত্রসেনা ফ্রান্সে অবতরণ করলে ফরাসী জনসাধারণ পাছে তাদের সাহায্য করে এই ভয়ে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল উত্তর ফ্রান্সের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে সকল বেসামরিক অধিবাসীকে জার্মানরা সরিয়ে দিতে আরম্ভ করে; প্রায় ৮ হাজার বর্গ-মাইল পরিমিত এলাকা বন্যাপ্লাবিত ক'রে দেওয়া হয় এবং প্রায় ৮০ লক্ষ ফরাসীকে গৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। প্রতিরোধ আন্দোলন ফ্রান্সে এতটা ছড়িয়ে পড়ে যে, জার্মানরা প্রত্যেক ফরাসীকেই সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। তাদের সন্দেহ একেবারে অমূলক ছিল না। উত্তরকালে দেখা যায় যে, ফরাসী জনসেনা মিত্রবাহিনীর অভিযানের পথ সত্যি সুগম করে রেখেছিল। ফরাসী অন্তর্বাহিনী অর্থাৎ ফরাসী জনসেনা মিত্রবাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে যে সাহায্য করে তজ্জন্য মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন, "মাকিরা প্রায় আড়াই লক্ষ জার্মানকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।"

এইবার ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদের কথা কিছু বলা যাক। আগেই বলেছি, ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের এইটাই ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। ট্রেড ইউনিয়ন, সামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ যেমন কম্যুনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি,

র‍্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্ট,পপুলার ডেমোক্রাট এবং ডেমোক্রাটিক এলায়েন্স পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে এই জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এই পরিষদ ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকেই ফ্রান্সের এক মাত্র বৈধ গবর্ণমেণ্ট বলে মনে করতো। জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বেও এই পরিষদের আস্থা ছিল এবং ফ্রান্সের প্রতিরোধ-আন্দোলন সম্বন্ধে সর্বদাই তাঁকে খবরাখবর দেওয়া হতো। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন মঃ জর্জ বিদোল। এককালে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন; পরে জেনারেল দ্য গলের মন্ত্রিসভায় তিনি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব হন।

প্যারিস উদ্ধার

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে মিত্রসেনা যখন প্যারিসের নিকটে উপস্থিত হয় তখন প্যারিসের অভ্যন্তর থেকে ফরাসী জনসেনা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এবং তারই ফলে প্যারিস জার্মান কবল থেকে মুক্ত হয়। প্যারিস উদ্ধারের জন্যে ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যদের যুদ্ধ করতে হয়নি। এক প্যারিস উদ্ধারের কাহিনীই প্রমাণ দেয় যে, দেশের মুক্তির জন্যে ফরাসী জনসেনা কতখানি তৈরি হয়ে ছিল। প্যারিসেব এই গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন কর্নেল রল তাঁগি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি সেখানে চতুর্দশ ফরাসী ব্রিগেডের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। এই ব্রিগেডেব নাম ছিল মার্সাই ব্রিগেড। স্পেনের রিপাব্লিকান্ সৈন্যদলের অন্তর্ভূ্ত হয়ে ফ্রান্সের এই স্বেচ্ছাসৈন্য দল যুদ্ধ করেছিল।

কর্নেল তাঁগির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। প্যারিসের এক শ্রমিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এক ধাতুব কারখানায় তাঁব কর্ম-জীবন 'আরম্ভ হয় এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দেবার আগে প্যারিস মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অর্থাৎ ধাতুর কারখানার শ্রমিক সংঘের মধ্যে একজন একনিষ্ঠ শ্রমিক নেতারূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি যখন প্যারিস থেকে স্পেনে গিয়েছিলেন তখন প্যারিসে তাঁর সহকর্মীরা তাকে এক বিপুল বিদায়-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। অল্প বয়েসেই তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

কর্নেল তাঁগি ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের প্রতিরোধ-আন্দোলনে যোগ দেন। কেবল তিনি একাই যোগ দিলেন এমন নয়, মার্সাই ব্রিগেডে তাঁর যেসব সহকর্মী ছিলেন তাঁরাও এসে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং তাঁদেরই নিয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হলো। পরে অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দলটি ফরাসী অন্তর্বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো। কয়েক মাসকাল এই দল স্বতন্ত্র ভাবেই জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে, সৈন্যদের শিক্ষা দেয় এবং বহু অফিসার তৈরী করে। গোড়ার দিকে তাদের এতই অস্ত্রাভাব ছিল যে, প্রতি দশজনে একটি ক'রে রিভল্‌বার বা রাইফেল্‌ ছিল কিনা সন্দেহ। কর্নেল তাঁগির পক্ষে এটা কোন নতুন অবস্থা ছিল না; কেননা স্পেনেও তাঁকে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাতের পর রাত, এমন কি দিনের বেলায়ও তার দলের লোকেরা বিচ্ছিন্ন জার্মানদের আক্রমণ ক'রে চলে এবং তাদের যানবাহন ধ্বংস করতে থাকে। তাদের আক্রমণে জার্মান ট্যাঙ্কও অনেক স্থলে বিধ্বস্ত হয়। কোন কোন অঞ্চলে তারা এমনই শক্তির পরিচয় দেয় যে, জার্মানরা খুব ভালোভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে সৈন্য ও মালামাল পাঠাতে সাহসী হতো না। প্যারিসে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আগে কর্নেল তাঁগির সৈন্যরা বিশ জন জার্মান জেনারেলকে হত্যা করেছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিরোধ সংগ্রামে তারা কতখানি এগিয়ে গিয়েছিল। চারদিকে ধ্বংসকার্য চালিয়ে জার্মানদের চলাফেরা যখন এক রকম অসম্ভব করে তোলা হলো, তখন কর্নেল তাঁগি সদলবলে তাঁর হেডকোয়ার্টার্সে চলে গেলেন। প্যারিসের ভূগর্ভে তাঁর

গুপ্তশিবির প্রতিষ্ঠিত হলো। সেখানে বসে তিনি প্যারিস উদ্ধারের পরিকল্পনা করলেন। উক্ত পরিকল্পনার প্রথম কর্মসূচী হলো শহরের অভ্যন্তরে জার্মানদের যাতায়াতের যেসব ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে ধ্বংস করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, রেলওয়ে লাইনসমূহ উড়িয়ে দেওয়া হলো, রাস্তাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে সব বাধার সৃষ্টি করা হলো। তারপর ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ১৯শে অগাস্ট শনিবার সকালে ফরাসী জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদ ও প্যারিস মুক্তি কমিটীর কাছ থেকে নির্দেশ এলো, "বিদ্রোহ কর।" নির্দেশ পাওয়ামাত্র প্যারিসে আগুন জ্বলে উঠলো; তাঁগির নেতৃত্বে ৫০ হাজার সশস্ত্র ফরাসী জনসেনা কয়েক লক্ষ নিরস্ত্র ফরাসী স্বদেশভক্তের সহায়তায় সংগ্রাম শুরু করে দিল। চারদিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর সর্বত্র জার্মানদের পরাজয় হলো—প্যারিসের জনসাধারণ আবার তাদের স্বীয় রাজধানীকে উদ্ধার করলো। প্যারিসে সর্বসাধারণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কর্নেল তাঁগি প্যারিস এলাকায় ফরাসী মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন।

প্যারিস উদ্ধারের পরও সেখানে তাঁগির সৈন্যদলের অনেক কাজ রয়ে গেল। পঞ্চম বাহিনীর যেসব লোক প্যারিসে আত্মগোপন করে রয়েছিল ফরাসী জনসেনা তাদের খুঁজে বের করতে লাগলো। তবে একাজ সম্পন্ন করতে তাদের বেশিদিন লাগলো না; কেননা, প্যারিসের জনসাধারণ এই কাজে তাদের যথেষ্ট সহায়তা করলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্যারিসে জনসেনার অভ্যুত্থান এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা। কোন নগরের অধিবাসীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'লে সেখানে বিদেশী শক্তি যে কতখানি দুর্বল ও নিরুপায় হয়ে পড়ে প্যারিসের গণ-অভ্যুত্থান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনের আর যাঁরা স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মরিস তোরেজ এবং আর একজন হলেন ফ্রান্সের বৃদ্ধ কম্যুনিস্ট নেতা মার্সেল কাশ্যাঁ। মরিস তোরেজের বয়েস পঞ্চাশের কিছু কম। এক সময় তিনি খনিতে কাজ করতেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে দালাদিয়ের গবর্ণমেণ্ট তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের করেন। তোরেজ নিরুপায় হয়ে ফরাসী সৈন্যদল ছেড়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন এবং ১৯৪৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে থেকে তিনি নানাভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহায্য করেন। অবশেষে তিনি মস্কোতে পালিয়ে যান এবং হিটলারের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে ফরাসী কম্যুনিস্টরা যে আন্দোলন চালায় সেখানে থেকে তিনি তা পরিচালনা করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, উত্তরকালে ফ্রান্সের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট মরিস তোরেজের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনে এই বলে আপত্তি করেন যে, তিনি এক সময় সৈন্যদল ত্যাগ করে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিরোধীরা একবাক্যে দাবী করে যে, গবর্ণমেণ্ট তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুক ; কেননা, দালাদিয়ের গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছিলেন বলেই তোরেজ সৈন্যদল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ; কিন্তু তা বলে হিটলারের ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে তিনি নিজেকে কখনো দূরে রাখেননি। ফরাসী প্রতিরোধীদের চাপে পড়ে গবর্ণমেণ্ট অবশেষে তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয় এবং তোরেজকে স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয়। তোরেজ ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসে মস্কো থেকে বার্লিনে ফিরে আসেন। ৩০ শে নবেম্বর প্যারিসের এক বিরাট সভাগৃহে প্রায় ৩০ হাজার প্যারিসবাসী তাঁকে সম্বর্ধনা করে। তাঁরই চেষ্টায় ফ্রান্সে সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্সেল কাশ্যাঁর বয়েস এখন আশীর কাছাকাছি। ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনে তিনি তাঁর জীবনের পঞ্চাশ বছরেরও বেশি ব্যয় করেছেন। তিনি ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সমাজতন্ত্রী নেতা জাঁ জোরেসের সমসাময়িক। জাঁ জোরেস ১৯১৯ খৃস্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। কাশ্যাঁ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ফরাসী সেনেটের একমাত্র কম্যুনিস্ট সদস্য ছিলেন। ফ্রান্সের যে কুখ্যাত দু'শ পরিবার সেনেটে প্রাধান্য করতো এবং যারা প্রকাশ্যে ফাসিস্তবাদকে সমর্থন করতো তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত দল গঠনের জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ কম্যুনিস্ট পত্রিকা 'ল্যুমানিতে'র তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ফ্রান্সে যে তিনখানা বড় পত্রিকা ছিল তার একখানি ছিল 'ল্যুমানিতে'। তারপর ফ্রান্স নাৎসী দখলে গেলে এই পত্রিকাখানি গুপ্তভাবে ছাপা হতে থাকে এবং ফ্রান্সের মুক্ত এলাকায় পরে এই পত্রিকা সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে পরিণত হয়। হিটলার যখন ফ্রান্সে অবাধ অত্যাচার চালিয়েছিলেন, বৃদ্ধ নেতা মার্সেল-কাশ্যাঁ তখন ফ্রান্সে থেকে সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং প্রতিরোধীদের নানাভাবে প্রেরণা যোগান। ফ্রান্সের মুক্তি আন্দোলনে এই বৃদ্ধ নেতার দান অসাধারণ।

ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলন পরিচালনায় কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও সেখানে সকল দল ও সকল শ্রেণীর লোকেরই স্থান ছিল এবং সকল শ্রেণীর লোকের সমর্থন ছিল বলেই ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলন এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল। কেবল সৈন্যরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেনি, কেবল রাজনৈতিক নেতারা বুদ্ধি যোগায়নি, কেবল শ্রমিকরা অস্ত্র নির্মাণ করেনি, কেবল কৃষকরা রসদ যোগায়নি, ফ্রান্সের কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকরাও মুক্তি আন্দোলনে নানাভাবে তাঁদের শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রেরণা যোগিয়েছেন।

বিদ্রোহী কবি লুই আরাগাঁ, জ্যুল সুপারভিয়েই, লোয়া মাস, গাব্রিয়েল ওদিসিও এবং আরো অনেক কবি ও সাহিত্যিক স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় প্রতিরোধ আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে তোলেন। সর্বদলের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের মুক্তির পর সর্বদলের সমন্বয়ে সেখানে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয এবং যে জনসেনা ফ্রান্সে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালায় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাদের সরকারী বাহিনী বলে স্বীকার করে নেয়। ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা গ্রীসের ন্যায় জনসেনার শক্তিকে অস্বীকার করবার মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশের সুযোগ পায়নি।

কর্সিকায় বিদ্রোহ

এবার নেপোলিয়নের জন্মভূমি কর্সিকা দ্বীপের দেশভক্তদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে কিছু বলা যাক। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের পতনের পর ইতালীয়রা এই দ্বীপটি দখল করে নেয়। তারপর ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে ইতালী মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করলে কর্সিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ফরাসী দেশভক্তরা একযোগে বিদ্রোহ করে। এদিকে উত্তর আফ্রিকা থেকে ফরাসী বাহিনী কর্সিকার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে অবতরণ করে। সার্দিনিয়া থেকে জার্মান সৈন্যরা এই দ্বীপের বাস্তিয়া বন্দর হয়ে যখন উত্তর দিকে পালাতে থাকে তখন ফরাসী বাহিনী তাদের আক্রমণ করে। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর ফরাসী সৈন্যরা বাস্তিয়া বন্দর উদ্ধার করে এবং অবতরণের তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফরাসী বাহিনী সমগ্র কর্সিকা দ্বীপ মুক্ত করে। এই মুক্তিযুদ্ধে কর্সিকার বার হাজার দেশভক্ত কিভাবে সাহায্য করেছিল এখানে সংক্ষেপে তাই বলবো।

কর্সিকায় যাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে জনসেনা গড়ে ওঠে তাঁর নাম ভিত্তোরি। কর্সিকায় ১৫ মাস কাল ভিত্তোরির নামে

জনগণের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা জেগে উঠতো, শত্রুর প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হতো। জার্মান গোয়েন্দারা অনবরত তার সন্ধান করে ফিরেছে, কিন্তু ভিত্তোরি তাদের চোখে ধূলি দিয়ে কার্সিকার মুক্তিসংগ্রামকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করে তুলেছেন। ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে কার্সিকায়ই তাঁর প্রথম সংগ্রাম নয়, তার আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধেও তিনি চতুর্দশ আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিয়ে ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এ নিয়ে একটি মজার ব্যাপার ঘটে। কর্সিকার দেশভক্তদের হাতে বন্দী জনৈক ইতালীয় ফাসিস্তকে যখন নিরস্ত্র করা হচ্ছিল তখন ভিত্তোরিকে দেখে সে বলে ওঠে, 'আমি তোমাকে আগে দেখেছি, হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনি। ছ' বছর আগে গুয়াদালাজারায় (স্পেন) তোমার ও আমার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।'

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে কর্সিকার এই বীর ও খ্যাতনামা কম্যুনিস্ট নেতা ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটীতে যোগদানের জন্যে আলজিয়ার্সে যান। সেখানে তিনি কর্সিকার প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে যা বলেন তা এই :

"১৯৪২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে আমরা প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠন করতে আরম্ভ করি। গোড়ায় আমরা ছিলাম মাত্র সাতজন। তার মধ্যেও দু'জন যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায় এবং আর একজন ধরা প'ড়ে ৩০ বছরের জন্যে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাকী চার জন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু তা কি সম্ভব ! চার জন কি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে ! অসম্ভব বলেই তো মনে হয়। তবু আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। কর্সিকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্বকলহ ছিল তা দূর করবার জন্যে প্রত্যেক গ্রামে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েছে। পরিবারে পরিবারে কলহ, গ্রামবাসীতে গ্রামবাসীতে বিরোধ, এইগুলি ছিল কর্সিকায় ঐক্যের পথে বিষম অন্তরায়। কিন্তু কয়েক মাসের

মধ্যেই আমরা অপ্রত্যাশিত ফল পেলাম। আক্রমণকারী বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কর্সিকাবাসীদের একসূত্রে বেঁধে দিল। প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক কর্সিকাবাসী এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। প্রতিপক্ষ কর্সিকায় যে ১১০ টন অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ২৫ টন তাদের সৈন্যদের হাতে পড়লো; বাকীটা হাত করলো কর্সিকার জনসেনা। তারই সাহায্যে ১২ হাজার কর্সিকান অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হলো।

"আমাদের মতন যে কয়জন দুর্দান্ত কর্সিকান মাসের পর মাস বন্য জন্তুর ন্যায় বনে-জঙ্গলে পালিয়ে ফিরেছে, তারাই কর্সিকার জনসেনাকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। একদিন একটি পার্বত্য গুহায় আমরা আমাদের বেতারযন্ত্র ও কাগজপত্র নিয়ে বিশ্রাম করছিলাম; অন্য একটি গুহায় আমরা আমাদের গুপ্ত ছাপাখানা রেখে দু'খানা পত্রিকা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। অকস্মাৎ আমাদের নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেলাম যে, একজন বিশ্বাসঘাতক শত্রুকে আমাদের সন্ধান বলে দিয়েছে এবং ১২০০ ইতালীয় সৈন্য ঐ পাহাড ঘেরাও করেছে। খবর পেয়ে গুহা ছেড়ে আমরা যতদূর সম্ভব চলে গেলাম। আমাদের বেতার ও ছাপাখানার সন্ধান যাতে ইতালীয়রা না পায় সেজন্যে সেগুলো যেখানে ছিল সেখানেই রেখে গেলাম। দূরে গিয়ে আমরা অকস্মাৎ ইতালীয়দের প্রতি গুলী ছুঁড়তে লাগলাম। আমাদের আকস্মিক আক্রমণে প্রতিপক্ষের একস্থানে ব্যূহ ভেদ হলো এবং সেখান দিয়ে আমরা বেষ্টনের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হলাম।

"কর্সিকার প্রত্যেকে বিশেষ ভাবে যুবকশ্রেণী প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহায্য করে। তারা সর্বদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো, শত্রু-অধিকৃত এলাকার মধ্য দিয়ে তারা এক এক রাত্রে বিশ ত্রিশ মাইল পার্বত্য বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসে আমাদের খবরাখবর দিয়ে যেত।

অসীম সাহসের সহিত তারা কর্সিকার আজ্জাক্সিও এবং বাস্তিয়ার মতো বড় শহরের রাজপথ দিয়ে দিনের বেলায় দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আমাদের গুপ্ত ইস্তাহার বিতরণ করে যেত। যুবকদের মতো অনেক বৃদ্ধও কর্সিকার প্রতিরোধ আন্দোলনে সাহায্য করেছে।

"মুক্তি আন্দোলনে কর্সিকার আবালবৃদ্ধবনিতা কি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। আরিঘি নামক একজন কমিশনবিহীন অফিসারের ওপর পোর্টো জেলার ভার ছিল। খবর পাওয়া গেল কর্সিকার জনসেনার জন্যে সাবমেরিণে করে অস্ত্র আসছে। আরিঘি সেই অস্ত্র নামাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ইতালীয়-দের হাতে ধরা পড়েন। খবর বের করবার জন্যে ইতালীয়রা তাঁকে নানাভাবে পীড়ন করতে থাকে। কিন্তু একটি কথাও তিনি ফাঁস করেননি। তার ওপর ক্রমাগত সতের দিন নির্যাতন চলবার পর তিনি তাঁর নির্জন কারাকক্ষের দরজায় একটি ছিদ্র করে তা দিয়ে বেরিয়ে যান।

"আর একজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হলেন বৃদ্ধ ডক্টর জার্মারকি। কর্সিকার বিদ্রোহের সময় ছ'সাত জন নার্স নিয়ে তিনি রণাঙ্গনের জন্যে একটি চমৎকার হাসপাতাল গড়ে তোলেন। এই হাসপাতালটির ব্যবস্থা এত ভালো হয়েছিল যে, ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে ফরাসী সৈন্যদেরও এত ভালো হাসপাতাল ছিল না।

"এর পর পনের বছরের একটি বালকের কথা বলা যেতে পারে। আমার অধীন একদল জনসেনা জার্মানদের একটি গুদামে আক্রমণ চালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় সেই বালক এসে আমার দলে যোগ দিতে চাইল। নিতান্ত বালক বলে আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম, কিন্তু সে দমে যাবার ছেলে নয়। আমাদের কিছু না বলে সে যথাসময়ে সেই জার্মান গুদামে গিয়ে হাজির হলো এবং আক্রমণে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। যুদ্ধে সে দু'জন জার্মানকে হত্যা করলো।

আমি যখন তাকে পরে জিগ্যেস করলাম যে, কি অস্ত্র দিয়ে সে যুদ্ধ করেছে সে তখন আমাকে একটি বন্দুক দেখিয়ে বললো, 'আমার বিরাশী বছর বয়স্ক বৃদ্ধ দাদামশায়ের এই শটগান দিয়ে যুদ্ধ করেছি।'

"কর্সিকা আজ মুক্ত। সংগ্রাম ক'রে আমরাই মুক্তি অর্জন করেছি। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কর্সিকায় ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই বিদ্রোহে সমগ্র কর্সিকার সমর্থন ছিল বলে তা' অচিরে সফল হয়। বিদ্রোহের সাফল্যে আজাক্সিওতে প্রায় ২৫ হাজার লোক সমবেত হয়ে বিজয়োৎসব করে। সমগ্র কর্সিকায় বিদেশী ফাসিস্ত প্রভুদের পদলেহী ২৫ জনের বেশী ছিল কি না সন্দেহ। কর্সিকার মুক্তিসংগ্রাম সমগ্র ইওরোপে তথা সমগ্র বিশ্বে এক নতুন বাণী পৌঁছে দিয়েছে।"

পোলাণ্ড

পোলাণ্ডকে নিয়েই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। পোলাণ্ড আক্রান্ত হবার আগেও ইওরোপের একাধিক দেশ হিটলারের কুক্ষিগত হয়েছিল; কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী শক্তি তখনো পর্যন্ত হিটলারকে তোয়াজ করেই চলেছিল বলে যুদ্ধ বাধেনি। তোয়াজ করে বেশিদিন চললো না; হিটলার একদিন অকস্মাৎ পোলাণ্ড আক্রমণ করে বসলেন। বৃটেন ও ফ্রান্স হিটলারের এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করতে পারলো না; সুতরাং পোলাণ্ড আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটেন এবং ফ্রান্সও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। সেই যুদ্ধই ক্রমশ বিশ্বসংগ্রামে পরিণত হলো।

পোলাণ্ডের হয়ে বৃটেন এবং ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও সামরিক ব্যাপারে পোলাণ্ডের বিশেষ কোন সুবিধে হলো না; একাই তাকে যুদ্ধ করতে হলো এবং প্রবল জার্মান বাহিনীর চাপে

পোলাণ্ডের সমস্ত আত্মরক্ষাব্যবস্থা অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়লো। যুদ্ধ বাধবার আগে পোলাণ্ডের বড়কর্তারা অবশ্য অনেক বড় বড় কথাই বলেছিলেন এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পোলাণ্ডকে সামরিক বল দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পোলিশ বড়-কর্তারা বলেছিলেন, "কারো সাহায্য আমাদের দরকার হবে না; আমরা নিজেরাই নিজেদের দেশ রক্ষা করতে পারব।" কিন্তু কার্য-কালে দেখা গেল আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী আয়োজন পোলাণ্ডের কিছুই ছিলনা। পোলাণ্ডের সমরকর্তারা কেবল বাগাড়ম্বরই করে-ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে দেশরক্ষার ব্যবস্থায় তাঁরা অনেক পেছনেই পড়ে ছিলেন। যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে পোলাণ্ডের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল যে, দেশের শাসনকর্তারা তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কতটা উদাসীন ছিলেন। প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলো যে, দেশের ও দশের মর্যাদা, সুখশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা দেশের সর্বসাধারণেরই করতে হবে; স্বার্থান্বেষী, অনুদার, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। পোলাণ্ডের দুর্দিনে সেখানকার সমর বিভাগের বড়কর্তারা ব্যক্তিগত ভাবেও শৌর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেননি। রিড্‌জ স্মিগ্‌লি প্রমুখ সামরিক কর্তারা ভীরুতার ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন। কোন কোন সেনাপতি তাঁদের সৈন্যদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে বিমান বা মোটরে করে পালিয়ে যান। এই ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি রিড্‌জ স্মিগ্‌লি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি তাঁর অধীন সেনানীদের নিয়ে চম্পট দেন; সমরসচিব কাস্‌প্‌স্‌জিকি এবং সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষ স্টাচেভিশ্চও বড়কর্তারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। বড়কর্তারা পালালেও পোলাণ্ডের সাধারণ সৈন্যরা এবং একদল অফিসার যুদ্ধে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও

বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন; তাদের মধ্যে একদল উচ্চপদস্থ অফিসারও ছিলেন। কিন্তু সমগ্র পোলাণ্ডের যুদ্ধটাই হয়েছিল অসমানে; বিরাট জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর কাছে পোলিশ বাহিনী নগণ্য ছিল বললেই চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়ারস'র আত্মরক্ষা এবং কুটনোহেলা উপদ্বীপ ও ওয়েস্টারপ্লেটের যুদ্ধ পোলাণ্ডের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে এবং ১৯৪০ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে পোলিশ জনসাধারণ এবং সৈন্যগণের আশা ছিল যে, পশ্চিম দিকে তাদের মিত্রশক্তি বৃটেন ও ফ্রান্সের জয় হবে। সেই আশায়ই পোলিশ বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে যে-সব গেরিলা দল গঠিত হয়—পোলাণ্ডের জনসাধারণ তাদের নানাভাবে সাহায্য করে। পোলিশ গেরিলারা যথাসাধ্য জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করতে থাকে। যেসব পোলিশ গেরিলা ডিটাচ্‌মেণ্ট গঠিত হয়, তারই একটির সেনাপতি নাম গ্রহণ করেন·"মেজর কুবলা।" যুদ্ধের আগে পোলিশ বিমান বাহিনীর এই নামে একজন অফিসার সাহস ক'রে বলে ফেলেছিলেন যে, পোলিশ বাহিনী মোটেই আধুনিক নয়। এই সত্য কথা প্রকাশ করার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়। মেজর কুবলার মতো আরো অনেক তরুণ অফিসার ছিল যারা পোলিশ বাহিনীর বড়-কর্তাদের নীতি পছন্দ করত না। পোলাণ্ডের পতনের পর তারাই শত্রুর নিকট অস্ত্র অর্পণ না করে পোলিশ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। পশ্চিমের দিকে চেয়ে যে আশা ও উৎসাহ নিয়ে পোলিশ গেরিলারা তাদের কাজ আরম্ভ করেছিল, ১৯৪০ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে ফ্রান্সের পতন হওয়ায় তাদের সে আশা ও উদ্যম অনেকখানি ব্যাহত হলো। ফ্রান্সের পতন হওয়ায় পোলিশ জনযোদ্ধারা বুঝতে পারলো যে, পোলাণ্ডেরও আশু মুক্তির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নৈরাশ্যে তারা একেবারে ভেঙ্গে

পড়লো না। মুক্তির দিন অনিশ্চিত জেনেও তারা অবিরাম মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলো।

পোলিশ জনসাধারণ ও জনসেনার সংগ্রামস্পৃহা দমনের জন্যে জার্মান বাহিনী নিয়মিত ভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন চালালো। সমগ্র পোলাণ্ডে তারা এক বিভীষিকা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হলো। জার্মানরা লোক ধ'রে ধ'রে নির্বিচারে গুলী করে, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করতে লাগলো এবং বহু লোককে বন্দীশালায় পাঠালো। কেবল তা করেই তারা ক্ষান্ত হলো না, কারাগারে ও বন্দীশালায় প্রত্যহ পোলদের হত্যা করে জার্মানরা তার করে তাদের আত্মীয়স্বজনকে মৃত্যুখবর জানাতো। জার্মানরা ভেবেছিল এভাবে ত্রাসের সঞ্চার করেই তারা পোলদের প্রতিরোধ-স্পৃহা নির্মূল করে দেবে; কিন্তু ফল হলো বিপরীত, নিরঙ্কুশ অত্যাচারের ফলে পোলদের মধ্যে আত্মরক্ষার স্পৃহা আরো দ্বিগুণ হয়ে জেগে উঠলো এবং এই আত্মরক্ষার স্পৃহাই তাদের সংঘবদ্ধ করে তুললো।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে সমগ্র পোলাণ্ড জার্মান সৈন্যে ছেয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় অগণিত জার্মান সৈন্যের অবিরাম স্রোত। শহরে শহরে জার্মান সৈন্যের অসংখ্য শিবির। জার্মান বাহিনী তখন অবিরাম পূর্বাভিমুখে চলেছে। সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের উদ্যোগ পর্ব। পোলাণ্ডে জার্মান সৈন্যের এই বিপুল সমাবেশের ফলে পোলিশ জনসেনার তৎপরতা সাময়িকভাবে হ্রাস পেল। বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে পোলিশ গেরিলারা আক্রমণ করতো বটে, কিন্তু সংহত প্রতিরোধ তখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তারপর ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন জার্মান বাহিনী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বসলো। প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় পোলাণ্ডের একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোক প্রচার করতে লাগলো, "পূব দিকে আমাদের দুই শত্রুর মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে। আমরা

চুপ করে বসে থাকবো এবং দেখব।” ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে পোলাণ্ডের দুর্দিনে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি গা’ ঢাকা দিয়েছিল তারা তাদের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুপ্ত সভা ডেকে এই বলে অফিসারদের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে বললো যে, সেই সময় সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গেলে তার দ্বারা জার্মানদের আরো বিব্রত করা হবে। অর্থাৎ একরকম স্পষ্ট ভাবেই তারা বলতে লাগলো যে, লাল ফৌজের সঙ্গে জার্মানদের নির্বিঘ্নে যুদ্ধ করতে দাও, পোলাণ্ডে কোন ভাবে জার্মানদের অসুবিধে করো না। তাদের গুপ্ত পত্রিকায় লোককে নিষ্ক্রিয় থাকতে অনুরোধ করা হলো।

এই সময় পোলাণ্ডে প্রতিক্রিয়াশীল দলের দুটি সামরিক প্রতিষ্ঠান ছিল : একটির নাম ‘ইউনিয়ন অব্ আর্ম্ড্ স্ট্রাগল’ (ZWZ), অপরটির নাম ‘স্টাফ অব দি ডিফেণ্ডার্স অব পোলাণ্ড’। লণ্ডন থেকে প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট এই দুই দলকে পোলাণ্ডের সৈন্যসংগ্রহের অধিকার দিয়েছিলেন এবং তাদের অর্থ ও অস্ত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, “চুপ করে বসে থাক, এখন কিছু করো না।” এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রধান চেষ্টা ছিল যাতে সশস্ত্র সংগ্রাম গণরূপ লাভ না করতে পারে। তারা বিশেষ জোর দিয়েই বলে বেড়াত যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাও ফ্রান্সেরই মতন হবে।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে সিকোরস্কি মস্কোতে গিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পোলাণ্ডের সহযোগিতার এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় পোলাণ্ডের জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, লাল ফৌজের সংগ্রামের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামকেও যুক্ত করতে হবে। কিন্তু জনসাধারণের এই বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেবার জন্যে প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট অদ্ভুত ভাবে প্রচার-কার্য চালালেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, এই চুক্তি একটা

কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অপপ্রচারে পোলাণ্ড-বাসীরা খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তার ফলে পোলিশ জনসাধারণের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রসারের পথে বাধা পেল। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হলো ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর কাছে যখন জার্মানরা পরাজিত হলো। লাল ফৌজের বিজয়ে পোলিশ জন-সাধারণ অনেকখানি আশান্বিত হয়ে উঠলো। ফরাসী বাহিনী ও লাল ফৌজ যে এক নয় একথা তারা বুঝতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে প্রতিরোধস্পৃহা আবার দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিল। তারা মনে মনে উপলব্ধি করলো যে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকার অর্থ নিজেদেব মুক্তিব দিনকে আরো পিছিয়ে দেওয়া।

ইতিমধ্যে পোলাণ্ডের গণতান্ত্রিক দলগুলি তাদের নিজেদের সশস্ত্র ডিটাচ্‌মেণ্টসমূহ গড়ে তুলতে লাগলো। পল্লী অঞ্চলে কিষাণ ব্যাটে-লিয়ন এবং কিষাণ গার্ডসমূহ গড়ে উঠলো। এছাড়া পিপলস্ মিলিসিয়া, ইউনিয়ন অব লিবারেশন প্রভৃতি দল গঠিত হলো। প্রায় সমগ্র দেশে আপনা থেকেই গেরিলা ডিটাচ্‌মেণ্টসমূহের উদ্ভব হলো। জনসাধারণ নিজেরাই আন্দোলন শুরু করে দিল। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সাইদ্‌লিৎস এবং লুবলিন এলাকায় গেরিলারা বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলো।

নিয়মিতভাবে গেরিলাদল গঠনে অগ্রসর হয় পোলিশ শ্রমিক দল। গেরিলা বাহিনীর নাম দেয় তারা পিপল্‌স্ গার্ড। ওয়ারস'র নিকটে একটি গেরিলাযুদ্ধের শিক্ষাশিবির স্থাপিত হয়। কি করে রেলপথ উড়িয়ে দিতে হয়, ট্রেন লাইনচ্যুত করতে হয়, কি ভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়, এই সব অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হতো। উক্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল যুবক। এই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভের পর প্রথম যে গেরিলা স্কোয়াড গঠিত হয় তাতে

লোক ছিল প্রায় বিশজন। গোড়ার দিকে এই বিশ জনেরই উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৩রা মে এই স্কোয়াডকে পেট্রকভ এলাকায় যুদ্ধের জন্যে পাঠানো হয়। ওয়ারস' থেকে একখানি সাধারণ ট্রেণে চড়ে তারা রওনা হয়। অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গেই ছিল। জার্মানরা তখন ট্রেনগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখত না; কাজেই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তাদের ট্রেনে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে তারা জার্মানদের সঙ্গে প্রথম যে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হলো তাতে তাদের ডিটাচ্‌মেণ্ট-নায়ক আহত হলেন। তাঁর ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল লিটল্ ফ্রানেক। আহত অবস্থায় তিনি ওয়ারস'তে ফিরে এলেন। সেখানে কয়েক দিন থেকে সেরে ওঠবার পর তাকে সমগ্র গেরিলা এলাকার সেনাপতি করে আবার পাঠানো হলো।

তারপরে একে একে অনেকগুলি গেরিলা ডিটাচ্‌মেণ্ট ওয়ারস'র বাইরে পাঠানো হলো। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একটি করে গেরিলা দল বাইরে প্রেরিত হতো।

এই সময় লণ্ডনপ্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁদের সমর্থক পোলাণ্ডের গুপ্ত পত্রিকাগুলি ক্রমাগত প্রচার করতে থাকে যে, জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করবার সময় তখনো আসেনি। তারা সবাইকে সশস্ত্রভাবে অপেক্ষা করতে বলে এবং জানায় যে, প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ না পেলে তারা যেন কিছু না করে। পোলাণ্ডের যে-সমস্ত গেরিলা দল এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছিল তাদের বিরুদ্ধে দস্তুরমতো প্রচারকার্য চালানো হয়। তারা জনসাধারণকে এই বলে সাবধান করতে থাকে যে, তখন আক্রমণ করতে গেলে জার্মানরা ভীষণভাবে প্রতিশোধ নেবে। এ ছাড়া তারা আরও প্রচার করতে থাকে যে,

যুগোস্লাভিয়া বা জার্মান-অধিকৃত সোভিয়েট এলাকার ন্যায় পোলাণ্ড গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত নয়।

এই প্রচার সত্ত্বেও পোলিশ জনসাধারণ এবং পোলিশ জনসেনা সোভিয়েট দেশে লালফৌজের বিজয়কাহিনী শুনে অন্যভাবে চিন্তা করতে লাগলো এবং তাদের কাজও তদনুসারেই চললো। জার্মানদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হবার বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল তাতে গেরিলা আন্দোলন খানিকটা বাধা পেয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু পোলিশ সামরিক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা জনসাধারণ থেকে গেরিলা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেল। পোলিশ জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে গেরিলাদের সমর্থন করলো এবং জার্মানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম-চালনায় তারা অগ্রসর হলো। লোকের মনে তখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, গেরিলা আন্দোলন ও জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-চালনার দ্বারা তাদের দুঃখ তো বাড়েইনি, বরঞ্চ লাঘবই হয়েছে। জার্মানরা যখন কৃষকদের বিষয়-আসয় লুণ্ঠনের চেষ্টা করেছে, গেরিলারা তখন তাদের বাধা দিয়েছে, জার্মানদের গুদাম লুট করে খাদ্য এনে জনসাধারণকে দিয়েছে, পোলিশ বন্দীদের মুক্ত করেছে এবং রেলপথ ও সড়কাদি নষ্ট করে দিয়ে জার্মানদের অত্যাচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এইসব কাজের দ্বারাই গেরিলারা পোলিশ জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে।

পোলিশ জনসাধারণ লাল ফৌজের বীরত্বের কাহিনী শুনে ক্রমশ তাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে এবং সোভিয়েট জনসাধারণের প্রতি তাদের সহানুভূতি ক্রমশ বেড়ে চলে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, লাল ফৌজের যে-সব লোক জার্মান বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে আসতো পোলিশরা তাদের অনেক সময় লুকিয়ে রাখতো এবং তাদের খাদ্য ও সম্ভব হলে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতো। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়,

পোলিশ জনসাধারণ তখন বুঝতে পেরেছিল যে, লাল ফৌজের জয়ের মধ্যে তাদেরও মুক্তি রয়েছে।

পোলিশ জনসেনার আক্রমণে উদ্ব্যস্ত হয়ে জার্মানরা নির্মমভাবে অত্যাচাব শুরু করলো। প্রকাশ্য রাস্তায় দলে দলে পোলিশদের ধরে জার্মানরা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখতো; মৃত দেহগুলি সরানো নিষিদ্ধ ছিল। ওয়ারস'তেই অত্যাচার চললো সবচেয়ে বেশি, কেননা সেটাই ছিল জনযুদ্ধের মূল কেন্দ্র। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পোলাণ্ডের গুপ্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ৫০ জন সদস্যকে ওয়ারস'তে ফাঁসীতে ঝুলানো হয়। জনযোদ্ধারাও এর প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। পিপল্স্ গার্ডের সশস্ত্র স্কোয়াডসমূহ অসম সাহসে নির্ভর করে একসঙ্গে শহরের কেন্দ্রে কয়েক স্থানে জার্মানদের আক্রমণ করে। জনসেনা কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁতে অকস্মাৎ হানা দিয়ে জার্মানদের সর্বনাশ করে। জার্মান-পরিচালিত একখানি সংবাদপত্রের ছাপাখানাও তারা বিনাশ কবে দেয়। কয়েকজন জার্মান অফিসারও মারা যায়।

ওয়ারস'র বুকে যারা জার্মানদের এই বিপর্যয় ঘটায় তারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না এবং অস্ত্রও তাদের সামান্যই ছিল। কিন্তু এই ঘটনার দ্বারা উভয় দিকে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় এবং সমগ্র পোলাণ্ডের সহানুভূতি এই বীর যোদ্ধারা অর্জন করে। এই ঘটনার পর জার্মানরা ওয়ারস'তে আর প্রকাশ্য স্থানে লোককে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাতে সাহসী হয়নি। জার্মানরা অন্যভাবে ওয়ারস'বাসীকে সায়েস্তা করবার চেষ্টা করলো। তারা শহরে ব্যাপকভাবে পিটুনি ট্যাক্স চাপিয়ে দিল। জনযোদ্ধারা এই ব্যবস্থাকেও নীরবে সহ্য করলো না; প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তারাও মিউনিসিপাল সেভিংস ব্যাঙ্কে হানা দিয়ে অর্থ লুট করলো। পিটুনি ট্যাক্সের অর্থ উক্ত ব্যাঙ্কেই নিয়ে জমা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বার এভাবে ঘা খেয়ে জার্মানরা আর কোন প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা

করলো না। দেখতে দেখতে ওয়ারস'র দৃষ্টান্ত অন্যান্য জায়গায় অনুসৃত হতে লাগলো। র‍্যাডম, ক্র্যাকভ, লুবলিন এবং লজ-এ জনযোদ্ধারা জার্মানদের ওপর আক্রমণ চালালো।

এর পর পোলিশ জনসেনা জার্মানদের বিরুদ্ধে অবিরাম সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলো। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গণতান্ত্রিক সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিব সম্মিলিত বাহিনী লুবেল-এর দক্ষিণে কৃষকদের রক্ষা করতে অগ্রসর হলো। জার্মানদের অত্যাচারে সেখানকার কৃষক সম্প্রদায় প্রায় ধ্বংস হতে চলেছিল; পোলিশ জনসেনাই গিয়ে তাদের রক্ষা করলো। সেই বছর মার্চ ও এপ্রিল মাসে উক্ত এলাকায জনসেনার শক্তি এতটা বেড়ে যায় যে, সে এলাকার মধ্য দিয়ে জার্মানরা একখানি মোটর গাড়ী বা একখানিও রেলগাড়ী পাঠাতে সাহস করেনি।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে জার্মান-সোভিয়েট রণাঙ্গনে যুদ্ধে খানিকটা মন্দা পড়ে। জার্মানরা তখন যান্ত্রিক বাহিনী সমেত প্রায় আটটি ডিভিসন পোলাণ্ডে গেরিলাদের নির্মূল করবার জন্যে পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা পোলিশ মুক্তি-আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টিরও প্রয়াস পায় এবং তদুদ্দেশ্যে হিটলারীরা মাথা খাটিযে 'কাটিন ঘটনার' সৃষ্টি করে; অর্থাৎ স্মোলেনস্ক এলাকায় নাৎসীরা পোলিশ সমরবন্দীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে এবং গোয়েবল্‌স্‌ পরে প্রচারকার্য চালান যে, সোভিয়েট পক্ষই সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করেছিল।

পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং নাৎসীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন গোপন চুক্তি হয়েছিল কিনা বলা কঠিন; কিন্তু লণ্ডনপ্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি যে এ নিয়ে খুব হৈ চৈ শুরু করেছিল এবং এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ওপরই চাপাবার চেষ্টা করেছিল, তা আর জগদ্বাসীর কাছে গোপন নেই। তখন প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র এবং জার্মান

সংবাদপত্রসমূহে একই সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মে মাসেও পোলাণ্ডের ইহুদীদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন চলতে লাগলো। হিটলারী দল ও পোলিশ পতিক্রিয়াপন্থীদের দুরভিসন্ধি কতকটা সফল হলো। একদল পোলিশ অফিসার তখন প্রতিরোধ-সংগ্রাম থেকে সৈন্যদের দূরে রাখতে চেষ্টিত হলেন। তাঁদের নায়ক ছিলেন ফাসিস্ত জেনারেল সস্নকোভ্স্কি। তিনি লণ্ডনে থেকে সলাপরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়তার ফলে সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। গেরিলাদের সাফল্য দেখে তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'অস্ত্র গুটিয়ে আমরা বসে আছি। জার্মানদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করা দরকার ও সম্ভব, তখন আমরা যুদ্ধ করছিনা কেন?' সিকোরস্কির মৃত্যুর পর সৈন্যদের মধ্যে এই অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য আরো বেড়ে যায়। সস্নকোভ্স্কি তখন পোলিশ বাহিনীর সর্বেসর্বা হয়ে বসেন; কিন্তু তাঁর প্রতি পোলিশ সৈন্যরা সন্তুষ্ট ছিল না। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোলাণ্ডের যে দুর্গতি হয় তার জন্যে সস্নকোভ্স্কিও দায়ী বলে তাদের ধারণা ছিল এবং অনেকে চাইছিল যাতে তিনি পোলাণ্ডে আর কখনো ফিরে না আসেন।

প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট খবর রাখতেন যে, পোলাণ্ডে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের নীতির সামান্য পরিবর্তন না করলে পোলিশ সৈন্যদের তাঁরা হাতে রাখতে পারবেন না। তাই তাঁরা 'সীমাবদ্ধ সংগ্রামের' নির্দেশ দিয়ে যুদ্ধের একটা ভান করলেন। সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁরা স্পষ্টরূপেই নির্দেশ দিলেন যে, জার্মানদের চলাচলপথ যেন ধ্বংস করা না হয়, কারণ তা করলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকেই সাহায্য করা হবে।

গেরিলা আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে কিছুতেই রোধ করতে না পেরে হিটলারীরা লোকের মনে ত্রাস সঞ্চারের জন্যে এক

নতুন পন্থা অবলম্বন করে। পোলদের মনে এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যে, তাদের অবস্থাও ইহুদীদেরই মতো হতে পারে। গুপ্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঁচ শত জন সদস্যকে ওয়ারস'তে পাভিয়াক বন্দীশালায় গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। এছাড়া সমগ্র পোলাণ্ডে জার্মান অত্যাচারীদের তাণ্ডবলীলা চলে। কিন্তু এই অত্যাচারের ফলে পোলিশদের প্রতিরোধ-আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সর্বত্র এক কথা ধ্বনিত হয়, 'পাভিয়াকের প্রতিশোধ চাই।' এই সঙ্কল্প নিয়ে পিপল্‌স্ গার্ডের নেতৃত্বে পোলাণ্ডে সমস্ত গণতান্ত্রিক সামরিক প্রতিষ্ঠান সমবেতভাবে জার্মানদের ওপর আঘাত হানতে অগ্রসর হয়। এক রবিবারে দিনের বেলায় ওয়ারস'তে সশস্ত্র পোলিশ সৈন্যদল জার্মান ঝটিকা বাহিনীর একটি কম্পানীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেটিকে ধ্বংস করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে উইয়াজদোভ্‌স্কি এভিনিউতে এই কাণ্ড ঘটে। জার্মানরা এইটির নাম বদলে রেখেছিল, "এভিনিউ অব ভিক্টর্স" অর্থাৎ বিজয়ীদের রাজপথ। সঙ্গে সঙ্গে হোটেল, রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে এবং রাস্তায় গাড়ী আটক করে পোলিশ জনযোদ্ধারা জার্মানদের ওপর আক্রমণ চালায়।

পোলিশরা তখন জানতে পেরেছিল যে, লালফৌজ জার্মানদের পরাজিত করে দুর্বার বেগে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছে। এতে পোলাণ্ডের সর্বসাধারণ দ্বিগুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালায়। জার্মানদের সমস্ত চেষ্টা এবং সন্নকোভ্‌স্কির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। পোলাণ্ডের বিশ্বাসঘাতকের দল গেরিলাদের ওপর যে-সব কাপুরুষোচিত আক্রমণ চালায় তাতে তারা জনসাধারণের সহানুভূতি হারায়। পোলিশবাসীদের হৃদয়ে গেরিলাদের আসন ক্রমশই অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

বাইরে থেকে জার্মানরা যতই চাপ দিতে থাকে ভেতর থেকে

পোলাণ্ডের গণতন্ত্রী সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি ততই বেশি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তারা বুঝতে পারে যে, পোলাণ্ডের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী একটি কেন্দ্রীয় সেনানীমণ্ডলের অধীনে পরিচালিত হ'লে তাদের রণসামর্থ্য অনেক বেড়ে যাবে। এছাড়া অস্ত্রসংগ্রহের স্থবিধের জন্যেও একটিমাত্র সেনানীমণ্ডলেব অধীনে বিভিন্ন সৈন্যদলের পরিচালিত হওয়া দরকার হয়ে পড়ে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পোলিশ বাহিনীর পরাজয়ের পর গোপনে কতকগুলি অস্ত্র মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। সময় মতো সেগুলি তুলে নেওয়া হলো। পরাজিত জার্মান সৈন্যদের অস্ত্র এবং জার্মান গুদাম থেকে লুণ্ঠিত অস্ত্রও পোলিশ জনযোদ্ধাদের হাতে কিছু পড়েছিল। জার্মানদের কাছ থেকে পোলিশ জনসেনা যে অর্থ লুট করে নিয়েছিল তা দিয়েও কিছু অস্ত্র কেনা সম্ভব হলো। এ ছাড়া লণ্ডন থেকে পোলিশ গবর্ণমেণ্ট তাদের সমর্থক যে-সব প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র পাঠিয়েছিল সে-সব প্রতিষ্ঠানের সৈন্যরা যখন জন-বাহিনীতে এসে যোগ দিল তখন তাদের অস্ত্রগুলিও জনযোদ্ধাদেরই হাতে এসে পড়লো। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় তাদের অস্ত্র ছিল খুবই কম।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে পোলাণ্ডের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে একটি সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলের অধীনে আনবার আয়োজন চলে। সে বছর গ্রীষ্মকালে গুপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পিপল্‌স্ গার্ড, পেজাণ্ট ব্যাটেলিয়ন্স, পেজাণ্ট গার্ড, পিপল্‌স্ মিলিসিয়া এবং প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত আর্মজা ক্রাজোভা বাহিনীর কতক সৈন্য সম্মিলিত সামরিক দল গঠনের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দলের ভিতর ঐক্যের ভাব বর্ধিত হয়।

এদিকে পোলাণ্ডের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জার্মানবিরোধী দল

মিলে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পোলিশ জাতীয় পরিষদ গঠিত করে। এই পরিষদই সকল দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে। পরিষদের অধীনে একটি সম্মিলিত কেন্দ্রীয় সেনানীমণ্ডল এবং তার অধীনে ছোট ছোট স্থানীয় সেনানীমণ্ডল গঠিত হয়। এই ঐক্যের ফলে পোলাণ্ডের সশস্ত্র জনযোদ্ধাদের প্রাণে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং তাদের যুদ্ধোত্মমও অনেক গুণ বেড়ে যায়। এই সম্মিলিত সৈন্যদলই হলো পোলাণ্ডের আসল মুক্তিসেনা।

ওয়ারস'র বিদ্রোহ

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে ওয়ারস'তে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। সোভিয়েট সৈন্যরা তখন বুগ নদী পার হয়েছে। পূর্ব পোলাণ্ডে চেলম্, লুবলিন এবং আরো অনেকগুলি শহর লাল ফৌজের হস্তগত হয়েছে। সোভিয়েট সেনানী মার্শাল রকোসোভ্স্কির সৈন্যরা পোলাণ্ডে ভিস্তুলা নদীর দিকে এগিয়ে আসছে। জার্মানরা ওয়ারস' রক্ষায় ব্যস্ত। পোলরা লাল ফৌজের অগ্রগতির খবর শুনে উৎফুল্ল।

পিপল্স্ আর্মি, সিকিওরিটি কোর, এমন কি প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের হোম আর্মির অভিজ্ঞ অফিসারগণও জানতেন যে, ওয়ারস'তে জার্মানরা তাদের প্রতিপক্ষকে প্রবলভাবে বাধা দেবে, লাল ফৌজ সোজাসুজি আক্রমণ চালিয়ে ওয়ারস'তে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা একথাও জানতেন যে, বুগ থেকে লাল ফৌজ ভিস্তুলার দিকে এতটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে যে, তাদের চলাচল-পথ ঠিক করে নিতে কিছুদিন সময় লাগবে; সরবরাহের পথ ভালোভাবে নির্মাণ না করে এগুতে গেলে লাল ফৌজকে বিপদে পড়তে হবে। তা ছাড়া ভিস্তুলা নদী পার হ'তে হ'লে তাদের আগে কয়েকটি শক্ত ঘাঁটিও স্থাপন করতে

হবে। এই সব বিবেচনা করে অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারগণ যারা বিদ্রোহের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল তাদের আসল অবস্থাটা বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, ভিস্তুলার তীরস্থ জার্মান ব্যূহে তখন বহু নতুন জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু এত ক'রে বুঝানো সত্ত্বেও বিশেষ ফল হলো না। হোম আর্মিতে জেনারেল বোর-এর নেতৃত্বে যে দল ছিল তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো। তাদের ছিল একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি; কাজেই পোলিশ জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি তারা দৃক্‌পাত করা দরকার বোধ করেনি। জেনারেল বোর-এর দলের পরিকল্পনাকে হোম আর্মির সকল দায়িত্বশীল অফিসারই যে অনুমোদন করেছিলেন এমন নয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, হোম আর্মিরই একটি অংশ সিকিওরিটি কোরের একদল বিশিষ্ট অফিসার এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, লাল ফৌজ ভিস্তুলার তীরে ভালোভাবে ব্যূহ রচনা না করা পর্যন্ত এবং ভিস্তুলার পূর্বতীরে ওয়ারস'র উপকণ্ঠ তাদের দখলে না যাওয়া পর্যন্ত ওয়ারস'তে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সমীচীন হবে না। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিলেন যে, ওয়ারস'র উত্তরে কি দক্ষিণে ভিস্তুলা নদী পার হয়ে এসে পশ্চিম তীরে লাল ফৌজ দৃঢ় সেতুমুখ স্থাপন না করা পর্যন্ত বিদ্রোহ স্থগিত রাখাই সঙ্গত হবে। কিন্তু এই সব অগ্রাহ্য করে জেনারেল বোর ভেতরে ভেতরে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃবৃন্দ এবং জনসেনার অধিনায়কের কাছে তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রেখেছিলেন। এই অকাল বিদ্রোহের প্রধান ইন্ধন যোগান লণ্ডনের প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন যে, লাল ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে পোলিশ জনসেনা যদি ওয়ারস' উদ্ধার করে তবে ওয়ারস'র শাসনভার পোলিশ জনসাধারণেরই হাতে যাবে; সেক্ষেত্রে প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের

অর্থপুষ্ট জেনারেল বোর এবং তাঁর দলের কোন কর্তৃত্বই খাটবে না। কাজেই লাল ফৌজ ওয়ারস'র কাছে ভালোভাবে এগিয়ে আসবার আগেই প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট ও তাঁদের সমর্থক প্রতিক্রিয়াশীল সমরকর্তারা ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে তাতাতাড়ি কাজটা সেরে নিতে চেয়েছিলেন। ওয়ারস'তে অকাল বিদ্রোহ করবার মূলে ছিল জেনারেল বোর ও তাঁর দলের এই রাজনৈতিক চক্রান্ত।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ১লা অগাস্ট। ভিস্তুলার ওপরে যতগুলি সেতু ছিল সেগুলিকে ভালোভাবে পাহারা দেবার জন্যে জার্মান প্রহরী সৈন্যের সংখ্যা বিস্তব বাড়ানো হয়েছে এবং ভিস্তুলা নদীতে মাইন পাতা হয়েছে। অপরাহ্ণে অকস্মাৎ ওয়ারস'র কেন্দ্রস্থলে এক ভীষণ বিস্ফোরণ হলো। ওয়ারস'র যে জার্মান সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন তাঁর অফিস-বাড়ী উড়িয়ে দেবার জন্য একটি বোমা স্থাপন করা হয়েছিল। সেই বোমা বিস্ফোরণের শব্দই ওয়ারস'বাসীরা শুনতে পেল। সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাইফেল্ ও মেশিনগানের গুলী চললো। পোলিশ হোম আর্মির সৈন্যরা সাফল্যের সহিত থানা, সরকারী ইমারত এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থাদি ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হলো। হোম আর্মির নায়ক জেনারেল বোর অকস্মাৎ বিদ্রোহ শুরু করলেও পিপল্‌স্ আর্মির নায়কগণ অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের কর্তব্য স্থির করলেন এবং তাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিলেন। কেবল পিপল্‌স্ আর্মিই নয়, অন্যান্য গণতন্ত্রী সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির সৈন্যরাও এই বিদ্রোহে সহযোগিতা করে।

জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ওয়ারস'রক্ষী সেনানীমণ্ডল গঠিত হয় এবং তাতে পিপল্‌স্ আর্মির প্রতিনিধিরাও স্থান পায়। পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির যেসব প্রতিনিধি পিপল্‌স্ আর্মির যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে ওয়ারস'তে ছিলেন

তাঁদেরই চেষ্টায় এই ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়। তাঁরা এই অকাল বিদ্রোহে আপত্তি করেছিলেন; তাঁরা বলেছিলেন যে, এই বিদ্রোহের যারা উদ্যোগী তাঁরা পোলিশ জনসাধারণের যথার্থ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহ যাতে সফল হয় তার জন্যে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

প্রথম তিন দিন যুদ্ধের অবস্থা বিদ্রোহীদের অনুকূলেই যাচ্ছিল। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির অধিকাংশই বিদ্রোহীদের হাতে আসে। শহরের কেন্দ্রস্থলে টেলিফোন স্টেশন, পোস্ট অফিস, নেপোলিয়ন স্কোয়ারের প্রকাণ্ড বাড়ী, পলিটেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুটএর বাড়ী এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা বিদ্রোহীরা দখল করে। গ্যাসের কারখানা এবং আরো কয়েকটি স্থান জার্মানদের দখলে থাকে।

প্রাগায় বিদ্রোহীরা তেমন সুবিধে করতে পারলো না। সেখানকার বিদ্রোহী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র খুবই কম ছিল; তাদের তুলনায় জার্মানরা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। কাজেই সেখানে তাদের পরাজয় হলো। বাছাই করা জার্মান সৈন্যরা কামান ও মেশিনগান নিয়ে ভিস্তুলা নদীর ওপরের সেতুগুলি পাহারা দিচ্ছিল। তাদের হটিয়ে দিয়ে সেতুগুলি দখল করা বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে বিদ্রোহীদের পশ্চাদপসরণ করতে হলো। সেতুগুলির নিকটবর্তী বাড়ীসমূহে তারা গিয়ে আশ্রয় নিল এবং সেখান থেকে অনেক দিন পর্যন্ত তারা সেতুগুলির ওপর গুলীগোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো; তার ফলে সেতুর ওপর দিয়ে জার্মানদের যাতায়াতের যথেষ্টই অসুবিধে হলো। প্রাগায় এই বিপর্যয়ের ফল এবং পরে হোম আর্মির সেনানীরা দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ চালাতে অস্বীকার করায় অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো। বিদ্রোহের এক রকম তৃতীয় দিনেই জার্মানরা আকস্মিক আক্রমণের প্রথম চোট সামলে নিতে সক্ষম হলো। তারা বহু ট্যাঙ্ক,

বড় বড় কামান, মর্টার, পদাতিক ও বিমান আমদানী করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করলো। ওয়ারস'তে দ্বিতীয়বার ধ্বংস-যজ্ঞ আরম্ভ হলো। বড় বড় কামান ও মর্টার থেকে জার্মানরা শহরের স্কোয়ারগুলির উপর গোলাবৃষ্টি করতে লাগলো। জার্মান স্যাপারগণ তাদের সৈন্য পাঠাবার পথ পরিষ্কার করবার জন্যে নির্বিচারে বাড়ীর পর বাড়ী উড়িয়ে দিতে লাগলো এবং তার ফলে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু লোক মারা গেল। জার্মান বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনীর মতো ডানা বিস্তার করে আকাশে উড়তে লাগলো এবং ওয়ারস'র বক্ষে উগ্র বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা বর্ষণ করে চললো। শহরের সমস্ত অঞ্চলে আগুন লেগে গেল। কৃষ্ণ ধূমরাশিতে ওযারস'র আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। জার্মানরা শহরের জলসরবরাহের ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় সমস্ত শহরে ভীষণ জলাভাব দেখা দিল। জলের অভাবে আগুন নেভানো কষ্টকর হয়ে পড়লো এবং তাতে লোকের কষ্টও অনেক বেড়ে গেল। জলের জন্যে যেসমস্ত বেসামরিক লোক রাস্তায় গিয়ে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াতো, জার্মান বিমানগুলি নিম্নাকাশে এসে তাদের ওপর মেশিনগান দাগতো।

বিদ্রোহের প্রথম কয়েক দিন পর্যন্ত প্রায় সকলেরই এই বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিত্রপক্ষের বিশেষ করে লাল ফৌজের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই এই আশা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। ওয়ারস'র অধিবাসীরা বুঝতে পারলো যে, জেনারেল সস্নকোভ্স্কি, জেনারেল বোর এবং প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা এক হীন রাজনৈতিক চক্রান্ত করে পোলাণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আরম্ভ করেছেন। সর্বসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদের শোণিতের বিনিময়ে যেসব স্বার্থান্বেষী লোক কিছু রাজনৈতিক সুবিধে করে নেবার মতলবে এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি জনসাধারণের মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে পোলাণ্ডের ওপর দিয়ে যখন রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, জেনারেল বোর বা সম্বকোভ্স্কি অথবা লণ্ডনপ্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের কোন মন্ত্রী ওয়ারস'র সেই অগ্নিপরীক্ষায় জনসাধারণের দুর্গতি লাঘবের জন্যে কিছু করলো না। বরঞ্চ বৃটিশ, মার্কিন, সাউথ আফ্রিকান এবং পোলিশ বিমানীরা মাঝে মাঝে ল্যাঙ্কেস্টার ও ফ্লাইং ফোরট্রেস বিমান নিয়ে এসে কিছু কিছু খাদ্য ও অস্ত্র ফেলে দিয়ে যেত। কিন্তু সেগুলি অনেক সময়ই বিদ্রোহীদের হাতে পড়তো না; কারণ বাতাসে প্যারাশুটকে উড়িয়ে বিদ্রোহীদেব এলাকার বাইরে নিয়ে যেত; অথচ প্যারাশুট ছাড়া খাদ্য ও অস্ত্র ফেলাও সম্ভব ছিল না।

জেনারেল বোর, জেনারেল সম্বকোভ্স্কি এবং লণ্ডনপ্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টের চাঁইরা লাল ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদ্গার করেন এবং বলেন যে, সোভিয়েট কমাণ্ড তাদের কোনই সাহায্য করেননি। অথচ বিদ্রোহীদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁরা নিকটবর্তী লাল ফৌজেব সেনাপতিদের যথাযথ খবর দেবার কোনই চেষ্টা করেননি বা লাল ফৌজের সহিত সংশ্লিষ্ট পোলিশ বাহিনীর কমাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্যেও তাঁরা প্রয়াস পাননি।

বলা বাহুল্য, লাল ফৌজ ও তৎসংশ্লিষ্ট পোলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পোলিশ আর্মি কমাণ্ড ওয়ারস' বিদ্রোহের বিয়াল্লিশ দিনের দিন অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর প্রথম এই বিদ্রোহের খবর পান। সেইদিনই রাত্রে শ' শ' পোলিশ ও সোভিয়েট বিমানী ওয়ারস'তে এসে বিদ্রোহীদের জন্যে খাদ্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে দিয়ে যায়। এইগুলি কার্যত প্রায় সবই বিদ্রোহীদের হাতে পড়ে; কেন না জার্মান বিমানধ্বংসী কামানের ভয় থাকা সত্ত্বেও পোলিশ ও সোভিয়েট বিমানীরা নিম্নাকাশে নেমে এসে প্যারাশুট ছাড়াই খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে যায়। সুতরাং দেখা যায়, যথাসময়ে খবর পায়নি বলেই

লাল ফৌজ এবং তাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পোলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের আগে সাহায্য করতে পারেনি; খবর পেয়েই তারা যে সকল বিপদ অগ্রাহ্য করে ওয়ারস'র বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে ছুটে আসে তা থেকেই বোঝা যায় তাদের কোন কুমতলব ছিলনা।

জার্মানরা যখন নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলো যে, তাদের অস্ত্রবল বেশি, তখন তারা ব্যাপক ভাবে আক্রমণ শুরু করে দিল এবং বিদ্রোহীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। জার্মানরা ত্রিধারা আক্রমণ চালালো। তুমুল সংগ্রামের পর ভলা ও অকোটা অঞ্চলে জার্মানরা বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হলো। পিপল্‌স্ আর্মির সৈন্যরা সেখানে যুদ্ধ করছিল। তারা পশ্চাতে হটে প্রাচীন শহর এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। প্রাচীন শহরে প্রত্যেকটি রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করা হলো। প্রত্যেকটি বাড়ী এক একটি দুর্গে পরিণত হলো। জার্মানরা এমন ভাবে বোমা ও কামানের গোলাবৃষ্টি করতে লাগলো যার ফলে পুরানো শহর এক ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হলো। তাতেও প্রতিরোধ থেমে গেলনা। প্রতিটি ইঁটের পেছনে যেন জার্মানরা মৃত্যুর করাল ছায়া দেখতে পেল। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চললো না। প্রতিরোধীদের গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে গেল। জল নেই, খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই। বেশিদিন এভাবে তাদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়লো। একদল প্রতিরোধী যুদ্ধ করে জলিবর্জেব দিকে বেরিয়ে গেল; আর এক দল শহরের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ-বাহিনী তখনো পর্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করে চলেছিলো তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিদ্রোহীদের অবস্থা আবার খানিকটা ভালো হলো। তারা বিমানে প্রেরিত কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য পেল। লাল ফৌজ ও তাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পোলিশ বাহিনী প্রাগা দখল করলো; ওয়ারস'র ওপরে সোভিয়েট জঙ্গী বিমানগুলি জার্মান বোমারু বিমানগুলিকে

তাড়া করতে লাগলো ; সোভিয়েট ও পোলিশ গোলন্দাজরা বিদ্রোহীদের এলাকা থেকে জার্মানদের দূরে রাখবার জন্যে দূর পাল্লার কামান দেগে রক্ষাব্যূহ রচনার চেষ্টা করলো। ভিস্তুলার যে তীরে ওয়ারস' নগরী অবস্থিত সেই তীরে একদল সোভিয়েট-চালিত পোলিশ সৈন্য নদী পার হয়ে এসে ঘাঁটি গাড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু ট্যাঙ্ক ও কামানের অভাবে তারা সেখানে ভালো ভাবে দাঁড়াতে পারলো না। জার্মানরা ইতিমধ্যে ওয়ারস'র বিদ্রোহীদের ওপর ভীষণভাবে চাপ দিল। বিদ্রোহীরা আস্তে আস্তে নিঃশেষ হতে চললো। মকোটভের পতন হলো। তারপর এলো বিদ্রোহীদের চরম পরাজয়।

ওয়ারস'তে বিদ্রোহীদের অবস্থা যখন একেবারে শোচনীয় হয়ে উঠলো, তখন লাল ফৌজ ও তাদের সংশ্লিষ্ট পোলিশ আর্মির সেনাপতিরা পোলাণ্ডের হোম আর্মির পরিচালকদের পরামর্শ দিলেন যাতে সোভিয়েট কামান ও বিমানের সহায়তায় ওয়ারস'র বিদ্রোহী সৈন্যরা শত্রুব্যূহ ভেদ করে ভিস্তুলা নদীর দক্ষিণ তীরে চলে যায়। ব্যূহ ভেদের সময় নির্দিষ্ট হলো এবং সকলেই আশা করলো বিদ্রোহী সৈন্যরা সত্যই এবার বেরিয়ে যাবে। কেবল সৈন্যরা নিজেরাই যাবে না, যতদূর সম্ভব বেসামরিক অধিবাসীদেরও, বিশেষ করে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ ও আহত ব্যক্তিদেরও তারা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এমন আশাও অনেকেই করলো।

ভিস্তুলার দক্ষিণ তীরে যাবার জন্যে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করা সহজ ছিল না একথা সত্য, কিন্তু এটা অসম্ভব ব্যাপারও ছিলনা ; কেননা পিপল্‌স্ আর্মির যেসকল সৈন্য আত্মসমর্পণে অসম্মত হয়েছিল তারা ভিস্তুলা নদী পার হয়ে গিয়েছিল। তারা যখন নদী পার হচ্ছিল, সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী তখন জার্মান ঘাঁটিগুলিতে দূর পাল্লার কামান দেগে আচ্ছাদন (ব্যারেজ) সৃষ্টি করেছিল এবং সেই আচ্ছাদনের অন্তরালে থেকেই পোলিশ জনসেনা পার হতে পেরেছিল।

কিন্তু জেনারেল বোর ব্যূহভেদ করে নদী পার হবার চেষ্টা করবার চাইতে আত্মসমর্পণ করাই বেশি পছন্দ করলেন। ফলে ওয়ারস'র হাজার হাজার সাহসী যোদ্ধা ও অসংখ্য বেসামরিক অধিবাসীকে নির্মম শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো। জার্মানরা যতদূর সম্ভব এর প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। পরাজিত বিদ্রোহী সৈন্যদের তারা বন্দী-শিবিরে পাঠালো। জনসাধারণের অদৃষ্টে নেমে এল অনাহার, লাঞ্ছনা ও দাসত্বের কঠোর শ্রম। যে বিদ্রোহের ইতিহাস প্যারিস-বিদ্রোহেরই মতো গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারতো, অদূরদর্শী, অবিমৃষ্যকারী, জনস্বার্থে উদাসীন, রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের হাতে পড়ে সেই বিদ্রোহ এক বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। লণ্ডনের প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট বিদেশীদের নিকট এই যুদ্ধকে বিকৃতভাবে বোঝাবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা প্রচার করতেন যে, পোলিশ জনসেনা এবং সোভিয়েট লালফৌজের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু সত্য বেশিদিন গোপন থাকে না, আগুন কখনো চাপা থাকে না। কিছুদিনের মধ্যেই জেনারেল সস্নকোভ্স্কি এবং জেনারেল বোরের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। পোলিশ জনসেনার অধিনায়কদের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা যে অকাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল লাল ফৌজের এগিয়ে আসবার আগেই কিস্তিমাৎ করে পোলাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা, লাল ফৌজের সহযোগিতা লাভ নয়। তাঁদের সেই চক্রান্ত বুঝতে পেরেও ওয়ারস'র গণতান্ত্রিক যোদ্ধারা তাঁদের সঙ্গে এই কারণে যোগ দিয়েছিল যে, বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'লে জার্মানদের শক্তি আরো বেড়েই যাবে এবং তার ফলে পোলাণ্ডের মুক্তিসংগ্রাম বেশি করে বাধা পাবে। কিন্তু অকাল-বোধনে যেমন কুম্ভকর্ণ নিপাত হয়েছিল, ওয়ারস'র এই অকাল বিদ্রোহও তেমনি এক অকল্যাণকে ডেকে আনলো।

পোলিশ প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ওয়ারস'র বুকে নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাত হলো। এই আঘাত সামলে নিতে পোলিশ মুক্তিসেনাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

জাতীয় মুক্তি কমিটি

পোলাণ্ডে সর্বদলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠিত হয়। এই জাতীয় মুক্তি কমিটিতে শ্রমিক, কৃষক, উদারনৈতিক, সমাজতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট, ছাত্র প্রভৃতি সকল দল ও সকল শ্রেণীর লোকই স্থান পায়। প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট প্রচার করে বেড়াতেন যে, তাঁদের পিছনে পোলাণ্ডের চারিটি প্রধান রাজনৈতিক দল অর্থাৎ পোলিশ কিষান দল, জাতীয় দল, সমাজতন্ত্রী দল এবং শ্রমিক দলের সমর্থন ছিল; কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার ন্যায় পোলাণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও যারা প্রগতিশীল ছিল তারা সকলেই পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটিকে সমর্থন করলো। তবে ঐ সব দলের প্রাচীন নেতারা লণ্ডনে থেকে সেখানকার পোলিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পোলাণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির ওপর তখন তাঁদের আর কোন প্রভাবই ছিল না। উপরোক্ত চারটি রাজনৈতিক দলই পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটিতে যোগ দেয়।

পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির প্রধান কেন্দ্র হয় লুবলিন। অস্থায়ী পার্লামেণ্ট হিসেবে পোলাণ্ডের একটি জাতীয় পরিষদও গঠিত হয় একথা আগেই বলেছি। লুবলিনে এই জাতীয় পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশনে ১৯২১ খৃস্টাব্দের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তার সভাপতি বেলুস্লাভ বাইরুটকে পোলিশ প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। স্থির হয়, সমগ্র পোলাণ্ড যতদিন মুক্ত না হবে এবং গণপরিষদ যতদিন আহ্বান করা

সম্ভব না হবে ততদিন তিনি পোলিশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট রূপে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। বাইরুটের বয়েস এখন পঞ্চাশের কিছু বেশি। এক কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে যখন তিনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই তাঁর বিপ্লবী জীবন শুরু হয়। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে ফাসিস্তবিরোধী কাজের জন্যে তাঁর সাত বছর কারাদণ্ড হয়েছিল।

পোলিশ জাতীয় পরিষদে আর একটি আইন করে বিভিন্ন স্থানে পুনরায় ডেমোক্রাটিক পিপ্‌ল্‌স্ কাউন্সিলসমূহ গঠন করা হয় এবং সেইগুলির ওপব প্রদেশ, জেলা, শহর প্রভৃতিব শাসনভার অর্পিত হয়। যে-কোন গণতান্ত্রিক ও স্বদেশপ্রেমিক গণপ্রতিষ্ঠান ১৯২১ খৃস্টাব্দের পোলিশ শাসনতন্ত্র মেনে চললেই এই সব পিপল্‌স্ কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব পাবার অধিকারী হয়।

এবার পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির দু'জন প্রধান সম্পর্কে কিছু বলা যাক। তাঁদের একজন হলেন পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সভাপতি এডওয়ার্ড বোল্‌স্‌লাভ মোরাভ্‌স্কি এবং অপর জন হলেন পোলিশ মুক্তি ফৌজের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মাইকেল জিমিয়ারস্কি। শেষোক্ত ব্যক্তি পোলিশ গুপ্ত আন্দোলনে "জেনারেল রোলা" নামে পরিচিত ছিলেন।

এডওয়ার্ড মোরাভ্‌স্কি ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে ওয়ারস' রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি পোলাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন আজীবন সৈনিক। তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন সেই বংশ পোলাণ্ডে স্বদেশপ্রেমের জন্যে সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহে তাঁর পিতামহ যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর পিতা ১৯০৫ খৃস্টাব্দের বিপ্লবে লড়েছিলেন এবং পোলাণ্ড যখন রুশ জারের শাসনে ছিল তখন তিনি রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন।

প্রথম দিকে মোবাভ্স্কি ইমারতি কারবারে একজন সামান্য মজুরের কাজ করতেন; তারপর তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে কেরাণীর পদ পান। প্রথম বয়েস থেকেই তিনি শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন বিভাগে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়ে আসেন। সমাজতন্ত্রী দল, ট্রেড্ ইউনিয়ন, সমবায় আন্দোলন, শ্রমিক দলের সংবাদপত্র পরিচালনা এবং শিক্ষা বিভাগে তিনি কাজ করেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে তিনি সমাজতন্ত্রী দলের কোন্স্কি শাখার সম্পাদক, সমাজতন্ত্রীদের প্রাদেশিক কমিটির সভ্য এবং সমবায় পরিষদের সভাপতি হন ও একটি স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে স্থানীয় নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তাঁর চাকরি যায়। তাঁকে ভাইলুনে অন্তরীন করা হয়। তিনি সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। সেখানে তাঁকে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পুলিশের উপদ্রবে তিনি গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হন এবং ওয়ারস'তে পালিয়ে আসেন। সেখানে এসে তিনি সমবায়·আন্দোলনে যোগ দেন এবং কেন্দ্রীয় সমবায় আন্দোলনের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক হন।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে স্থানীয় নির্বাচনে শ্রমিক দলের প্রার্থীরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হ'লে পর কোন্স্কির মেয়র-পদের জন্যে মোরাভ্স্কির নাম প্রস্তাব করা হয়। এই সময় তিনি শ্রমিকদের কথা সংবাদপত্রে প্রচুর লেখেন। এছাড়া ওয়ার্কার্স ইউনিভার্সিটি এসোসিয়েসনের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে তিনি শ্রমিকদের শিক্ষার জন্যেও প্রভূত পরিশ্রম করেন।

ওয়ারস'র পতনের পর তিনি একটি স্বাধীনতা রক্ষী সংঘ গঠনে সাহায্য করেন এবং প্রথমে তিনি তার সংগঠনকারী সম্পাদক হন। পরে উক্ত সংঘের নেতারা সব গ্রেপ্তার হ'লে তিনি সংঘের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। গুপ্ত অবস্থায় থেকে তিনি রোবট্নিক (শ্রমিক) নামে একখানি পত্রিকার

সম্পাদনা করেন। নাৎসী গোয়েন্দারা তাঁকে ধরবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রতিরোধ আন্দোলনে জাতীয় পরিষদ গঠন হওয়া পর্যন্ত তিনি সমস্ত কাজে অগ্রণী হয়ে আসেন এবং উক্ত পরিষদে সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দলেব প্রতিনিধিরূপে তিনি যোগ দেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে পোলিশ জাতীয় পরিষদের বৈদেশিক প্রতিনিধিরূপে জার্মানদের চোখে ধূলি দিয়ে তিনি মস্কো চলে যান। তারপর তিনি পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হন।

পোলিশ মুক্তি ফৌজের প্রধান সেনাপতি এবং পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির দেশরক্ষা বিভাগের পরিচালক জেনারেল মাইকেল জিমিয়ারস্কি ১৯০৯ খৃস্টাব্দে পোলিশ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র ১৯ বছর। অস্ট্রিয়ান সৈন্যদলে তিনি তখন একজন অফিসার ছিলেন। লভোভ, ক্র্যাকভ এবং পোজনানে তিনি গোপনে পোলদের সামরিক শিক্ষা দিতেন।

গত মহাযুদ্ধে ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পোলিশ লিজিয়ন-এ থেকে যুদ্ধ করেন। তিনি লেফ্টেনান্ট কর্নেলের পদে উন্নীত হন এবং যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে পড়েন। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে তাঁর নেতৃত্বে উক্ত লিজিয়ন কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দ্বিতীয় কোর অস্ট্রিয়ান রণাঙ্গনে ব্যূহ ভেদ করে ইউক্রেনে চলে যায়। তারপর স্বাধীন পোলাণ্ডে পোলিশ আর্মিতে তিনি প্রথমে একটি পদাতিক ব্রিগেড এবং পরে একটি পদাতিক ডিভিসনে সেনাপতিত্ব পান। তিনি ফরাসী মিলিটারি একাডেমিতে শিক্ষালাভ করেন এবং পোলাণ্ডে ফিরে গিয়ে জেনারেল সিকোরস্কির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হন। তিনি ক্রমে মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হলেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে সৈন্যদলের

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রূপে তিনি সৈন্যদলকে মোটরসজ্জিত করা এবং বিমান ও অস্ত্র নির্মানের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

১৯২৬ খৃস্টাব্দে মার্শাল পিলসুড্স্কি যখন অকস্মাৎ পোলাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করেন, জিমিয়ারস্কি তখন বৈধ গবর্ণমেণ্টের দাবী উত্থাপন করেন এবং ডিক্টেটরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁর রাজনৈতিক শত্রুরা তখন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ এনে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্যে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে পোলাণ্ডের সর্বদল সমর্থিত গুপ্ত আদালতের বিচারে পূর্ববর্ণিত অভিযোগ থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়। জেনারেল সিকোরস্কির সঙ্গে তিনি ফ্রান্সে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে পোলাণ্ড যখন জার্মান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হবার উপক্রম হয় তখন তিনি স্বদেশে ফিরে এসে সৈন্যদলে যোগদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

পোলাণ্ড জার্মানদের অধিকারে যাবার পর জেনারেল জিমিয়ারস্কি প্রথমে প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট-সমর্থিত একটি সৈন্যদল পরিচালিত করেন। পরে ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে তিনি পিপল্‌স্ গার্ডে যোগ দেন। অবশেষে সকল দল মিলিত হয়ে যখন পোলাণ্ডে গুপ্ত পিপল্‌স্ আর্মি গঠন করে তখন তিনি তার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। বীরত্বের জন্যে তিনি তিনবার পোলাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সামরিক সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন।

এখানে পোলিশ-মুক্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট নায়িকা ভান্দা ভাসি-লেভ্স্কার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। স্বাধীন পোলাণ্ডের প্রথম পররাষ্ট্র সচিব লিয়ন ভাসিলেভ্স্কি তাঁর পিতা। ভান্দা ভাসিলেভ্স্কা পোলাণ্ডের একজন বিখ্যাত লেখিকা এবং কম্যুনিস্ট নেত্রী। পি, পি, এস (পোলিশ সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল) এর কার্য-নির্বাহক সমিতির তিনি সদস্যা ছিলেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যাঁদের

উদ্যোগে পোলিশ দেশভক্ত সংঘ গঠিত হয় তিনি তাঁদেরই একজন এবং পরে তিনি উক্ত সংঘের সভানেত্রী হন। সোভিয়েট দেশে পোলিশ আর্মি গঠনের ব্যাপারেও তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। পোলাণ্ড জার্মানদের কবল থেকে মুক্ত হবার পর যে লুবলিন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে তিনি একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। গেরিলা আন্দোলন সম্বন্ধে "রেন্‌বো" নামক একখানি উপন্যাস লিখে তিনি স্ট্যালিন প্রাইজ পান। একজন সোভিয়েট জেনারেলকে তিনি বিবাহ করেন। ভান্দা ভাসি-লেভ্‌স্কা পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

এছাড়া পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটিতে ছিলেন কৃষকদলের প্রধান নেতা আঁদ্রেজেজ ভিটোস্, স্ট্যানিস্লাভ্ কোটেগ অ্যাগ্রেজজেভ্‌স্কি, জান চেকোভ্‌স্কি, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমাজতন্ত্রী নেতা ডক্টর বোলস্লাভ্ ড্রবনার, সমবায় আন্দোলনের নেতা জান স্টিভান হেনম্যান, শিক্ষাব্রতী স্ট্যানিস্লাভ্ র‍্যাডকিউভিক, স্ট্যানিস্লাভ্ স্ক্রজেসযুভ্‌স্কি, রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার জান মাইকেল গ্রুবেকি, ফাসিস্তবিরোধী সাংবাদিক উইনসেণ্টি রিজমোভ্‌স্কি, প্রসিদ্ধ আইনজীবী ডক্টর এমিল সমার্স্টাইন এবং খ্যাতনামা ছাত্রনেতা ডক্টর স্টিফান জেড্রিচোভ্‌স্কি।

লণ্ডনের পোলিশ বাহিনী

লণ্ডনে প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট একটি পোলিশ বাহিনী গড়ে তোলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই পোলিশ বাহিনী গঠনের জন্যে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন। এই সৈন্যদল গঠনের আসল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি কখনো পশ্চিম ইওরোপের মিত্র শক্তি-বর্গের, বিশেষ করে বৃটেনের বিরোধ বাধে এবং তার ফলে সংগ্রাম শুরু

হয়, তখন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে এই পোলিশ বাহিনীকে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা। এই সৈন্যদলের বড় কর্তারাই যে কেবল এই ধারণা পোষণ করতেন এমন নয়, সাধারণ সৈন্যরাও বিশ্বাস করতো যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে লণ্ডনের 'ডেলি ওয়ার্কার' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট এই পোলিশ বাহিনীর কয়েকজন বৈমানিক বলে, "আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়ই আছি এবং সেই আশায়ই কাজ করে যাচ্ছি যেদিন পোলাণ্ড ও বৃটেন একযোগে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমরা যদি কখনো বুঝতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে রুশিয়ার বিরুদ্ধে বৃটেন ও পোলাণ্ডের যুদ্ধ করবার সম্ভাবনা নেই তখন আমরা বিমান নিয়ে মস্কোতে উড়ে গিয়ে ক্রেমলিনের ওপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বো ও মরবো।"

এই পোলিশ বাহিনীতে সাধারণ সৈন্যের চেয়ে অফিসারের সংখ্যা হয় বেশি। পোলাণ্ড থেকে যে-সকল জেনারেল, কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্‌টেন্‌ প্রভৃতি অফিসার পালিয়ে এসেছিলেন তাঁদেরই বেশি মাইনে দিয়ে এই বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। পোলাণ্ডের পতনের আগে এই সকল অফিসার সেখানে সকল রকম গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা করতেন এবং পোলিশ জনসাধারণের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার আগে ইওরোপে পোলাণ্ডই এক-মাত্র দেশ ছিল যেখানে যে-কোন সামরিক অফিসার বেসামরিক লোককে ইচ্ছে করলেই গুলী করে মারতে পারতেন। কোন বেসামরিক লোক কোন সামরিক অফিসারকে অসম্মান করেছে বলে সন্দেহ হ'লেই তাকে গুলী করে হত্যা করা হতো; তার জন্যে অফিসারকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হতো না। সাধারণত জমিদার ঘরের ছেলেরাই পোলিশ বাহিনীতে অফিসারের পদ পেতো এবং সে জন্যেই পোলিশ বাহিনীতে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সেই বাহিনীর

অফিসাররাই প্রবাসে পোলিশ বাহিনীর হর্তাকর্তা হয়ে বসেন। এ থেকেই বোঝা যায়, পোলাণ্ডের কোন্ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। পোলাণ্ডকে বিদেশী কবল থেকে মুক্ত করা বা পোলিশ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল পোলাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

ইংলণ্ডে এই প্রবাসী পোলিশ বাহিনীর প্রধান কর্তা ছিলেন জেনারেল সস্নকোভ্স্কি। এই সস্নকোভ্স্কি আগাগোড়া সামরিক ডিক্টেটরতন্ত্রের পক্ষপাতী ও সোভিয়েটবিদ্বেষী ছিলেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে পোলাণ্ডে হিটলারের বাহিনী যখন পূব দিকে এগিয়ে চলেছিল তখন তাদের ঠেকাবার চেষ্টা না করে তিনি গেলেন পশ্চিম ইউক্রেনের লভোভে লাল ফৌজকে রুখতে। কিন্তু লাল ফৌজকে রোখা তাঁর সম্ভব হলো না; নিরুপায় হয়ে কৃষকের বেশ ধরে তিনি ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন। এই সস্নকোভ্স্কিই ১৯২০ খৃস্টাব্দে পোলিশ বাহিনীর হাজার হাজার ইহুদী সৈন্যকে নির্যাতিত করেছিলেন। পোলাণ্ডের পতনের পরও তাঁর সেই মনোভাব বা নীতির পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। ফাসিস্ত মনোভাবাপন্ন বহু লোক তাঁর প্রবাসী সৈন্যদলে স্থান পায়। আশ্চর্যের বিষয়, সমস্ত জেনেশুনেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জেনারেল সস্নকোভ্স্কিকে এই পোলিশ বাহিনী গঠনে নানাভাবে সাহায্য করেন।

ঘটনার আবর্তন এমন ভাবে হয় যে, প্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্ট ও জেনারেল সস্নকোভ্স্কির সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। পোলাণ্ডে হিটলারের বাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং লাল ফৌজের সহায়তায় পোলাণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয়। জেনারেল সস্নকোভ্স্কির বাহিনীর পোলাণ্ডে গিয়ে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করবার সৌভাগ্য হয়নি;

তার আগেই পোলাণ্ডের মুক্তিসংগ্রাম শেষ হয়ে যায় এবং লুবলিন গবর্ণমেণ্ট পোলাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য মস্কোতে আলোচনার ফলে পোলাণ্ডের নতুন গবর্ণমেণ্টে লণ্ডনপ্রবাসী পোলিশ গবর্ণমেণ্টেরও কয়েকজন প্রতিনিধি গৃহীত হন; কিন্তু প্রবাসে থেকে পোলাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা দেশের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করবার যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। পোলাণ্ডের জনসাধারণ দেশের শাসনব্যাপারে অধিকার লাভ করে।



গ্রীস

জার্মান কবল থেকে ইওরোপ যেমন মুক্ত হতে থাকে তেমন বিভিন্ন দেশে গোলযোগও দেখা দেয়। এ গোলযোগ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। সুবিধেবাদীর দল জার্মান আওতায় থেকেও যুদ্ধের দরুণ প্রচুর মুনাফা করছিল; জার্মানরা চলে যাবার পরও তারা সেই ব্যক্তিগত মুনাফার পথটা প্রশস্তই রাখতে চায়। তা রাখতে গেলে পুঁজিতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা দরকার—আর প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে শাসনভার থাকলেই পুঁজিতন্ত্র নিরাপদ। সেইজন্যেই পুঁজিতন্ত্রের সমর্থক দল চায় জার্মান-কবলমুক্ত দেশসমূহে নিজেদের হাতে শাসনভার রাখতে—আর জনসাধারণ চায় সেই পুঁজিতান্ত্রিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি। অলসভাবে দিন কাটিয়ে এ মুক্তি জনসাধারণ চায়নি—এজন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। এর আগেই দেখানো হয়েছে যে, ইওরোপের দেশগুলি একে একে যখন জার্মান কবলে

যায় তখন সেইসব দেশের একদল লোক বিদেশে গিয়েএক একটি গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করে। তাদের বেশীর ভাগই স্থান পায় লণ্ডনে। তারা কায়েমী স্বার্থের সমর্থক। ইওরোপ উদ্ধার হ'লে আবার তারা দেশে গিয়ে জাঁকিয়ে বসবে এই ছিল তাদের আশা। বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশীল মহলেও তারা এই বলে খাতির পেলো যে, উত্তরকালে হয়তো তাদের ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করা চলবে। হয়েছেও তাই। দেশ জার্মান কবলিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যারা আপ্রাণ চেষ্টায় দেশের মুক্তির জন্যে লড়াই করে, যারা জার্মানদের প্রতিরোধ করে, যখন সত্যি মুক্তি আগত তখন সেই মুক্তি ফৌজকে, সেই জনসেনাকে উচ্ছেদ করে প্রতিক্রিয়াশীল দল চায় নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা রাখতে। জনসাধারণ তাদের এই অধিকার ছেড়ে দিতে নারাজ হয়। তাতেই বাধে জাগ্রত জনশক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। গ্রীসে যখন এইরূপ সংঘর্ষ বাধে তখন পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকগণ 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষার নামে গ্রীসের প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষকে সমর্থন করেন।

গ্রীসের এই সংঘর্ষ অকস্মাৎ বাধেনি। এর পেছনে ছিল এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এখানে সংক্ষেপে বলছি।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে লেবাননে এক মিলন বৈঠক বসে। তাতে বিদেশে গঠিত গ্রীক গবর্ণমেণ্ট এবং গ্রীসের জনযোদ্ধ্ দল—উভয় দিকেরই প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সেই বৈঠক সম্পর্কে তখন খবর প্রকাশিত হয় যে, জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে একটি নতুন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে এবং তা থেকে ই-এ-এম দল বাদ পড়েছে। সেই খবর পড়ে তখন মনে হয়েছিল যে, গ্রীসের রাজা জর্জই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।

কিন্তু এর দুমাস পরেই খবর এল যে, নতুন গ্রীক গবর্ণমেণ্টে ই-এ-এম দলের পাঁচ জন মন্ত্রী গৃহীত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে দু'জন কম্যুনিস্ট। বৃটিশ খবরে গোড়ার দিকে একথা একেবারেই চেপে যাওয়া হয়েছিল।

ই-এ-এম দলের লোককে গ্রীক মন্ত্রিসভায় সহজে নেওয়া হয়নি। এর জন্যে তাদের যথেষ্ট চাপ দিতে হয়েছিল। কিভাবে এই চাপ আসে নিম্নের ইতিহাস থেকেই তা বোঝা যাবে।

গ্রীসে প্রধানত তিনটি গেরিলা দল ছিল। প্রথম দল ই-এল-এ-এস (এলাস)। এই দলে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৪০ হাজার সুশিক্ষিত সশস্ত্র সৈন্য এবং এক লক্ষ রিজার্ভ সৈন্যের হিসাব পাওয়া যায়। অবশ্য রিজার্ভ সৈন্যদের অস্ত্রের অভাব ছিল। পরে এই দলের সশস্ত্র যোদ্ধৃসংখ্যা ৬০ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। এটাই হলো গ্রীক জাতীয় মুক্তি সংঘ ই-এ-এম (ইএম)এর সৈন্যদল। (**EAM—Ethnikon Apeleutherotikon Melepon-metopon,** ইংরেজীতে বলা যায়—**National Liberation Front—** অর্থাৎ জাতীয় মুক্তি সংঘ)। কৃষক দল, ইউনিয়ন অব পপুলার ডেমোক্রাসি, সমাজতন্ত্রী দল, কম্যুনিস্ট দল, উদারনৈতিক যুবসংঘ, বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান, সিভিল সার্ভেণ্টস ইউনিয়ন, রেলওয়ে শ্রমিক সংঘ এবং গ্রীসের বৃহত্তম শ্রমিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল কন্‌ফিডারেশন অব লেবার নিয়ে ইএম গঠিত। এই দলের সভ্য সংখ্যা গিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষে দাঁড়ায়।

গ্রীসের এই মুক্তিফৌজ বাইরে থেকে সাহায্য খুব কমই পায়। অস্ত্রশস্ত্রও তাদের খুব বেশি ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা আলবেনিয়ার সীমান্ত থেকে কোরিন্থ উপসাগর পর্যন্ত পিণ্ডাস পর্বতমালা, জেনিনার উত্তরে এপিরাস, পশ্চিম ম্যাসিডোনিয়া, পশ্চিম থেসালি, উত্তর পেলিপোনিজ প্রভৃতি ধরে এক বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে জার্মানদের বিতাড়িত করে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রীসে জার্মান অভিযান হবার পর মাস খানেকের মধ্যেই গ্রীসের সকল শ্রেণীর স্বদেশভক্তদের নিয়ে ইএম দল গঠিত হয় এবং ১৯৪২ খৃস্টাব্দে তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে

প্রবল বিক্রমে সংগ্রাম চালায়। এদেরই চেষ্টায় ১৯৪২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মঘটের ফলে এথেন্সের সমস্ত কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে। জার্মানদের যুদ্ধের কাজে নিয়োগের জন্যে গ্রীক শ্রমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যখন জার্মান কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক আইন জারী করেন তখন এদেরই চেষ্টায় ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয় এবং এথেন্সের রাস্তায় প্রায় আড়াই লক্ষ নরনারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে এই ব্যাপার ঘটে। এই ধর্মঘট ও বিক্ষোভের ফলে জার্মানরা সেই আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এর পর ঐ বছরই জুন ও জুলাই মাসে আবার ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। প্রায় তিন লক্ষ এথেন্সবাসী রাস্তার বেরয় এবং তাদের সঙ্গে নাৎসী ও বুলগারদের সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের মধ্যে প্রায় তিনশ' লোক নিহত এবং শ'খানেক আহত হয়।

জার্মানরা গ্রীস দখল ক'রে থাকলেও তাদের পৃষ্ঠদেশে এলাস দল ক্রমশই তাদের বিপন্ন ক'রে তুলতে থাকে। প্রধান প্রধান ঘাঁটি ছাড়া গ্রীসের আর প্রায় সর্বত্রই তাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তাদের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও জেলা কংগ্রেসে দেশ ছেয়ে যায় এবং এইভাবে তারা দেশের সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করে। তাতে তাদের সরবরাহের পথও প্রশস্ত হয়ে যায়।

এই গেল একটি। আর দুটি গেরিলা দলের নাম ই-কে-কে-এ (এক্কা) এবং ই-ডি-ই-এস (ইডেস)। এক্কার ছিল প্রায় হাজার খানেক লোক। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তাদের অধিকাংশ লোক এলাস দলে এসে যোগ দেয়। তারপর এই উভয় দলের মধ্যে বেশ সম্প্রীতির ভাব চলে।

তৃতীয় দল ইডেস রাজা জর্জের প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্টের সমর্থন

পায়। কর্নেল জারভাস নামে একজন উচ্চাভিলাষী এই দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডেস দলে বড় জোর তিন হাজার লোকের হিসেব পাওয়া যায়। কায়রো থেকে ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে সরকারীভাবেই বলা হয়েছিল ইডেসে হাজার দেড়েক লোক আছে। পরে অন্য সূত্রে খবর পাওয়া যায়, এই দলের সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার। কর্নেল জারভাসকে গ্রীসের 'মিহাইলোভিশ' বলা চলে। প্রবাসী গ্রীক গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ অনুযায়ী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁকে অস্ত্র পাঠিয়ে সাহায্য করেন এবং সেইজন্যেই তাঁর দলের অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হয়। নবচেতনাসম্পন্ন ইএম ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী এলাস দলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই কর্নেল জারভাসের প্রতিক্রিয়াশীল দল এই সাহায্য পায়। মিহাইলোভিশের মতো কর্নেল জারভাসও এই সব অস্ত্র পেয়ে নাৎসীপক্ষভুক্ত পুলিশ দলকে গ্রীসের তথাকথিত "শান্তি ও শৃঙ্খলা" বিধানে সাহায্য করতেন—তার অর্থই ইএম ও এলাস দলকে দমন এবং গ্রীসের মুক্তির জন্যে যে কোন গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা করা। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় লোক এত বিরক্ত হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে থেসালি, ক্যালসিডাইস এবং ইউবোইতে জনসাধারণ ইডেস দলের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দী করে এবং কর্নেল জারভাস তাঁর দৃঢ় ঘাঁটি ভাল্টোস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন; অথচ এই ঘাঁটিটি তিনি এক বছরেরও বেশি দখল ক'রে ছিলেন।

এখানে গ্রীসের রাজা জর্জের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে এক তথাকথিত গণভোটের প্রহসন ক'রে রাজা জর্জকে নির্বাসন থেকে গ্রীসে ফিরিয়ে আনা হয়। জাতির কাছে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করে তিনি দেশের শাসনভার ফাসিস্ত জেনারেল মেটাক্সাসের হাতে তুলে দিলেন। বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধবার পূর্ব পর্যন্ত

চার বছর ধরে জেনারেল মেটাক্সাস এবং রাজা জর্জ দু'জনে মিলে গ্রীসে শাসনের নামে কুশাসন চালালেন। গ্রীক পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হলো, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হলো, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দমন করা হলো, হাজার হাজার নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা, রাজনীতিক, অধ্যাপক, ছাত্র, শ্রমিক, সিভিল সার্ভেণ্ট, অফিসার, শিক্ষক গ্রেপ্তার হলেন—তাঁদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চললো—কতক মারা গেলেন—বাকী যাঁরা রইলেন তাঁদের এক দলকে পাঠানো হলো বন্দি-শিবিরে, আর একদলকে পাঠানো হলো ঈজিয়ান সাগরের ছোট ছোট দ্বীপে নির্বাসনে।

মেটাক্সাসের মৃত্যুর পর রাজা ঘোষণা করলেন যে, গ্রীসের শাসন মেটাক্সাস প্রবর্তিত পন্থায়ই চলবে। সুতরাং বুঝতে কিছু অসুবিধে হয় না যে, এই রাজা জর্জ যখন গ্রীসের পতনের পর বিদেশে গিয়ে গবর্ণমেণ্ট গঠন করলেন তখন তাঁর মন্ত্রিসভায় কারা স্থান পেলেন। মেটাক্সাসেরই সমর্থক লোকদের নিয়ে তিনি একটি গবর্ণমেণ্ট ফেঁদে বসলেন এই আশায় যে, সুদিন এলেই আবার তিনি গ্রীসে গিয়ে রাজতক্তে অধিষ্ঠান হবেন। এদিকে কিন্তু জনকয়েক প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী ছাড়া গ্রীসের আর সকলেই একমত হয়ে উঠলো যে, গণভোট না হওয়া পর্যন্ত রাজা আর গ্রীসে ফিরতে পারবেন না।

প্রথম দিকে রাজা জর্জের গবর্ণমেণ্ট গ্রীসের প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ১৯৪২ খৃস্টাব্দে এই আন্দোলন যখন গ্রীসের নগরে ও পল্লীতে প্রবল হয়ে উঠলো তখন গ্রীক গবর্ণমেণ্ট কিছুটা চকিত হলেন। পথ বেছে নিতে তাঁদের বেশি দেরি হলো না। গণশক্তি ইএমকে দমনের জন্যে তাঁরা কর্নেল জারভাসকে সমর্থন করলেন। তারপর তাঁরা মধ্য প্রাচ্যে এক গ্রীক বাহিনী গঠনে উদ্যোগী হলেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে নয়; যুদ্ধোত্তরকালে গ্রীসে 'শান্তি ও

শৃঙ্খলা' রক্ষাই ছিল এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। নামজাদা সব ফাসিস্ত-ঘেঁষা জেনারেলদের হাতে এই বাহিনীর সৈনাপত্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আরও স্থির হ'লো যে, ফাসিস্তবিরোধী যোদ্ধাদের কাছ থেকে এদের দূরে রাখা হবে।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের শরৎকালে এবং ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে নাৎসীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বহু গ্রীক মধ্য প্রাচ্যে পালিয়ে আসে। তারা এসে এই সৈন্যদলে যোগ দেয় এবং ভেতরে থেকেই দাবী তোলে যে, নামজাদা নাৎসীঘেঁষা অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হোক এবং গবর্ণমেণ্টকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠন করা হোক। ফল হ'লো বিপরীত। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে গণতন্ত্রের সমর্থক তিনজন নামকরা অফিসারকে সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত করা হলো। তার ফলে গ্রীক সৈন্যদলে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা প্রতিক্রিয়াশীল অফি-সারদের বন্দী করলো। গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহীদের কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হলেন; তাঁরা মেটাক্সাসী দলের প্রতিক্রীয়াশীল জেনারেলদের পদচ্যুত করলেন।

রাজা এই সময় দক্ষিণপন্থী উদারনৈতিক দলের কয়েকজনকে মন্ত্রি-সভায় স্থান দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাতে কেউ ভুললো না। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রীক সৈন্যদলে আর একবার বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সেই বিদ্রোহ আলেক-জান্দ্রিয়ায় গ্রীক নৌবাহিনীতে পর্যন্ত গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। 'শান্তি স্থাপনের' নামে বৃটিশ সৈন্যদল এগিয়ে এলো। বিদ্রোহীদলের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিরা মিশরে বন্দিশিবিরে প্রেরিত হলেন।

সৈন্যদলে এইরূপ ক্রমাগত গোলযোগ ও গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ-বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে রাজা জর্জ একটি মৌখিক আপোষের প্রস্তাব ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। ৪ঠা জুলাই তিনি

ঘোষণা করলেন, "সামরিক অবস্থা অনুকূল হ'লে ছ' মাসের মধ্যেই গণপরিষদের নির্বাচন হবে এবং গ্রীস মুক্ত হ'লে পর শাসনকার্য চালাবার জন্যে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে।"

এর অর্থ হ'ল এই যে, রাজা গ্রীসে ফিরে এলে পর এবং অবস্থা অনুকূল হ'লে গণপরিষদের নির্বাচন হবে। গ্রীসের গণনায়কগণের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝতে কোন কষ্ট হলো না। তার এক মাস বাদে ইএম দলের একদল প্রতিনিধি কায়রোতে এসে রাজার গবর্ণমেণ্টের কাছে দু'টি দাবী জানালেন। প্রথমত, গ্রীসে রাজার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে গণভোট গৃহীত হবার আগে যেন রাজা গ্রীসে না যান ; দ্বিতীয়ত, জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হোক। রাজা এই দুই দাবীর কোনোটিতেই কর্ণপাত না ক'রে স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাড়াতাড়ি কায়রো ছেড়ে লণ্ডনে চলে গেলেন। রাজার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে তখন ইএম এবং গ্রীসের প্রতিরোধ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চললো। গ্রীস থেকে গেরিলাযুদ্ধের যত খবর আসতো সেগুলিকে কায়রোতে চেপে যাওয়া হতো। বৃটিশ কতৃ‍র্পক্ষ এই ব্যাপারে প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়ালেন। একমাত্র বার্লিন বেতারে ইএম-এর বিরুদ্ধে যে সব প্রচারকার্য করা হতো—যেমন "গ্রীকরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে ;" "অত্যাচারের কাহিনী" প্রভৃতি এই ধরণের খবরগুলি গ্রীক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রচার করা হতো। বিশেষ সূত্রে প্রাপ্ত খবর ব'লে এগুলো তাঁরা চালাতেন।

এই সব চাল চালতে গিয়ে রাজা জর্জের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আরও খারাপই হলো। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে "স্বাধীন গ্রীসে" বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক দলের মিলনে একটি রাজনৈতিক জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটির সভাপতি হলেন এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। এই কমিটির পক্ষ থেকে এক্সিস শক্তির

বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম সমর্থন করে বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের কাছে এক বাণী প্রেরণ করা হলো এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রীক গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবীকে আরো জোর দিয়ে জানানো হলো।

এর পর ২৫শে মার্চ গ্রীক স্বাধীনতা দিবসে মিশরে স্থলসেনা ও নৌসেনার অফিসার ও সৈন্যরা এবং সওদাগরী জাহাজের লস্করগণ ও অন্যান্য গ্রীক মিলে আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো ও সৈয়দ বন্দরে এই দাবীতে মিছিলাদি করে যে, জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হোক এবং তাতে গ্রীসের রাজনৈতিক জাতীয় মুক্তি কমিটির উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হোক। ৩১শে মার্চ মধ্য প্রাচ্যের গ্রীক বাহিনীর একদল উচ্চপদস্থ অফিসার গ্রীক প্রধানমন্ত্রীর নিকট গিয়ে জানান যে, হয় এই দাবী তিনি মেনে নিন, আর তা না হ'লে তিনি পদত্যাগ করুন। প্রতিনিধিদের তখন গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়। তাতে আলেকজান্দ্রিয়া এবং কায়রোতে আবার বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে; তার ফলে গ্রীক প্রধানমন্ত্রী তখন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইএম-এর প্রতি যারা সহানুভূতি দেখায় গ্রীক কর্তৃপক্ষ তাদের সকলকে বরখাস্ত করেন। ফলে সমগ্র সশস্ত্র বাহিনী বেঁকে বসে এবং ৬ই এপ্রিল তারা ঘোষণা করে যে, তাদের সহকর্মীদের মুক্তি না দিলে এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রতিশ্রুতি না পেলে তারা কোন আদেশ পালন করবে না। রাজা জর্জ তখন তাড়াতাড়ি লণ্ডন থেকে কায়রোতে চলে আসেন এবং মধ্য প্রাচ্যের সমগ্র সশস্ত্র গ্রীক বাহিনীকে তিনি ভেঙ্গে দেন। ১১ই এপ্রিল এই ব্যাপার ঘটে। মধ্য প্রাচ্যের সশস্ত্র গ্রীক বাহিনীর প্রায় সমস্ত লোককেই বন্দী-শিবিরে পাঠানো হয়।

যুদ্ধোত্তরকালে নিরাপদে রাজ্য শাসন করবার উদ্দেশ্যে রাজা জর্জ মধ্য প্রাচ্যে যে গ্রীক সৈন্যদল গড়ে তোলেন এইভাবে তা ভেঙ্গে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধাবসানে একাধিপত্য লাভের স্বপ্নও তাঁর শূন্যে মিলিয়ে যায়। গ্রীসের জাতীয় ঐক্যের পথে যে প্রতিবন্ধক তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময় নানা স্থানে আরো গোলযোগ দেখা দেয়। ২০শে এপ্রিল ইংলণ্ডের গ্রীক নৌঘাঁটিতে গ্রীক নাবিকদের শতকরা প্রায় ৯৮ জন, ছোট অফিসারদের শতকরা প্রায় ৯৬ জন এবং বড় অফিসারদের শতকরা ৬০ জন "স্বাধীন গ্রীসে" জাতীয় মুক্তি কমিটি যে ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে সেই ঐক্যের ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী তোলে। এই চাপে পড়েই রাজা জর্জ ও তাঁর গবর্ণমেণ্ট মে মাসে লেবাননে "ঐক্য সম্মেলন" আহ্বান করতে বাধ্য হন। সেখানেও তাঁরা ইএমকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তাতে আর বেশিদিন চললো না। সেপ্টেম্বর মাসেই ইএম-এর পাঁচজন প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করতে হলো। সেই পাঁচজনের মধ্যে দু'জন ছিলেন কম্যুনিস্ট।

কিন্তু গ্রীসের প্রতিক্রীয়াশীল ব্যক্তিরা এই মিলনের পথে বেশি দূর এগুতে পারলেন না। তারা কর্নেল (পরে জেনারেল) জারভাসের সৈন্যদল ইডেসকে রেখে জনসেনা এলাসকে নিরস্ত্র করবার সিদ্ধান্ত করলেন। তাতেই গ্রীসে গোলযোগ বাধে।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রীসের কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে দিয়ে নিরাপদ মনে করলেন তাঁদের স্বরূপ গ্রীসের অশীতিপর উদারনৈতিক নেতা থেমেস্টোকল্‌স্ সোফোক্লিস একটি মাত্র কথায়ই প্রকাশ করে দেন। গ্রীসে গৃহযুদ্ধ বাধলে পর তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন :—

> "পাপান্দ্রো গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করবার অর্থ ই হলো ডিক্টেটর-তন্ত্রকে সমর্থন করা।"

এবার গ্রীসের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা যাক। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে মঃ পাপান্দ্রো কায়রোতে এক গ্রীক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তারপর সে বছর ১৮ই অক্টোবর তিনি এবং তাঁর অন্যান্য মন্ত্রী এথেন্সে এসে পৌছেন। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল স্কোবিকে তাঁরা তাঁদের পুরোভাগে নিয়ে আসেন। মঃ পাপান্দ্রোর গবর্ণমেণ্ট এথেন্সে এসেই এক বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়েন। মুদ্রা-বাহুল্যের দরুণ এথেন্সে দ্রব্যমূল্য অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সমগ্র গ্রীসে তখন মারাত্মক রকমের খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। প্রগতিশীল প্রতিরোধীদের সহায়তায় পাপান্দ্রো গবর্ণমেণ্ট মুনাফাখোর ও মজুতদারদের ধ'রে কঠোর শাস্তি দেওয়ায় সঙ্কটের খানিকটা আসান হলো। এদিকে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে খাদ্য এসে পৌছাল; খাদ্য-সঙ্কটও কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পেল। সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েই পাপান্দ্রো গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণপন্থীরা ইএম তথা এলাস দলের শক্তি কমাবার জন্যে এক চক্রান্ত করলেন। তাঁরা বললেন যে, গ্রীসে কোন বেসামরিক সৈন্যদল রাখা চলবে না; সুতরাং এলাস দলকে ভেঙ্গে দিতে হবে। ইএম নেতারা তাতে জানালেন যে, এলাস দলকে ভেঙ্গে দিতে কোন আপত্তি নেই যদি গ্রীসের সমস্ত গেরিলাদল ও বেসরকারী সৈন্যদলকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন একটি গ্রীক জাতীয় বাহিনী গঠন করা হয়; কিন্তু মঃ পাপান্দ্রো বললেন যে, মিশরে মিত্রপক্ষের তত্ত্বাবধানে যে গ্রীক 'মাউণ্ট ব্রিগেড' ও 'সেক্রেড ব্যাটেলিয়ন' গঠিত হয়েছে তা ভাঙ্গা হবে না। বলা বাহুল্য এই দুটি সৈন্যদলেরই অফিসাররা ছিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী। কাজেই ইএম নেতারা এই দুটি প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদলের অস্তিত্ব বজায় রেখে এলাস দলকে ভেঙ্গে দিতে রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, গ্রীসে এমন একটি জাতীয় বাহিনী গঠিত হওয়া উচিত যাকে সকল বামপন্থী দলই মেনে নিতে পারে।

কিন্তু মঃ পাপান্দ্রো তাতে সম্মত হলেন না। তিনি জেদ ধরলেন যে, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে এলাস দলকে অবশ্য ভেঙ্গে দিতে হবে। জেনারেল স্কোবি মঃ পাপান্দ্রোকেই সমর্থন ক'রে এক বিবৃতি দিলেন। ইএম নেতারা স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করছেন। মঃ পাপান্দ্রো আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে এক বিবৃতি দিয়ে বললেন যে,ইএম দল গ্রীসে গৃহযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টায় আছে।

আগেই বলেছি, নানা দলের সমন্বয়ে ইএম গঠিত হয়েছিল। গ্রীস জার্মান কবলে থাকাকালে অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি কমিটিরই ন্যায় ইএম দলও গ্রীসে সর্বদা ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে। কাজেই দেশে গৃহযুদ্ধ বাধাবার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবে একথা একমাত্র কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কিংবা বাতুলরাই বিশ্বাস করতে পারে। ইএম নেতারা ঐক্য রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী এলাসদের নিরস্ত্র ক'রে মঃ পাপান্দ্রোর সমর্থকগণ কেবল ইএমকে শক্তিহীন করবারই মতলবে আছেন তখন ইএম দলের মন্ত্রীরা মঃ পাপান্দ্রোর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর এথেন্সের কেন্দ্রস্থলে ইএম দল কন্‌স্টিটিউসন স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সভা আহবান করে। এই সভা করতে কর্তৃপক্ষ নিষেধ করেছিলেন। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই দলে দলে নরনারী এসে সভাস্থলে সমবেত হয়। সকাল বেলা অনুমান ১০ টায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলী চালায়। বিক্ষোভ-কারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল যুবকযুবতী। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় তাদের সঙ্গে যেসব শিশু ছিল তারাও পুলিশের গুলী থেকে অব্যাহতি পেলনা। এছাড়া আরও কয়েক স্থানে পুলিশের গুলী চলে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল গুলী চালানো হয়। গুলী চলার পরও অপরাহ্নে আবার

বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ইএম-এর হেডকোয়ার্টার্স থেকে ঘোষণা করা হয় যে, কন্‌স্টিটিউসন স্কোয়ারে গুলীতে ১৫ জন নিহত ও ১৪৮ জন আহত হয়েছে। এই ঘোষণার পর গ্রীক কম্যুনিস্ট পার্টি ৩রা ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে।

তারপর আরম্ভ হয় সরকার পক্ষ ও এলাসদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষ। জেনারেল স্কোবি এলাসদের এথেন্স ত্যাগ করে যেতে বলেন, কিন্তু এলাসরা তাতে কর্ণপাত করা দরকার বোধ করেনি ; কারণ তারা মনে করতো যে গ্রীসের এই গৃহযুদ্ধে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ করবার কোন দরকার নেই। কিন্তু গ্রীসের এই গোলযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিরপেক্ষ থাকা তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূল বলেই মনে করেন এবং তারই ফলে এথেন্সের রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশ ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানবোঝাই গাড়ী টহল দিতে আরম্ভ করে। শান্তিরক্ষার নামে বৃটিশ গোলন্দাজরা এলাসদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত বোধ করেনি। পাল্টা জবাবস্বরূপ এলাসরাও বৃটিশ ঘাঁটিতে হানা দিতে আরম্ভ করে এবং তার ফলে বৃটিশ বাহিনী ও এলাসদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই সংঘর্ষ বাধে।

গ্রীসের গৃহযুদ্ধে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করায় সাম্রাজ্য-বাদের আসল রূপটা অনেকখানি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তা নিয়ে ইংলণ্ডেও কোন কোন মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কমন্সসভায় শ্রমিক দলের কয়েকজন সদস্য বৃটিশ বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু মিঃ চার্চিল গোলযোগের সমস্ত দায়িত্ব গ্রীসের ইএম ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী এলাসদের ওপর চাপিয়ে বৃটিশ নীতি সমর্থন করেন এবং বলেন যে, শান্তিরক্ষার জন্যে এরকম দু'একটু বলপ্রয়োগ করা দরকার। আলোচনা গরম হ'লেও মিঃ চার্চিল কমন্সসভায় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পান এবং গ্রীস সম্পর্কে বৃটেনের পূর্ব নীতিই চলতে থাকে।

১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘর্ষ বেশ প্রবল ভাবেই চলে। গোড়ার দিকে

এলাসরা বৃটিশ পক্ষকে কাবু মন্দ করেছিল না ; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই এথেন্সে বৃটিশ পক্ষ তাদের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। এলাসরা ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়তে থাকে। ইএম দল থেকে তখন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করা হয়। ইতিমধ্যে মঃ পাপান্দ্রোর অনুরোধে গ্রীক উদার-নৈতিক নেতা জেনারেল নিকোলাওস প্লাস্তিরাস দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে এথেন্সে ফিরে আসেন। প্লাস্তিরাস ভেনিজেলোসের বন্ধু। ১৯২২ খৃস্টাব্দে তিনি গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। এগার বছর নির্বাসনে থাকার পর তিনি গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যেই সংঘর্ষের তীব্রতা অনেক কমে যায়। ইএম-এর নিকট যুদ্ধবিরতির যে সর্তাবলী দেওয়া হয় তাঁরা তার উত্তর ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল স্কোবির নিকট পেশ করেন। যখন এই যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলছিল তখন জেনারেল স্কোবি এথেন্সে এলাসদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান চালান। জেনারেল স্কোবির এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে এলাসরা খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে। ২৪শে ডিসেম্বর মিঃ চার্চিল ও মিঃ ইডেন এথেন্সে যান। সেখানে গ্রীক সরকারী দল ও ইএম দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে তাঁরা এক আলোচনা বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে গ্রীসের আর্কবিশপ দামাস্কিনোস সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে গ্রীসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়।

তারপর আর্কবিশপ দামাস্কিনোস গ্রীসে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। পাপান্দ্রো মন্ত্রিসভা তখন পদত্যাগ করেন। আর্কবিশপ এক আবেদনে গ্রীক জাতিকে বিবাদ-বিসম্বাদ বিসর্জন দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী রাজপ্রতিনিধি আর্কবিশপের অনুরোধে জেনারেল প্লাস্তিরাস এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তারপর আবার যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলে এবং ১১ই জানুয়ারী এলাসদের প্রতিনিধি ও স্কোবির মধ্যে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এথেন্স থেকে তখন এলাসরা গ্রীসের অভ্যন্তরে গিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং অনেক জায়গায় যুদ্ধে তারা প্রতিপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতিও করছিল। কিন্তু যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সংগ্রামে বিরত হয় এবং চুক্তিতে তাদের জন্য যেসব এলাকা নির্দিষ্ট হয়েছিল সেই সমস্ত এলাকায় তারা চলে যায়।

এলাসরা চুক্তি মেনে চললেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষিত গ্রীক প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্ট এলাস সমর্থকদের ওপর জুলুম করেই চলেছে। একদিন যারা সর্বস্ব পণ করে বুকের রক্ত দিয়ে গ্রীসকে বিদেশী ফাসিস্ত ও নাৎসী বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করেছিল তাদের অনেকে আজ কারাগারে পচে মরছে। এলাস সমর্থক হাজার হাজার গ্রীককে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাখা হয়েছে। যে গ্রীসে নব গণতন্ত্রের প্রবর্তন হতে চলেছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের ফলে সেই গ্রীসে কার্যত ফাসিস্ততন্ত্রের রাজত্ব চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে এ এক বিষম কলঙ্ক।

ইতালী

প্রতিরোধ সংগ্রামে উত্তর ইতালী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেনি। অল্পকালের মধ্যে গেরিলা বাহিনীর এরূপ বিস্ময়কর অভ্যুত্থান এবং সাফল্য আর কোথাও দেখা যায়নি।

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে মিত্রসেনা ইতালীতে ব্যাপক অভিযান শুরু করে এবং জার্মান ব্যূহ ভেদ করে পো নদীর তীরে গিয়ে উপনীত হয়। ২৫শে এপ্রিল উত্তর ইতালীতে জনযোদ্ধারা

জার্মানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই সময় ইতালীয় গবর্ণমেণ্টে জার্মান অধিকৃত ইতালীয় এলাকায় নাৎসীবিরোধী কার্যাদি তত্ত্বাবধানের ভার ছিল কম্যুনিস্ট মন্ত্রী সিনর মোরো স্কোক্সিমারোর ওপর। উত্তর ইতালীতে বিদ্রোহের জন্যে তিনি আবেদন জানাবার পরই এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। তিন দিনের মধ্যে তুরিন, মিলান, জেনোয়া এবং ভেনিস্—উত্তর ইতালীর এই সব শিল্পপ্রধান শহর ও বন্দর জার্মানদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়। লম্বার্ডি ও পাইডমণ্ট প্রদেশ দুটিও বিদ্রোহী জনসেনা দখল করে। কেবল তাই নয়, সিনর মুসোলিনী এবং তাঁর তেরজন অন্তরঙ্গ ফাসিস্ত বন্ধুকে উত্তর ইতালীর জনযোদ্ধারা গ্রেপ্তার করে এবং অবিলম্বে বিচার করে তাঁদের গুলী করে হত্যা করে। এই ব্যাপারে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়। দেরি করলে মুসোলিনী ও তাঁর বন্ধুদের সম্বন্ধে কোনরূপ দুর্বলতা আসে এই ভয়ে তারা কালবিলম্ব না করেই তাদের চরম শাস্তি দেয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের তরফ থেকে যেভাবে কালহরণ করা হয় তাতে ইতালীয় জনসেনার এইরূপ একটা সন্দেহ হওয়া কিছু অমূলক ছিল না। শাস্তি না দিয়ে মুসোলিনীকে আটক করে রাখলে হয়তো তাঁর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হতো এবং তাকে সূত্র ক'রেই অবশিষ্ট ফাসিস্তরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতো। যুদ্ধাপরাধীদের সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের যে তেমন কড়া মনোভাব নেই নাৎসী নেতা হেস ও গোয়েরিং-এর ব্যাপারে তাদের গড়িমসি ভাবেই তা বোঝা গিয়েছিল। তাছাড়া প্রথমবারে বন্দী অবস্থা থেকে মুসোলিনীর উদ্ধার পাওয়াও কম বিস্ময়কর নয়। অন্য কেউ হ'লে স্বতন্ত্র কথা ছিল, মুসোলিনীর মতো প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার পর কেন অতটা অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। সেই জন্যেই বোধ হয় মুসোলিনী দ্বিতীয়বার ধরা

পড়বার পর ইতালীর জনযোদ্ধারা তাঁর বিচার করে তাঁকে শাস্তি দিতে কালবিলম্ব করেনি।

উত্তর ইতালীতে জনগণ যে বিদ্রোহ করে তার সঙ্গে ইতালীর নবগঠিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের যোগাযোগ ছিল; বিশেষ ভাবে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিরা এই গণবিদ্রোহে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। উত্তর ইতালীতে গোড়া থেকেই শ্রমিক আন্দোলন প্রবল ছিল; সুতরাং ফাসিস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় মুসোলিনী উত্তর ইতালীতেই শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন বেশি। সেই কারণে উত্তর ইতালীর লোক মুসোলিনী ও ফাসিস্ত দলের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিল এবং তা ছিল বলেই প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্রই তারা অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। মুসোলিনীকে সেই অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণেরই হাতে প্রাণ হারাতে হয়। বলা বাহুল্য, শ্রমিক আন্দোলন প্রবল ছিল বলেই উত্তর ইতালীতে জনযুদ্ধ এতটা প্রবল হয়ে উঠতে পেরেছিল।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইতালীতে যখন মন্ত্রিসঙ্কট দেখা দেয় কম্যুনিস্ট মন্ত্রিরা তখন পদত্যাগ না করে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে থেকে যান। সহকারী প্রধান মন্ত্রী, অর্থসচিব এবং জার্মান অধিকৃত এলাকায় প্রতিরোধ-আন্দোলন তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তর ছিল কম্যুনিস্টদের হাতে। শেষোক্ত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন সিনর স্কোক্সিমারো। তাঁরই পরামর্শে ও নির্দেশে উত্তর ইতালীতে প্রতিরোধ-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। উত্তর ইতালীতে পাঁচটি দলের সমন্বয়ে যে মুক্তি কমিটি গঠিত হয় তার পূর্ণ কর্তৃত্ব মেনে নিতে ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন; কিন্তু সিনর স্কোক্সিমারোর অনুরোধে অবশেষে ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট তা স্বীকার করে নেন এবং গেরিলাদলের অফিসারদের পূর্ণ সামরিক মর্যাদা দানে সম্মত হন। উত্তর

ইতালীতে এই মুক্তি কমিটিরই অধীনে গেরিলা-আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

পাইডমণ্ট ও লম্বার্ডি উদ্ধারের পর এই কমিটি উত্তর ইতালীর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে পরিণত হয়। তাতে 'অ্যাক্‌শন পার্টি' বা কর্ম পরিষদের ফেরাক্কিও এবং কম্যুনিস্ট নেতা লুইগি লংগোও ছিলেন। লুইগি লংগো ইতালীয় গ্যারিবল্ডি ব্রিগেডের একজন নেতা। উক্ত ব্রিগেড স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে সেখানকার রিপাব্লিকান পক্ষে যোগ দিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

উত্তর ইতালীতে ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ সফল হওয়ায় সমগ্র ইতালীর রাজনৈতিক জীবনে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। উত্তর ইতালী সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আগাগোড়াই অত্যন্ত ভয় ছিল। বিদ্রোহ সফল হবার মাস তিনেক আগে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ভীতকণ্ঠে বলেছিলেন যে, উত্তর ইতালীতে বহু লোকের বাস এবং তাদের মধ্যে সব মারাত্মক রাজনীতিক রয়েচে; সুতরাং উত্তর ইতালী মুক্ত হ'লে কি হবে বলা যায় না। মিঃ চার্চিলের এই বক্তৃতার পর ইতালীতে মিত্রপক্ষের সামরিক কর্তৃপক্ষও একই মনোভাবের পরিচয়ে দেন। উত্তর ইতালীর মুক্তি কমিটীর কর্তৃত্বকে যখন ইতালীয় গবর্ণমেণ্ট মেনে নেন তখন ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি তোলেন। তাঁরা উক্ত কমিটীকে মেনে নিতে অরাজী হন। লণ্ডন থেকে রয়টার তখন তাদের চিবাচরিত প্রথায় 'লাল জুজুর' ভয় দেখিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করে। তারা টিপ্পনী কেটে বলে যে, মস্কো থেকে অনুপ্রাণিত তোগলিয়াত্তির রাজনীতি উত্তর ইতালীর গণ-আন্দোলনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে কিনা ইতালীর রাজনৈতিক জীবন এখন তারই প্রতীক্ষায় আছে।

অবশ্য একথা সত্য যে মুসোলিনীর পতনের পর ইতালীতে

কম্যুনিস্ট পার্টিই ক্রমশ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরোভাগে চলে আসে। উত্তর ইতালীতে কম্যুনিস্ট পার্টিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ; কিন্তু উত্তর ইতালীকে ছেড়ে দিলেও ইতালীর অন্যান্য অংশে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের মে মাসের মধ্যেই কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা এসে দাঁড়ায় প্রায় তিন লক্ষের কাছাকাছি। এছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল যুব আন্দোলনের সভ্যসংখ্যাও প্রায় ৮৫ হাজার। এক উত্তর ইতালীতেই কম্যুনিস্টরা ১৫০টি গ্যারিবল্ডি ব্রিগেড গড়ে তোলে। পরে সেইগুলিকে 'ইউনাইটেড পার্টিজান আর্মি' অর্থাৎ সম্মিলিত গণসেনার অন্তর্ভূ'ত করা হয়। তাদেরই ৫২ নম্বর কম্যুনিস্ট গ্যারিবল্ডি ব্রিগেডের হাতে মুসোলিনী ধরা পড়ে নিহত হন। উক্ত ব্রিগেডের অধিনায়ক হলেন কর্নেল মস্‌কাটেলি।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইতালীর মন্ত্রিসভার দক্ষিণপন্থীরা যখন নানারকম ফিকিরফন্দী করে বামপন্থীদের সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তখন তাঁদের সেই চক্রান্তে ভুল করে ইতালীর সমাজতন্ত্রীরা এবং 'অ্যাক্সন পার্টির' নেতৃগণ মন্ত্রিসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি সেই ভুল করলো না ; তারা মন্ত্রিসভার ভেতরে থেকেই নিজেদের কাজ করে যেতে লাগলো। ফলে দক্ষিণপন্থীদের ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে থেকে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিরা গণতান্ত্রিক শক্তিকে আরো বাড়িয়ে তুললেন। শ্রমিক আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলো এবং বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পেল।

কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমশ বেড়ে চললেও তারা একথা বুঝতে পারলো যে, সেই অবস্থায় একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টির সাধ্য নেই যে তারা ইতালীকে পুনর্গঠিত করে তোলে ; দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলেরও সাহায্য প্রয়োজন। তাই তারা কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের যুক্ত নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে

তুলতে প্রয়াসী হলো। তারা জানতো শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে না পারলে দেশকে যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা যাবে না।

যুক্ত নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দেখতে দেখতে শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীর মধ্যভাগেই ট্রেড ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা গিয়ে প্রায় ১৩ লক্ষে পৌছাল। উত্তর ইতালীর শিল্পপ্রধান শহর ও বন্দরগুলি মুক্ত হবার পর এই সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যায়। সেখানে জনসেনা আকস্মিক ভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্রোহকে সফল করে তোলে যে জার্মানরা আর কলকারখানাগুলি ধ্বংস করবারও সময় পায়নি। আটুট অবস্থায়ই সমস্ত কলকারখানা ইতালীয় জনসেনার হাতে পড়ে। নাৎসী-কবলিত অন্যান্য দেশের তুলনায় উত্তর ইতালীতে ধ্বংস কম হয়েছিল বলেই তাড়াতাড়ি সেখানে পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় এবং তা দেখতে দেখতে এগিয়েও যায়। অর্থনৈতিক ভিত্তি সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই সুদৃঢ় হয়।

ইতালীর জননায়ক

পামিরো তোগলিয়াত্তির নাম আগেই উল্লেখ করেছি। দেশবিদেশে ইতালীর এই জননায়ক আর্কলি নামে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে মার্চ জেনোয়ায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়েসেই তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু জীবনে তিনি কখনো আইন-ব্যবসা করেননি। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি ইতালীর সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। তারপর ১৯২০ খৃস্টাব্দে তিনি ইতালীর কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং সেই থেকে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতেই আছেন।

আর্কলি অল্প বয়েসেই বিদ্বান হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা সর্বত্র সুবিদিত। তিনি রাজনীতি সম্পর্কে বহু বই লিখেছেন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, রাজনীতি নিয়ে লিখলেও তাঁর বইগুলি সাহিত্য হয়ে ওঠে। তিনি বহু ভাষাবিদ্, রুশ-ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন এবং রুশ সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দখল আছে। ফরাসী ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মতো জ্ঞানী ব্যক্তি ইওরোপে বোধ হয় খুব কমই আছে। বলা বাহুল্য, ল্যাটিন ভাষাভাষী দেশগুলির ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। ফরাসী পত্রিকা 'ল্যুমানিতে'র খ্যাতনামা সম্পাদক ভেলাস্ত কোতারিয়ের একদিন আর্কলির ফরাসী ভাষায় লেখা একটি প্রবন্ধ দেখে বলেছিলেন, "আপনি ফরাসী ভাষায় চমৎকার লিখতে পারেন দেখছি।" স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আর্কলি সেখানে স্পেনীয় ভাষায় জনসভায় দিব্যি বক্তৃতা করতেন। তিনি এমন সহজ ভাষায় বক্তৃতা করতেন যে, স্পেনের জনসাধারণের তা বুঝ্‌তে কোনরূপ কষ্ট হতো না। আর্কলি জার্মান ভাষায়ও ভালো বলতে ও লিখতে পারেন।

১৯২২ খৃস্টাব্দে রোমে মুসোলিনীর ফাসিস্ত অনুচরবৃন্দের হাতে আর্কলি গ্রেপ্তার হন। তারা তাঁর বুকের কাছে বন্দুক তুলে খবর বার করবার চেষ্টা করে, কিন্তু আর্কলি কিছু বলতে অস্বীকৃত হন। ফাসিস্তরা বুঝতে পারে যে তাঁর কাছ থেকে কোন খবর আদায় করা সম্ভব হবে না ; তাই তারা তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। প্রহারের ফলে তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হয়ে যায় ; অচৈতন্য অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে থাকেন। ফাসিস্তরা ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে—তাই তাঁকে ফেলে রেখে তারা চলে যায়। সৌভাগ্যক্রমে আর্কলি সেই অবস্থা থেকে কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পান ও ভালো হয়ে ওঠেন।

জন্মভূমি ইতালীর বাইরে বাইশ বছর তাঁকে নির্বাসনে জীবন যাপন করতে হয় ; কিন্তু নির্বাসনে থেকেও তিনি ইতালীর কম্যুনিস্ট

পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী রূপে সেখানকার কম্যুনিস্ট আন্দোলন পরিচালিত করেন। অনেকে বলেন, নির্বাসনের সময় আর্কলি মস্কোতে আঠারো বছর কাটিয়েছেন। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। প্রায় ন'বছর তিনি প্যারিসে কাটান। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় তিনি দু'বছর স্পেনে ছিলেন। বাকী সময়টা তিনি মধ্য ইওরোপের নানা দেশে ঘুরে বেড়ান। সেই সময় তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেও সফর করেন। সব শুদ্ধ তিনি মস্কোতে হয়তো ছ' সাত বছর কাটিয়ে থাকতে পারেন।

আর্কলির রাজনৈতিক জ্ঞান অসাধারণ। জর্জ ডিমিট্রফের সঙ্গে তিনিও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তাঁর ওপর ছিল।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দে কম্যুনিস্টদের যে বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর কর্মপন্থা নিরূপণের ভার আর্কলির এবং ডিমিট্রফের ওপর পড়ে। ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামচালনার জন্যে বিভিন্ন দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ কববার প্রণালী প্রণয়ন করেন ডিমিট্রফ এবং শ্রমিক আন্দোলনের দ্বারা কি ভাবে বিশ্বসংগ্রামকে রোধ করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করেন আর্কলি। স্পেনে রিপাব্লিকান বাহিনীর সমর্থনে সমগ্র বিশ্বের লোক নিয়ে যে স্বাধীনতাকামী বাহিনী গঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে আর্কলি তাঁদের নিয়ে স্পেনে যান। স্পেনের গৃহযুদ্ধ এক মস্ত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর ইওরোপের জনগণ যে মুক্তিসংগ্রাম শুরু করে স্পেনের গৃহযুদ্ধ তার একটি প্রধান অধ্যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক পরীক্ষাস্থল ছিল স্পেনেব গৃহযুদ্ধ। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা বিবেচনা করে স্পেনে আর্কলির উপব অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়েছিল। সেখানে মার্শাল তিতো, ফরাসী ডেপুটি ও 'কৃষ্ণ সাগরের বীর' বলে খ্যাত আঁদ্রে মার্তি, আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের

ইন্সপেক্টর জেনারেল লুইগি লংগো, জোস দিয়াজ, লা পাসিওনারিয়া, মার্শাল জুকফ প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর সহকর্মী ছিলেন।

অনেকেরই জানা নেই যে স্পেনে ফাসিস্তবিরোধী কত ইতালীয় ছিল এবং ইতালীর গ্যারিবল্ডি ব্রিগেড সেখানে ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে কিরূপ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিল। আর্কলির মতো নেতা ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের শেষ দিকে আর্কলি মাদ্রিদে ফাসিস্তদের হাতে বন্দী হন। বন্দীশালায় প্রত্যহই তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকতেন। কিন্তু একদিন দেখা গেল, রিপাব্লিকান পক্ষের একদল সৈন্য কতকগুলি ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে সেই বন্দীশালা ঘিরে ফেললো। তারা আর্কলিকে মুক্ত করে নিয়ে চলে গেল। আর্কলি ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে স্পেনের নেতা নেগ্রিনের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং পরে আবার স্পেনের যেখানে তখনো পর্যন্ত প্রতিরোধ-আন্দোলন চলেছিল সেখানে চলে এলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করলেন; কিন্তু জয়ের আর কোন আশাই যখন রইলো না তখন অল্প কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তিনি একটি বিমানক্ষেত্র দখল করলেন এবং তিনখানি বিমান নিয়ে মস্কোতে চলে গেলেন।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর আবার যখন ইওরোপে এক মহা-সমরের অনল জ্বলে উঠলো তখন আর্কলি ছিলেন প্যারিসে। তিনি গ্রেপ্তার হলেন। নির্মমভাবে তাঁকে প্রহার করা হলো। নাৎসীরা ফ্রান্স আক্রমণ করবার কয়েক সপ্তাহ আগেও তিনি প্যারিসের কারাগারেই আবদ্ধ ছিলেন। তারপর কি করে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন তার কাহিনী আজো পর্যন্ত অপ্রকাশই রয়ে গেছে।

বাইশ বছর পরে আর্কলি ইতালীতে ফিরে আসেন এবং মুক্ত ইতালীর জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসোলিনীর পতনের পর

ইতালীতে যে নতুন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় আর্কলি তাতে মন্ত্রীরূপে যোগ দেন। আর্কলির মতো নেতাকে পেয়েই হয়তো নব্য ইতালীর গণতান্ত্রিক স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

এখানে নব্য ইতালীর আর একজন জননায়কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই এই অধ্যায় শেষ করবো। তাঁর নাম গিউসেপ। বয়েস তার পঞ্চাশের কাছাকাছি। দক্ষিণ ইতালীর এক চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম। গিউসেপ্‌কে ইতালীর বাইরে লোকে মারিও নিকোলেত্তি নামেই বেশী চেনে। এক সময় মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং মুসোলিনী ও হিটলার তাঁকে ভালোভাবেই জানতেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে রিপাব্‌লিকান পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্যে ইতালীর যারা প্রথম স্বেচ্ছাসৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন নিকোলেত্তি ছিলেন তাঁদেরই একজন। গ্যারিবল্ডি ব্রিগেডে তিনি রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। মাদ্রিদরক্ষার আয়োজনেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ফ্রান্সে যান এবং সেখানে গিয়ে ফাসিস্তবিরোধী পত্রিকা "দি ইতালিয়ান্স ভয়েস"এর সম্পাদনা করেন। তারপর আসে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম। ফরাসী পঞ্চম বাহিনীর লোক তাঁর পিছনে লাগে। তিনি তখন আত্মগোপন করেন। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে হিমলারের জার্মান গোয়েন্দারা নিকোলেত্তিকে প্যারিসে গ্রেপ্তার করে এবং ইতালীয় গোয়েন্দাদের হাতে তাঁকে তুলে দেয়। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। অবশেষে মুসোলিনীর পতন ও ইতালীতে ফাসিস্ত-শাসনের অবসান হওয়ায় নিকোলেত্তি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান। ইতালীর কিষাণরা নেতাকে আবার তাদের মধ্যে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বাদোলিও গবর্ণমেণ্ট তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন। নিকোলেত্তির নেতৃত্বেই উত্তর ইতালীর কারখানার শ্রমিকগণ এবং

দক্ষিণ ইতালীর ভূমিহীন কিষাণ শ্রমিকগণের মধ্যে স্থায়ী মিলনের সূত্র স্থাপিত হয়।

১৯২১ খৃস্টাব্দে নিকোলেত্তি ফাসিস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ইতালীর জনগণকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি একজন আজীবন যোদ্ধা এবং একনিষ্ঠ কম্যুনিস্ট। তিনি সুবক্তা ও মিষ্টভাষী। তাঁর বাগ্মীতায় লোক বিস্মিত হয় এবং অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। ইতালীর জনগণের ওপর তাঁর অসামান্য প্রভাব।

এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়া

ইওরোপে বল্টিক সাগর তীরে এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং লাটভিয়া নামে তিনটি ছোট রাষ্ট্র আছে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে এই রাষ্ট্র তিনটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূর্ত হয়। তারপর জার্মান বাহিনী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অভিযান চালালে অল্পদিনের মধ্যেই এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তিনটি হিটলারের কবলে যায়। দেশ পরাধীন হ'লেও সেখানকার জনসাধারণের প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মরে গেলনা। জার্মান বাহিনী যখন সোভিয়েট ভূমিতে ক্রমাগত পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন সেই সব দেশের লোক পেছনে থেকে গেরিলাযুদ্ধ চালায় এবং তার ফলে জার্মানদের যথেষ্ট অসুবিধে হয়। বিশেষভাবে লেনিনগ্রাডে জার্মানদের সরবরাহ পাঠাবার পথ ছিল সেই সব দেশের মধ্য দিয়ে। কাজেই সেই সব দেশের গেরিলাদের আক্রমণে জার্মান সরবরাহের খুবই অসুবিধে হতো। এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় এই গেরিলা-আন্দোলনের প্রাবল্য

ছিল। সেই দুই দেশের জনসাধারণ কিভাবে জার্মানদের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধ চালায় এখানে সংক্ষেপে তাই বলবো।

গোড়ার দিকে এস্তোনিয়ায় গেরিলাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে এস্তোনিয়ার গেরিলাদের সংখ্যা গিয়ে কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। তারা বাইশটি সৈন্য বোঝাই জার্মান ট্রেণ লাইনচ্যুত করে, পাঁচটি রেলওয়ে সেতু উড়িয়ে দেয়, মাইন পেতে ৯৬টি মোটরযান ধ্বংস করে, পনের শত ফাসিস্ত সৈন্য ও অফিসার এবং জার্মানদের তাঁবেদার চারশ' এস্তোনিয়াবাসীকে হত্যা করে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় এস্তোনিয়ার গেরিলাদলেও সকল শ্রেণীর লোকই এসে যোগ দেয়। প্রথম দিকে তারাও বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল। প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের দেশের সমস্ত ব্যবস্থা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল যে, বিভিন্ন অংশের গেরিলাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা গোড়ায় সম্ভব হয়নি। ক্রমশ তারা সংঘবদ্ধ হতে লাগলো এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তারা একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীরূপে গড়ে উঠলো। গেরিলাযোদ্ধারা দেশের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করলো এবং তাতেই তাদের শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। 'তাজভিয়া' নামে তাদের একখানি গুপ্ত পত্রিকাও বেরুত।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে এবং ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে এস্তোনিয়ায় জনযুদ্ধের তীব্রতা অপ্রত্যাশিত রূপে বেড়ে যায়। সেই সময় সোভিয়েট লালফৌজ এবং তাদের সহিত সংশ্লিষ্ট এস্তোনিয়ার জাতীয় বাহিনী সর্বপ্রথম এস্তোনিয়ার কারোতাম অঞ্চল মুক্ত করে। তাতেই এস্তোনিয়ার গেরিলারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং দেশের অভ্যন্তরে তারা নবোদ্যমে আক্রমণ শুরু করে। সোভিয়েট লালফৌজও তখন এস্তোনিয়ার গেরিলাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করতে থাকে।

জার্মানরা এস্তোনিয়ার প্রতিরোধ-আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করতে গিয়েও ব্যর্থকাম হয়। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এস্তোনিয়ার শত্রু-অধিকৃত এগারটি জেলার মধ্যে নয়টি জেলায়ই গেরিলারা অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্ব-এস্তোনিয়ায় গেরিলাদের আক্রমণে জার্মানরা এতই বিব্রত হয়ে পড়ে যে, তারা শ' শ' এস্তোনিয়া-বাসীকে গুলী ক'রে হত্যা করে এবং অনেক গ্রাম ছারখার করে দেয়। ক্রোধান্ধ ফাসিস্তরা বিমান ও ট্যাঙ্ক চালিয়ে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে এবং নানাভাবে অত্যাচার চালায়; কিন্তু শত অত্যাচার ক'রেও তারা এস্তোনিয়ার মুক্তি-সংগ্রামকে দাবিয়ে দিতে পারেনি। বরঞ্চ পৃষ্ঠদেশরক্ষা ও সরবরাহপথে নিরাপত্তার জন্যে জার্মান বাহিনীর কয়েকটি ডিভিসনকে সোভিয়েট রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে এনে এস্তোনিয়ার গেরিলাদের বিরুদ্ধে মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। শেষের দিকে জার্মানরা যখন এস্তোনিয়ার লোকদের দাস-শ্রমিক রূপে খাটাবার জন্যে ধরে ধরে জোর ক'রে জার্মানীতে পাঠাতে থাকে এবং এস্তোনিয়ার ধনদৌলত ও বিষয়সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করে তখন তাতে বাধা দেবার জন্যে এস্তোনিয়ার গেরিলারা প্রাণপণ সংগ্রাম চালায়। একদল গেরিলা একদিন খবর পেল যে, জার্মানরা জাহাজে ক'রে বহু এস্তোনিয়ান কৃষককে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। খবর পেয়ে যেসকল ঘোড়ার গাড়ীতে করে কৃষকদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেগুলো গেরিলারা আক্রমণ করলো। তাদের চেষ্টায় সাতশ' এস্তোনিয়ান উদ্ধার পেল। সেই সব লোককে তিনদিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রেখে একখানি মাল-গাড়ীতে করে এস্তোনিয়ার মুক্ত এলাকায় তারা পাঠিয়ে দিল। বলা বাহুল্য, সেই সব কৃষককে জার্মানরা বিনা পাহারায় নিয়ে যাচ্ছিল না; তাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী দল ছিল এবং তাদের সহিত উদ্ধারকারী গেরিলাদের দস্তুর মতো লড়াই করতে হয়েছিল।

এস্তোনিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে হয়তো এরূপ বীরত্বের কাহিনী আরো অনেক রয়েচে যা আজো জানতে পারা যায়নি। কাল-ক্রমে হয়তো সেই সব চমকপ্রদ কাহিনী প্রকাশ পাবে এবং তা জগদ্বাসীকে বিস্মিত করে দেবে।

এবার লিথুয়ানিয়ার প্রতিরোধ-সংগ্রাম সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমেই বলা দরকার যে, লিথুয়ানিয়ায় জার্মানরা প্রবেশ করেই সেখানকার গেরিলাদের অস্তিত্বের কথা টের পেয়েছিল; কারণ লিথুয়ানিয়া অধিকারে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই দু'এক স্থানে জার্মান সৈন্যদের চোরা গুলী খেতে হয়েছিল। তখনই জার্মানরা বুঝতে পেরেছিল যে, লিথুয়ানিয়ার সরকারী বাহিনী লালফৌজের সঙ্গে পশ্চাৎ দিকে সরে গেলেও লিথুয়ানিয়ায় গুপ্তভাবে একদল সশস্ত্র যোদ্ধা অবস্থান করছে। এটা টের পেয়ে জার্মানরাও গোড়া থেকেই লিথুয়ানিয়া-বাসীদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করে। লিথুয়ানিয়ার প্রাচীন রাজধানী ভিল্‌নো শহরে প্রায় এক লক্ষ লোক জার্মানদের হাতে নিহত হয়। এ ছাড়া জার্মানরা কাউনাস শহরে পঁয়ত্রিশ হাজার, উকমার্গা শহরে বার হাজার এবং ক্রাকাস্‌ শহরে এগার হাজার লিথুয়ানিয়ানকে গুলী ক'রে হত্যা করে। তা ছাড়া লিথুয়ানিয়ার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে শতসহস্র লোককে জার্মানরা হত্যা ও পীড়ন করে। সেগুলির হিসেব হয়তো ভবিষ্যতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। হত্যা ও পীড়ন তো ছিলই, তদুপরি হাজার হাজার লিথুয়ানিয়ানকে দাস-শ্রমিক রূপে খাটাবার জন্যে জার্মানীতে পাঠানো হয়েছিল। লিথুয়ানিয়ার শহর-গুলির সমস্ত ভালো বাড়ী জার্মানরা দখল করে নেয়। যেসব ভাল জমি ছিল সেই সব জমিতে জার্মানদের এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। এ ভাবে প্রায় ত্রিশ হাজার জার্মান লিথুয়ানিয়ায় এসে বসত করতে থাকে। এই হিসেব অবশ্য জার্মানদেরই দেওয়া; কার্যত তাদের সংখ্যা হয়তো আরো

বেশিই ছিল। জার্মানরা পঙ্গপালের মতো লিথুয়ানিয়ায় চলে আসতে থাকে এবং যা পায় তাই তারা আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করে। লিথুয়ানিয়ার বহু মূল্যবান সামগ্রী জার্মানীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ভালো কলকারখানাগুলি তো জার্মানরা স্থানান্তরিত করেই, এমন কি ভিল্‌নো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিগুলি পর্যন্ত তারা জার্মানীতে পাঠিয়ে দেয়। দাস হবার ভয়ে লিথুয়ানিয়ার শিক্ষিত ও কর্মঠ যুবকযুবতীরা লোকালয় ছেড়ে বনজঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। অত্যাচারের ভয়ে অনেক গ্রামবাসীও বাড়ীঘর ছেড়ে জনবিরল এলাকায় নাৎসীদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। বলা বাহুল্য, এদের মধ্য থেকেই লিথুয়ানিয়ার জনসেনার সৃষ্টি হয়।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে নাৎসীদের পত্রিকাগুলিতেই স্বীকার করা হয় যে লিথুয়ানিয়ার শ' শ' জায়গায় জনসেনা লড়াই করছে। সেই বছরের শেষভাগে লিথুয়ানিয়ার দু'শ' কুড়িটি জায়গায় জনসেনার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। লিথুয়ানিয়ার সবচেয়ে যেটি বড় গেরিলা দল ছিল তারা ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের শেষার্ধে জার্মানদের ছাপ্পান্নটি সামরিক ট্রেণ বিধ্বস্ত করে। জার্মানরা লিথুয়ানিয়ায় তাদের একটি তাঁবেদার সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লিথুয়ানিয়ার জনসাধারণ অসহযোগিতা করায় তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যাও সামান্য কিছু সৈন্য জার্মানরা সংগ্রহ করেছিল তারাও শেষ পর্যন্ত জার্মানদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে গেরিলাদলে গিয়ে যোগ দেয়। মোট কথা জার্মানরা লিথুয়ানিয়ার জনসাধারণের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহানুভূতিই পায়নি। মুষ্টিমেয় জনকয়েক বিশ্বাসঘাতক জার্মানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল ; কিন্তু তাদেরও অনেকেরই গেরিলাদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

লিথুয়ানিয়ার গেরিলাযুদ্ধ অনেকের বীরত্বের কাহিনীতে পূর্ণ।

তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় মারিয়া মেল্‌নিকাইট নাম্নী এক বীরাঙ্গনার। স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে এই বীর তরুণী অম্লান বদনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে একাই সে সাত-জনকে হত্যা করে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে শত্রুর খপ্পরে পড়তে হয়। বন্দী অবস্থায় তার ওপর অমানুষিক অত্যাচর চলে, কিন্তু নির্ভীক চিত্তে সে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে সে জার্মান-ঘাতকদের লক্ষ্য করে বলে, "সোভিয়েট লিথুয়ানিয়ার জন্যে আমি সংগ্রাম করেছি এবং মরছি। কিন্তু তোমরা, তোমরা কি জন্যে এখানে এসেছ ? জার্মান কুকুরের দল, আমাদের লিথুয়ানিয়ায় কি তোমাদের কাজ ?"

মারিয়া মেল্‌নিকাইট যখন লিথুয়ানিয়ার জনযুদ্ধে যোগ দেয় তখন তার বয়েস ছিল মাত্র কুড়ি বছর। তার মুখমণ্ডলে একটা বুদ্ধির দীপ্তি এবং চেহারায় একটা শৌর্যের ছাপ ছিল। বল্টিক তীরে লিথুয়ানিয়ার স্বর্গোদ্যান জারাসাজেতে তার জন্ম হয়। মারিয়ার পিতা ছিলেন একজন যন্ত্রশিল্পী এবং মা ছিলেন চাষীর মেয়ে। মারিয়া সাধারণত বিনয়ী ও কঠোর পরিশ্রমী মেয়ে ছিল। পড়াশুনা করতে সে অত্যন্ত ভালোবাসত এবং পৃথিবীকে জানবার জন্যে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্বদেশবাসী, স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের মাটি, স্বদেশের জল, সবই তার কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। সেজন্যেই জন্মভূমিকে পরপদানত দেখে সে স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারলো না, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লিথুয়ানিয়ার যুবশক্তির উত্থানে সে আত্মনিয়োগ করলো। গুপ্ত আন্দোলন পরিচালনা ও সংগঠনে তার অসাধারণ শক্তি দেখে দলের লোক বিস্মিত হয়ে গেল। মারিয়া ও তার সহকর্মীরা গুপ্ত ইস্তাহার লিখতো এবং সুযোগ পেলেই জার্মান গুদামগুলি জ্বালিয়ে দিত। জার্মানরা মারিয়াকে ধরবার জন্যে যখন নানাভাবে ফাঁদ পাতলো

তখন সে দলের নেতৃত্বভার তার এক প্রিয় বন্ধুর হাতে দিয়ে জনবিরল এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করলো।

অতি সাধারণ বেশে মারিয়া গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। গলায় তার একখানা নীল রুমাল বাঁধা থাকত। লালফৌজ যে তাদেরও মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করছে এ কথা সে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করতো। গ্রামের কৃষকরা বনের মধ্যে গোপনে সমবেত হয়ে মারিয়ার বক্তৃতা শুনতো। গ্রামবাসীদের কাছে সে দৃঢ়কণ্ঠে বলতো, "বন্ধুগণ, তোমরা জার্মানদের কথা শুনো না। তোমাদের সব ফসল লুকিয়ে ফেল এবং গরুঘোড়া বনে পাঠিয়ে দাও।" জার্মানরা বহু চেষ্টা করেও মারিয়ার কোন সন্ধান পেলনা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সে যুবক-যুবতীদের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদানের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলো। গেরিলাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হলো এবং বহুবার বহু বিপদের মধ্যে সে তাদের পাশে থেকে কাজ করে যেতে লাগলো। একদিন একটি অগভীর খরস্রোতা নদী গেরিলাদের পেরিয়ে যেতে হবে। নদী পার হতে দেখে জার্মানরা গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করে। গেরিলাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই গুলীর মুখে নদী পার হতে ভয় পায়। মারিয়া তখন নিজে সেই গুলীর মুখে নদীর জলে গিয়ে নামে এবং যারা তীরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল তাদের দিকে ঘুরে বলে, "ভয় কি! ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রাখবে তোমরা জনসেনা।" তখন আর কেউ তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না; মারিয়াকে তারা অনুসরণ করে চললো।

মারিয়াকে তার সহকর্মীরা সবাই ভালোবাসত। সে ভালোবাসায় কোন ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল না; রণাঙ্গনে একজন সৈনিককে আর একজন সৈনিক যেমন ভালোবাসে এ তেমনি ভালোবাসা। লিথুয়ানিয়ার গণচিত্তে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে গ্রামে তার নামে একটি গান ছড়িয়ে যায়। কোন্ কবি এই গান রচনা করেছিল

আজো তা জানা যায়নি, কিন্তু লোকের মুখে মুখে সমগ্র লিথুয়ানিয়ায় এই গান ছড়িয়ে পড়েছিল। গানটি এই :

মারিয়া, মারিয়া, বীর তুমি বীর,
সৈনিকের মতো বীর,
স্বদেশ-প্রেমের দীপ্ত বহ্নি
ললাটে তোমার জ্বলে,
তাই মৃত্যুরে অবহেলি
চল সম্মুখে মহাদর্পে—
তুমি-মহিয়সী নারী।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ৮ই জুলাই মারিয়া একটি যুদ্ধে একদল যুবক গেরিলার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বহু জার্মান সৈন্য তাদের ঘেরাও করে ফেলে। সকাল ৮ টার সময় অল্প কয়েকজন গেরিলা মরিয়া হয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়। মারিয়ার নিকট একটি টমিগান, একটি রিভল্‌বার এবং তিনটি গ্রেণেড ছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও গেরিলারা দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ চালিয়ে প্রবল বিক্রমের পরিচয় দেয়। এই যুদ্ধে মারিয়া সাতজন জার্মানকে নিহত করে এবং তার সহযোদ্ধারাও বহু জার্মানকে হতাহত করে। কিন্তু অবস্থা তাদের প্রবল প্রতিকূল ছিল। জার্মানরা ক্রমশ চারদিক থেকে তাদের চেপে ধরলো। সারাদিনব্যাপী যুদ্ধ চললো এবং সন্ধ্যার পর সে যুদ্ধের অবসান হলো। মারিয়ার সঙ্গীরা সব যুদ্ধে প্রাণ হারালো। সে তখন একা। গুলী ফুরিয়ে গেলে সে গ্রেণেড ছুঁড়ে জার্মানদের আক্রমন করলো। কিন্তু একা আর কতক্ষণ পারে, প্রতিপক্ষের অস্ত্রের আঘাতে তার দেহ জর্জর; সেই অবস্থায় জার্মানরা তাকে বন্দী করলো। তারপর চললো তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার। জার্মানরা তার আঙ্গুলগুলি ভেঙ্গে দিল, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে তার

পায়ের তলা পুড়িয়ে দিল—এইভাবে সারারাত তার ওপর অত্যাচার চললো। তার মুখ থেকে মাত্র একটি কথা বেরিয়ে এল, "তোমরা আমাকে খুন করতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের কোন খবরই দেব না।" লিথুয়ানিয়ায় যাঁরা গুপ্তভাবে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন জার্মানরা তাঁদের কথা তার মুখ থেকে শুনতে চাইছিলো। তাঁদের নাম বলে দিলে তাকে প্রাণে মারা হবে না, এমন কি তাকে পুরস্কার পর্যন্ত দেওয়া হবে এমন লোভও জার্মানরা দেখিয়েছিল। কিন্তু তার উত্তরে মারিয়া দৃঢ কণ্ঠে বলেছিল, "তোমরা আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পার, কিন্তু আমি কোন কথাই তোমাদের কাছে ফাঁস করব না।"

নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার চালাবার পর রক্তাক্ত অবস্থায় মারিয়াকে দুক্‌সৃতাস শহরের একটি ছোট ময়দানে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। জার্মানরা তার ফাঁসীকাষ্ঠের চারপাশে শহরের লোকজনকে এনে দাঁড করিয়ে দিল। ধীর পদক্ষেপে মারিয়া ফাঁসীমঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালো। জনতার দিকে সে একবার তাকালো, চুলগুলি পেছনের দিকে উল্‌টে দিয়ে সে চীৎকার করে বলে উঠলো, "তোমরা কেঁদনা, লালফৌজ এর প্রতিশোধ নেবে।" এই ক'টি কথা বলেই সে ফাঁসীর রজ্জুর দিকে গলা বাড়িয়ে দিল। ফাসিস্তদের যূপকাষ্ঠে এক অমিত বিক্রম দেশপ্রেমিকার জীবনান্ত হলো।

চীন

বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধে চীনের মতো সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা জগতের আর কোন দেশ দেখাতে পেরেছে বলে জানা নেই। আধুনিক যুদ্ধে সুনিপুণ জাপানের মতো একটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির সঙ্গে চীনকে দীর্ঘ আট বছর ধরে যুদ্ধ করতে হয়েছে। জাপানের তুলনায় চীনের জনবল বেশি থাকলেও অস্ত্রবল অত্যন্ত কম ছিল। সামরিক সংগঠন ও অস্ত্রবলের দিক দিয়ে চীন একরকম মধ্যযুগীয় অবস্থায় ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিল্প ও সমরায়োজনে জাপান প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হতো। তার তুলনায় চীন ছিল অনেক পিছনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চীন জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালায়। এর জন্যে চীনাদের অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অসাধারণ মনোবল ছিল বলেই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাতে পেরেছিল। কেবল সৈন্যবল দিয়েই এই যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়নি; সৈন্যদের পিছনে ছিল চীনের সর্বসাধারণের সমর্থন। কেবল নিরস্ত্র সমর্থন ও সাহায্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না, জনসাধারণ সেখানে সশস্ত্রভাবেও সৈন্যদলকে সাহায্য করেছে; অর্থাৎ তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে অবিরাম গেরিলাযুদ্ধ চালিয়েছে। আগেও বলেছি চীনারা গেরিলাযুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী এবং চীনা গেরিলাকৌশল দেখেই জাপানীরা তা আয়ত্ত করে ও উত্তর মালয় ও ব্রহ্মের যুদ্ধে জাপানীরা গেরিলাকৌশল কাজে লাগায়। চীনের গেরিলাদের সম্বন্ধেই এবার সংক্ষেপে কিছু বলবো।

তার আগে চীনের জাতীয় ঐক্যের গোড়ার কিছু ইতিহাস দিলে বোধ হয় ভালো হবে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে জাপানীরা যখন প্রথম মাঞ্চুরিয়া

আক্রমণ করে, ক্যান্টনের ছাত্ররা তখন চীন-গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনে গৃহযুদ্ধ অর্থাৎ কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের অভিযান বন্ধ করবার জন্যে অনুরোধ জানায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা সভা ও শোভাযাত্রাদি করে এবং ইস্তাহার ছেপে চীনের সর্বসাধারণকে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সমবেত হতে বলে। সেই ছাত্র আন্দোলনে পুলিশ বাধা দেয়। বহু ছাত্র হতাহত হয়। বাধ্য হয়ে তারা তখন গুপ্ত আন্দোলন চালাতে থাকে।

এরপর ১৯৩২ খৃস্টাব্দে জাপানীরা সাংহাই আক্রমণ করে এবং জেনারেল চয় তিং-কাই ও তাঁর প্রসিদ্ধ উনবিংশ রুট আর্মি তাতে বাধা দেয়। চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তখন জেনারেল চয়কে কোনভাবে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হন। তারপর জাপানীদের সঙ্গে যখন যুদ্ধবিরতি হলো তখন ফুকিয়েন প্রদেশে গিয়ে গৃহযুদ্ধ করবার জন্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট জেনারেল চয়ের সৈন্যদলকে আদেশ করলেন। জেনারেল চয় গৃহযুদ্ধ করতে অসম্মত হলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তখন তাঁর সৈন্যদল ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে বিদেশে সফরে পাঠালেন। সেই সময় চীনে ফাসিস্ত সমর্থকদের তাণ্ডব চললো। চীনের সর্বত্র গোয়েন্দায় ভরতি—লোক ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলো; সভাসমিতি বন্ধ করে দিয়ে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে জনমতের কণ্ঠরোধ করা হলো।

তারপর ঘটলো "১৯৩৬ খৃস্টাব্দের সিয়ান ঘটনা।" মার্শাল চ্যাং সুয়ে-লিয়াংএর সৈন্যরা জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেককে ধরে নিয়ে গিয়ে চীনের সম্মিলিত দলের নেতৃত্ব গ্রহণে রাজী করাবার পর তাঁকে মুক্তি দিল। এরপর ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে জাপান চীনে ব্যাপক অভিযান শুরু করলো।

চীনে সেনাপতি হিসেবে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের

পরেই ছিল তরুণ মার্শাল চ্যাং স্থয়ে-লিয়াংএর স্থান। তাঁর বাড়ী ছিল মাঞ্চুরিয়ায় এবং তাঁর পিতা ছিলেন মাঞ্চুরিয়ার গবর্ণর। মাঞ্চুরিয়া জাপ-দখলে যাবার আগেই তাঁর পিতা জাপানীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

মার্শাল চ্যাংকে চীনের উত্তরপশ্চিম এলাকায় চীনা লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। লাল ফৌজের হাতে তাঁর অনেক সৈন্য বন্দী হয়। তারা মুক্ত হয়ে এলে পর দেখা যায় যে, তাদের ওপর লাল ফৌজের অসম্ভব প্রভাব পড়েছে। তারা এসে মার্শাল চ্যাংকে বলে, "আপনি একজন মাঞ্চুরিয়ার লোক, আমাদেরও অধিকাংশেরই বাড়ী মাঞ্চুরিয়ায়। জাপানীরা আপনার পিতাকে হত্যা করেছিল। লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা কেন বৃথা শক্তি নষ্ট করব? তারা তো আমাদেরই স্বদেশবাসী। আসুন আমরা কেন জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমাদের দেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিই নে?"

তাদের কথায় তরুণ মার্শালের মত ফিরে গেল এবং তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তারপরই একদিন তাঁর সৈন্যরা মার্শাল চিয়াং কাইশেককে হরণ করে নিয়ে এল। সেখানে সমস্ত শুনে তিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে সংগ্রাম চালাবার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

এরপর ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে চীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চিয়াং কাইশেক-পরিচালিত কুওমিণ্টাং দল ও মাও-সে-তুং পরিচালিত কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি হয় যে, চিয়াং কাইশেক তাঁর সরকারী সৈন্যদলকে আর কম্যুনিস্ট দলনে না লাগিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবেন এবং কম্যুনিস্ট সৈন্যরাও জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্টকে

সাহায্য করবে। সেই চুক্তি অনুযায়ী উত্তর চীনের সোভিয়েট এলাকাকে কম্যুনিস্টরা অখণ্ড চীনের একটি অংশে পরিণত করে; তার নাম রাখা হয় শেন্‌সি-কান্‌সু-নিংসিয়া বর্ডার রিজিয়ন। সাধারণত তা বর্ডার রিজিয়ন বলেই পরিচিত। উক্ত এলাকার রাজধানীর নাম ইয়েনান। চীনা লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। উক্ত ফৌজকে কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীন করা হয়। কম্যুনিস্টরা যখন তাদের লাল ফৌজকে পুনর্গঠিত করতে চায় তখন কেন্দ্রীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ মোট ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে মাত্র তিনটি ডিভিসন গঠনের অনুমতি দেন। এই বাহিনীর নাম বদলে রাখা হয় অষ্টম রুট আর্মি। এছাড়া মধ্যচীনে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে যে-সব গেরিলা সৈন্যদল গড়ে উঠেছিল তাদের পুনর্গঠিত করে নাম দেওয়া হয় নতুন চতুর্থ আর্মি। তখন এই নতুন আর্মির লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ১২ হাজার।

এই অষ্টম রুট আর্মি ও নতুন চতুর্থ আর্মি কেবল নিজেরাই জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি, লক্ষ লক্ষ চীনা জনসাধারণের প্রাণে তারা প্রতিরোধের স্পৃহা জাগিয়ে দেয়। তার ফলে জাপানী কবল থেকে চীনের বহু এলাকা মুক্ত হয়। উত্তর চীনে যে বৃহৎ পাঁচটি এলাকা চীনের জনসেনা মুক্ত করে, সেই এলাকাগুলির অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। অর্থাৎ উত্তর চীনের মোট অধিবাসীদের অর্ধেকেরও বেশী জাপানী কবল থেকে জনসেনার সাহায্যে মুক্তি পায়। মধ্যচীনেও প্রায় একই অবস্থা। সেখানেও চীনা জনসেনা আটটি বৃহৎ এলাকা মুক্ত করে এবং সেই এলাকাসমূহের লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি। অর্থাৎ মধ্যচীনেরও শতকরা প্রায় ৫০ জন এভাবে মুক্তি পায়। দক্ষিণ চীনে কম্যুনিস্টদের গেরিলা সৈন্যরা হাইনান দ্বীপে এবং ক্যাণ্টন ও হংকং-এর আশেপাশে যেসব এলাকা মুক্ত করে সেই সব এলাকার লোকসংখ্যাও ৭০ থেকে ৮০ লক্ষের মধ্যে।

খাস বর্ডার রিজিয়নের লোকসংখ্যা প্রায় পনের লক্ষ। সুতরাং তাদের ধরলে দেখা যায় চীনা কম্যুনিস্টরা চীনের ন'কোটি লোককে জাপ-কবল থেকে মুক্ত রাখে।

অনেকের ধারণা, জাপ-কবল থেকে মুক্ত চীনের এই ন' কোটি লোককেই বুঝি রাতারাতি কম্যুনিস্ট বানিয়ে ফেলা হয়েছে বা তেমন চেষ্টা চলেছে। রাতারাতি কোন দেশ বা জাতিকে কম্যুনিস্ট করা যে যায় না একথা অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই জানেন বা বোঝেন। বিশেষ করে যুদ্ধের বিপদের মধ্যে জোর করে কম্যুনিস্ট মতবাদকে চাপিয়ে দেবার মত নির্বোধ চীনা কম্যুনিস্টরা নয়; কেননা তারা একথা ভাল করেই জানতো যে জোর করে কোন মতবাদকে চাপাতে গেলে তাতে আরো বিভেদেরই সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে প্রতিরোধ-আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই জন্যেই তারা মুক্ত এলাকায় সর্বদল সমন্বয়ের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যের দিকে নজর দেয় বেশি। সুতরাং সেখানে সকল দলই নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় এবং তার ফলে এক গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। চিয়াং কাইশেক-শাসিত এলাকার সঙ্গে কম্যুনিস্টগণ কর্তৃক মুক্ত এলাকার পার্থক্য হলো এই যে, পূর্বোক্ত এলাকায় কেবল একটিমাত্র দল অর্থাৎ কুওমিণ্টাং দলই শুধু কর্তৃত্ব করে যায়, আর শেষোক্ত এলাকায় সকল দলের প্রতিনিধিই মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। সুতরাং একটিমাত্র দলের প্রভুত্বের ফলে চিয়াং কাইশেক তাঁর শাসিত এলাকায় কার্যত ডিক্টেটর হয়ে বসেন। পক্ষান্তরে কম্যুনিস্টগণ কর্তৃক মুক্ত এলাকায় ধীরে ধীরে গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে। শেষোক্ত এলাকায় কুওমিণ্টাং, জাতীয় মুক্তি সংঘ, ত্যাগী সংঘ, শিক্ষাব্রতী সংঘ, কম্যুনিস্ট পার্টি প্রভৃতি সকল দলেরই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এই সব দলের সঙ্গে যুক্ত হয় কিষাণ, শ্রমিক, যুবক, নারী ও বালক

প্রতিষ্ঠান ; তাদের মোট সভ্যসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। প্রত্যেক মুক্ত এলাকায় সাবালক নরনারী মাত্রেরই ভোটাধিকার আছে। চুংকিং গবর্ণমেণ্টে যেমন একদল লোক ওপর থেকে সমস্ত ব্যবস্থা নিচের দিকে চাপিয়ে দেন, মুক্ত এলাকায় ঠিক তার বিপরীত পন্থা অনুসৃত হয়। সেখানে গ্রাম্য পরিষদ থেকে আরম্ভ করে বর্ডার রিজিয়নের পরিষদ পর্যন্ত সর্বত্র গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ৮০ জন এই নির্বাচনে যোগদান করে। এ থেকেই বোঝা যায়, নিজেদের শাসনব্যাপারে সেই সব এলাকার জনসাধারণ কতটা আগ্রহশীল ও উৎসাহী। যাতে সর্বসাধারণের মধ্য থেকে লোক সরকারী চাকরি, শাসনকার্য পরিচালনা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে আসতে পারে তার জন্যে কম্যুনিস্টরা নিয়ম করে দেয় যে, সরকারী কি বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানেই এক তৃতীয়াংশের বেশি কম্যুনিস্ট থাকতে পারবে না।

কুওমিণ্টাং এলাকায় স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় জমিদাররা গ্রাম্যজীবনে প্রভুত্ব করেন ; কিন্তু কম্যুনিস্টগণ কর্তৃক মুক্ত এলাকায় জমিদার ও দরিদ্র কৃষক সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করে থাকে। প্রত্যেকেরই ভোটের অধিকার থাকায় গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলি সাধারণত দরিদ্র কৃষক ও প্রজাদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রতি গ্রাম্য পঞ্চায়েতে একজন করে সভাপতি থাকেন। জমিদার জনপ্রিয় হলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে তাঁরও নির্বাচিত হতে কোন বাধা নেই। সেখানে আমলাতন্ত্রেরও কোন বালাই নেই। গ্রামে সরকারী পুলিশের পরিবর্তে সশস্ত্র গ্রামরক্ষীরা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। গ্রামবাসীরা নিজেরাই এই গ্রামরক্ষীদল গঠন ও তার একজন ক্যাপ্‌টেন্‌ নির্বাচন করে। গ্রাম রক্ষীদল গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

কেবল গ্রাম্য পঞ্চায়েতই নয়, সর্বোচ্চ গণপরিষদেও এই ব্যবস্থাই

রয়েচে। সেই গণপরিষদেও সমাজের অতি সাধারণ স্তর থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। সম্পত্তির মালিক হিসেবে সেখানে কেউ ভোটের অধিকার পায় না, সাবালক মাত্রই ভোটের অধিকারী। কাজেই কৃষক, প্রজা, মুচি, কামার, ছুতার কারোরই সেখানে প্রবেশে বাধা নেই। এই গণপরিষদই বর্ডার রিজিয়নের গবর্ণমেণ্ট নির্বাচিত করে। কাজেই বর্ডার রিজিয়নের শাসকগণকে সর্বদাই জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। তাঁরা তা করেন বলেই জনসাধারণও তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে থাকে।

চীনের এই নব গণতন্ত্রের জনসাধারণ এক নতুন জীবন লাভ করেছে এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে তারা অপূর্ব বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। চীন-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস চীনা জন-সাধারণের বীরত্বের কাহিনীতে উজ্জ্বল। চীনের গ্রাম্য চাষীদের দৃঢ়তার একটি কাহিনী এখানে বলছি। জাপানীরা একদিন একটি এলাকা আক্রমণ করলো। সেই এলাকায় গ্রাম্য গণশিক্ষা আন্দোলন বেশ প্রসার লাভ করেছিল। গ্রামবাসীদের জাপানীরা এক জায়গায় নিয়ে জড় করলো। তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে জাপানীরা জিগ্যেস করলো যে, ডিষ্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান কে? যুবক উত্তর করলো, "আমি জানি নে"। জাপানীরা তৎক্ষণাৎ সেই চীনা যুবকটির মুণ্ড ছেদন করলো। তারা তখন একটি চীনা নারীকে প্রশ্ন করলো এবং তার কাছ থেকেও একই উত্তর পেল। জাপানীরা তার বুকে বেয়নেট বসিয়ে দিল। তারপর একটি চীনা বালকেরও একই পরিণতি ঘটলো। অবশেষে একটি চীনা বৃদ্ধার উপর জাপানীরা যখন অত্যাচার করতে উদ্যত হলো তখন জনতার মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "আমিই ডিষ্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান।" তখন সমস্ত জনতার প্রত্যেকটি লোক এক সঙ্গে চীৎকার করে বলতে লাগলো, "আমিই ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান।"

জাপানীরা ভীষণ অসুবিধেয় পড়লো; কে যে সত্যকার ডিষ্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। অনেক চেষ্টার পর তারা ডিষ্ট্রিক্ট চেয়ারম্যানকে চিনতে পারলো এবং তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। সেই দিনই রাত্রিবেলা চীনের জনযোদ্ধারা জাপ-শিবিরে হানা দিয়ে তাদের চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করলো। জনসাধারণেব অপূর্ব সাহস দেখে চেয়ারম্যান মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মাত্র একটি কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "গণতন্ত্রই আমাকে রক্ষা করেছে।"

কেবল সাধারণ নাগরিক জীবনেই নয়, চীনের এই নব জাগ্রত অংশের সৈন্যদলেও এই গণতন্ত্রই শক্তির প্রধান উৎস।

চীনের এই সব অঞ্চলে জাপ-ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে থেকে তিন শ্রেণীর সশস্ত্র চীনা যোদ্ধারা সংগ্রাম করতো। প্রথম হলো অষ্টম রুট ও নতুন চতুর্থ আর্মির রেগুলার সৈন্যগণ। তারা হলো কম্যুনিষ্টদের কেন্দ্রীয় সৈন্যদল। দ্বিতীয় হলো চীনা পার্টিজান দল। তারা নিয়মিত সৈন্য হলেও তাদের কাজ ছিল স্ব স্ব নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাপানীরা কোন এলাকা দখল করলেও চীনা পার্টিজানরা সেই এলাকা ছেড়ে যেতে পারতো না। তৃতীয় হলো পিপল্‌স্ মিলিসিয়া। যেসব কৃষক সামরিক শিক্ষা লাভ করতো তাদের নিয়ে এই সৈন্যদল গঠন করা হতো। তারা সর্বদা যুদ্ধ করতো না; প্রয়োজন অনুসারে লড়াই করবার জন্যে তাদের ডাক পড়তো।

চীনের মুক্ত এলাকায় এই তিন শ্রেণীর যোদ্ধাদের সাধারণত একটি মানুষের দেহের সঙ্গে তুলনা করে বলা হতো, "রেগুলার সৈন্যরা হলো মেরুদণ্ড, স্থানীয় পার্টিজানরা হলো মাংসপেশী এবং পিপল্‌স্ মিলিসিয়া হলো ধমনীর শোণিত প্রবাহ।"

রেগুলার বাহিনীতে সামরিক শৃংখলা অত্যন্ত কঠোর হলেও তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চালিত হয়। সামরিক

কাজের বাইরে তাদের যে জীবন সেই জীবনে একজন অফিসার ও একজন সাধারণ সৈন্যে পার্থক্য নেই। খাদ্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা করার জন্যে তারা অর্থ কমিটি গঠন করে থাকে এবং সৈন্যরা দস্তুরমতো ভোট দিয়ে সেই কমিটির প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রত্যেক অফিসার ও প্রত্যেক সৈন্যেরই তাতে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সমান অধিকার আছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সৈন্যকেই যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

পার্টিজান দলের গঠনপদ্ধতির মূলেই রয়েচে গণতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্রকে ভিত্তি করেই তার সৃষ্টি। সৈন্যরা তাদের নায়ক নির্বাচিত করে এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত দলের শৃংখলা মেনে চলে। পিপল্‌স্ মিলিসিয়ার গণতান্ত্রিক ভিত্তি আরো বেশি, কেননা সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকেই তার উৎপত্তি। অনেক সময় তাদের মধ্যে কোন নেতারও প্রয়োজন হয়নি। তারা নিজেরাই মিলেমিশে ও বুদ্ধিপরামর্শ করে কাজ করেছে। তাদের প্রধান কাজ ছিল শত্রুর অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে রেগুলার সৈন্যদের খোঁজ-খবরাদি দেওয়া এবং স্বপক্ষের সৈন্যদের চলাচল-পথে কোন বিঘ্ন না ঘটে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অবশ্য সুযোগ পেলে জাপ্-শিবিরে হানা দিয়ে এবং জাপ-কনভয় আক্রমণ করে তারা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি লুট না করতো এমন নয়। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের শেষভাগে পিপল্‌স্ মিলিসিয়ায় প্রায় বিশ লক্ষ চীনা চাষী যোদ্ধা জাপ-ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে থেকে তাদের নানাভাবে বিব্রত করতো বলে খবর পাওয়া যায়।

চুংকিং সরকারের এলাকা

এবার কুওমিণ্টাং-শাসিত এলাকা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রথমেই দেখা যাক সেখানে অর্থ নৈতিক অবস্থা কি পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধের

দরুণ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। চুংকিং গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থার ফলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন এক শ্রেণীর লোক একচেটে অধিকার লাভ করে এবং অতিরিক্ত মুনাফা ক'রে তারা ফেঁপে ওঠে। ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাজকারবার বন্ধ হয়ে যায়। মজুতদাররা এত প্রশ্রয় পেয়ে যায় যে গবর্ণমেণ্টকেও তারা অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করে। কাঁচা মালের অভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রিত কলকারখানাগুলি অনেক স্থলে বন্ধ হয়ে যায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে চলে। বণ্টন-ব্যবস্থায় শৈথিল্যের দরুণ সরকারী গুদামগুলিতে চাল পচে যায়; অথচ দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে। দারুণ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলা দেশেও আমরা এইরূপ অবস্থা দেখেছি। শাসন-বিভাগে দুর্নীতি প্রবেশ করলে এইরূপ হতে বাধ্য। মুনাফা-খোররা সরকারী আমলাদের ঘুষ দিয়ে অবাধে দুষ্কর্ম করে যায়। বিদেশী আমলাতন্ত্র উদাসীন ছিল বলেই বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও মহামারীতে মারা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় চীন স্বাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও মার্শাল চিয়াং কাইশেকের আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বাংলা দেশেরই মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশেরই মতো চীনেও কুওমিণ্টাং-শাসিত এলাকায় চোরাবাজার, সমর শিল্পোৎপাদন ও মিলিটারী কনট্রাক্টরী করে এক শ্রেণীর লোক লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হয়ে ওঠে এবং আর এক শ্রেণীর লোক পথের ভিখারী হয়ে যায়। ভারতেরই ন্যায় চীনও কৃষিপ্রধান দেশ। চীনের অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ৮০ জনই চাষী। সে জন্যেই সেখানে চাষী শ্রেণীরই দুঃখদুর্দশা হয় সব চেয়ে বেশি। সমস্ত জিনিষ সেখানে অগ্নিমূল্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে প্রথম ছ' মাসে চার ধাপে জিনিষের দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। জানুয়ারী মাসে দাম অকস্মাৎ শতকরা ২৫ টাকা বাড়ে, ফেব্রুয়ারী মাসে আরো বেড়ে যায়, তারপর মার্চ মাসে আবার দাম বাড়ে,

মে মাসে তার চেয়েও দাম বেড়ে যায় এবং জুন মাসে গিয়ে তা চরমে পৌঁছায়। জানুয়ারী মাসে চুংকিংএ দেড় মণ ভালো চালের দাম হয় ১৬৫০ চীনা ডলার, ফেব্রুয়ারী মাসে তার দাম গিয়ে দাঁড়ায় ২৪০০ ডলারে ; মার্চ মাসে চোরা বাজারে তার দাম হয় ৫৪০০ ডলার। গবর্ণমেণ্ট তখন দর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং ৪০০ ডলারে দর বেঁধে দেন। সরবরাহের ব্যবস্থা না করে দর নিয়ন্ত্রণ করলে কি অবস্থা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাংলাদেশে আমরা তা দেখেছি। চীনেও একই অবস্থা হলো। দর নিয়ন্ত্রণের ফলে মে মাসে চালের দর বেড়ে গিয়ে ৮ হাজার ডলারে পৌঁছাল। পরে তা ৮ হাজার ৫শ' ডলার পর্যন্ত উঠলো। বলা বাহুল্য, চালের দরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসেরও দর অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে চীনে যে দ্রব্যমূল্য ছিল, ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে তা বেড়ে চারশ' পনের গুণ হলো। সে বছর জানুয়ারী মাসে চুংকিংএ একটি শোলার টুপির দাম হয় ৬৫০ টাকা ; এক জোড়া জুতার দাম হয় ২৬০ টাকা ; একটি স্যুটের দাম হয় ২৬০০ টাকা ; এক বোতল হুইস্কি মদের দাম হয় ২৪শ' টাকা ; একটি লিপ্‌স্টিকের দাম হয় ১৩০ টাকা, আধ সের মাখনের দাম হয় ২৩০ টাকা।

• এই খবরগুলি চীনের কম্যুনিস্টরা প্রচার করেনি। বৃটিশ পুঁজিপতিদের অর্থপুষ্ট সংবাদ-প্রতিষ্ঠান রয়টারের সংবাদদাতারাই চুংকিং থেকে এই সংবাদগুলি জগদ্বাসীকে বিতরণ করেছেন।

চীনে চালের দাম বেড়ে যায় বলে চাষীরা উপকৃত হয় এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। দরিদ্র চাষীরা যে ঘরে চাল মজুত করে রাখতে পারে না একথা অন্তত বাংলাদেশের লোক ভালোভাবেই জানেন। ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারের খাজনা ও মহাজনের ঋণ শোধ করবার জন্যে গরীব চাষীদের প্রায় সব শস্যই বেচে দিতে হয়। তারপর সারা বছর তারা কিনে খায়। আমাদের

দেশের মতো চীনেও জমিদার এবং মহাজনের অভাব নেই। দর বৃদ্ধির দরুণ সেই জমিদার ও মহাজনেরাই লাভবান হয়, তারাই দেশের অধিকাংশ খাদ্য মজুত করে রাখে এবং দর বৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। বড় বড় জোতদারদেরও অবস্থা ফিরে যায়। অপর দিকে যারা মধ্যাবস্থার সাধারণ চাষী ছিল তারা ক্রমশ একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে চুংকিং গবর্ণমেণ্ট সরকারী খাজনা স্বরূপ অর্থের পরিবর্তে শস্য আদায়ের ব্যবস্থা করে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা আরো শোচনীয় করে তোলেন।

এই গেল কুওমিণ্টাং এলাকায় অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা। উক্ত এলাকার সামরিক অবস্থা সম্পর্কে এবার কিছু বলা যাক। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইয়েনানে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাতে উক্ত দলের নেতা মাও-সে-তুং রিপোর্টে বলেন:

"চীনে জাপ-কবল থেকে মুক্ত এলাকার ক্ষেত্রফল এখন ৯ লক্ষ ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি। উক্ত এলাকায় ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ লোকের বাস। এই বিশাল মুক্ত এলাকায় জাপানীদের বিরুদ্ধে সমস্ত দল একত্র হয়ে সংগ্রাম করছে। মুক্ত এলাকায় সৈন্যসংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ১০ হাজারে; এ ছাড়া সেখানে ২২ লক্ষ স্বেচ্ছাসৈন্য রয়েচে।

"পক্ষান্তরে কুওমিণ্টাং এলাকায় দেখা যায় যে, সেখানে কর্তৃপক্ষের গণবিরোধী নীতি ও আচরণের ফলে পর পর যুদ্ধে তাদের পরাজয় হচ্ছে, বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুর দখলে গিয়েছে এবং ভীষণ খাদ্য ও অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছে। তার ফলে সেখানে সৈন্যদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে এবং লোকের মনোবলও ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। কুওমিণ্টাং সৈন্যদের সংখ্যা অর্ধেক কমে গেছে।

"মুক্ত এলাকায়ই ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ থেকে জাপানীদের আক্রমণ

চলেছে বেশি। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে মুক্ত এলাকার চীনা সৈন্যরা চীন অভিযানকারী জাপ-বাহিনীর শতকরা ৬৪ ভাগ এবং তাঁবেদার চীনা বাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগ সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে জাপানীরা চীনের প্রধান রেলপথ ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিরাট অভিযান চালায় এবং তারা দেখতে পায় যে, কুওমিণ্টাং সৈন্যরা প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকের হিসেবে দেখা যায়, মুক্ত এলাকায় চীনা সৈন্যবা সমগ্র চীনের জাপ বাহিনীর শতকরা ৫৬ জন সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং মুক্ত এলাকার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধরত তাঁবেদার চীনা সৈন্যদের সংখ্যা আগের মতোই আছে। কুওমিণ্টাং দলের বহু অফিসার সদলবলে জাপানীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেন; আবার কোন কোন কুওমিণ্টাং অফিসার ব্যক্তিগত-ভাবে জাপ পক্ষে গিয়ে তাঁবেদার চীনা সৈন্যদল গঠন করেন। আট লক্ষ চীনা-তাঁবেদার সৈন্যের মধ্যে এই সব দলত্যাগী কুওমিণ্টাং অফিসারদের সৈন্যসংখ্যাই অধিক। কুওমিণ্টাং দলের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা এই সব তাঁবেদার সৈন্যকে এই কারণে সমর্থন করে থাকে যে, তারা জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুক্ত এলাকায় প্রতিরোধী চীনা সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। এ ছাড়াও কুওমিটাং দলের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা শেন্‌সি-কানসু-নিংসিয়া বর্ডার রিজিয়ন এবং অন্যান্য মুক্ত এলাকা অবরোধ করে রাখবার জন্যে বহু সৈন্য মোতায়েন করে রাখে। তাদের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার।"

এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে! এক দিকে যখন কুওমিণ্টাং বাহিনী জাপানীদের কাছে পরপর মার খেতে থাকে তখন তারই এত বড় একটি অংশকে কম্যুনিস্টদের ঠেকাবার জন্যে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসিয়ে রাখা হয়। কেবল তাই নয়, দেশের মুক্তির জন্যে যারা সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করছিল, তাদেরই সর্বনাশ করবার উদ্দেশ্যে

চীনা তাঁবেদার বাহিনী গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়; কারণ তাদের সাহায্য পেলে জাপানীরা মুক্ত এলাকায় চীনা বাহিনীকে জব্দ করতে অধিকতর সুবিধে পাবে। দেশের বিপৎকালে এমন হীন চক্রান্তের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ইজরাইল এপ্‌স্টাইন চীনে বহু বৎসর কাটিয়েছেন। চীন-জাপান যুদ্ধ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। কম্যুনিস্ট ও কুওমিণ্টাং দুই এলাকা সম্পর্কেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েচে। সুতরাং চীনের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মতামতকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন ঃ

"কুওমিণ্টাং সৈন্যদের ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ থেকে সামরিক নীতিই এই দাঁড়ায় যে, তারা এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ না করে পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষা করবে এবং অন্যান্য দেশ জাপানের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে কুওমিণ্টাং সৈন্যরা যতদূর সম্ভব কম্যুনিস্ট-চালিত চীনা বাহিনীকে উচ্ছেদ করবার প্রয়াস পাবে। তাদের একমাত্র কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ফলে কুওমিণ্টাং সৈন্যদলের কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী অফিসারগণ জাপ-বিরোধী চীনা অফিসারগণকে ডিঙিয়ে ওপরে চলে গেলেন; সৈন্যদের অভিজ্ঞতা ও উৎসাহের কোন মূল্যই রইল না। কুওমিণ্টাং সৈন্যরা সোয়াস্তি পাবার জন্যে এতটা উদগ্রীব হয়ে উঠলো যে, স্থানে স্থানে তারা জাপানীদের সঙ্গে খানিকটা আপোষরফা করে নিল। জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কুওমিণ্টাং সৈন্যরা কোন কোন এলাকায় কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতো; তাতে তাদের অফিসারগণ বিশেষ আপত্তি করতেন না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের উৎসাহিতই করতেন। কুওমিণ্টাং এলাকা ও জাপ-অধিকৃত এলাকার সীমান্তে সাধারণত শান্তিই বিরাজ করতো। কুওমিণ্টাং

অফিসারগণ তাঁদের সৈন্যদের সাহায্যে শত্রুর সঙ্গে চোরা কারবার করে প্রচুর লাভবান হতেন। সেনাপতিরা সাধারণ সৈন্যদের বেতন ও খাদ্যভাতা আত্মসাৎ করতেন; সৈন্যরা আবার জনসাধারণের বিত্ত ও খাদ্যাদি লুণ্ঠন করে তার ক্ষতিপূরণ করে নিত।

"পক্ষান্তরে কম্যুনিস্ট-চালিত জনসেনা কর্তৃক মুক্ত এলাকায় দেখা যায়, আগাগোড়াই সেখানে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে। মাঝে মাঝে তারা সামরিক প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক পশ্চাদপসরণের পরেই আসে জাপানীদের ওপর প্রবলতর আক্রমণ। এই কারণেই মুক্ত এলাকা ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলে। মুক্ত এলাকার লোকসংখ্যা নয় কোটিরও বেশি এবং সৈন্যদলে রেগুলার সৈন্যের সংখ্যাই ছয় লক্ষ। এছাড়া রয়েচে লক্ষ লক্ষ গেরিলা যোদ্ধা এবং পিপল্‌স্ মিলিসিয়া বা হোমগার্ডের পঁচিশ লক্ষ সশস্ত্র লোক। মিত্রপক্ষের প্রত্যেক সামরিক পর্যবেক্ষকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, চীনের মুক্ত গণতান্ত্রিক এলাকার সৈন্যরা সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সুনিপুণ যোদ্ধা এবং তাদের খাদ্যাদির ব্যবস্থাও সব চেয়ে ভাল। মুক্ত এলাকায় যে-সব গণপরিষদ শাসনকার্য চালায় সেইগুলির পিছনে রয়েচে সর্বশ্রেণীর লোকের সমর্থন। কৃষক, শ্রমিক, নারী, যুবক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সমন্বয়ে সেখানে গড়ে উঠেছে এক নতুন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। প্রায় দেড় কোটি লোক সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য।

"আট বছরব্যাপী যুদ্ধে স্বাধীন চীনে কুওমিণ্টাং শাসিত এলাকায় লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটি থেকে কমে প্রায় দশ কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়; জাপানীরা যে এলাকা দখল করে সে এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি; চীনা জনসেনা যে এলাকা উদ্ধার করে তার লোকসংখ্যা নয় কোটি। যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। তাদের বাদ দিয়ে জাপ-অধিকৃত এলাকায় লোকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় বিশ কোটি।"

মার্শাল চিয়াং কাইশেকের অনুচরবর্গের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে বৈদেশিক সংবাদদাতারা যেসব বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে; কিন্তু সেই দীর্ঘ ফিরিস্তিতে না গিয়ে চীনের একজন গেরিলা তার নিজের দলের যে ইতিহাস বিবৃত করেছেন এখানে তা থেকেই খানিকটা বিবরণ দিচ্ছি।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ চীনের প্রসিদ্ধ বন্দর ক্যান্টনের পতন হলে পর হংকং-এর প্রায় দশ মাইল দূরে পিংশান নামক গ্রামে একটি গেরিলা দল সংগঠিত হয়। সান ইয়াৎ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রগতিশীল গ্র্যাজুয়েট যুবক সেই গেরিলাদলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নাম চিং সাং।

জাপানীরা ক্যান্টনে পৌছাবার আগেই উক্ত বন্দরের বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকাপয়সা তুলে সপরিবারে মোটরে করে কোয়াংতুং প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে স্থইকোয়াং-এ চলে যান। জাপানীরা যখন ক্যান্টনের দ্বারে এসে উপনীত হলো চীনা সরকারী সৈন্যদল তাদের কোন রকম বাধা না দিয়েই সরে পড়লো। বিনা বাধায়ই জাপানীরা ক্যান্টন দখল করলো। ধনী ব্যক্তিরা মাকাকোর পথে হংকং পালিয়ে গেল। গরীবদের সেই উপায় ছিল না; কাজেই জাপানী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই জাপ-অধিকৃত এলাকায় গেরিলা বাহিনীর উদ্ভব হয়।

গোড়ার দিকে পিংশানের গেরিলা বাহিনীতে লোক ছিল মাত্র পঞ্চাশ জন। কয়েক জন ছিল ছাত্র; আর বাকী সকলেই ছিল চাষী। তাদের সম্বল ছিল সাবেকী ধরণের দশটি জার্মান রাইফেল ও শ'দুই গুলী।

দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই গেরিলা বাহিনীর লোকসংখ্যা পঞ্চাশ থেকে দু'শ' হলো। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে লোকেরা এসে এই

গেরিলাদলে যোগ দিল এবং সঙ্গে তারা রাইফেল ও গুলী নিয়ে এল। কাজ অনুযায়ী গেরিলা বাহিনীতে পাঁচটি বিভাগের সৃষ্টি হলো: (ক) সংগঠন, (খ) প্রচার, (গ) শিক্ষা, (ঘ) রাজনৈতিক ও (ঙ) রণচালনা। দিনের বেলা প্রত্যেকটি দল স্ব স্ব বিভাগের জন্যে নির্দিষ্ট কাজ করে যেত এবং রাত্রে সকলে মিলিত হয়ে গেরিলা-রণকৌশল আয়ত্ত করতো।

একমাস বাদে এই গেরিলা বাহিনীর লোক সংখ্যা দু'শ' থেকে পাঁচশ' হলো। হংকং ও সিঙ্গাপুর থেকে বহু ছাত্রছাত্রী এসে এই গেরিলাদলে যোগ দিল; তাদের সঙ্গে নার্স এবং একদল মেকানিকও এসেছিল। তারাও সঙ্গে করে কতকগুলি রাইফেল ও কিছু গুলীগোলা নিয়ে এলো।

এর মধ্যে জাপানীরা একদিন গিয়ে সেই গ্রামে হানা দিল। অবশ্য গেরিলারা বুঝতে পেরেছিল যে, জাপানীরা একদিন তাদের গ্রামে হানা দেবেই। তাই তারা আগে থেকেই গ্রামের শিশু, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদের নিকটবর্তী পার্বত্য এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামও তারা সেখানে স্থানান্তরিত করেছিল। সেই পার্বত্য এলাকায়ই তারা শিক্ষাশিবির স্থাপন করে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থাও সেখানেই হয়।

দুই সপ্তাহের মধ্যেই জাপানীরা গ্রামখানিকে ছারখার করে দিল, বাড়ীঘর তারা আগুন লাগিয়ে পোড়াল এবং গৃহপালিত সমস্ত পশুকে মেরে ফেললো। ইতিমধ্যে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ করায় জাপানীরা সেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো। রাত্রে যখন মার্শাল চিয়াংএর সৈন্যরা জাপানীদের আক্রমণ করেছিল তখন গেরিলারা জাপানীদের চলাচলপথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। তার ফলে নতুন জাপসৈন্য সেই গ্রামে এসে আর পৌছাতে পারল না।

জাপানীরা চলে যাবার পর গেরিলারা আবার সকলকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। উক্ত গেরিলাদলে তখন প্রায় হাজার লোক হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, জাহাজের লস্কর নানা শ্রেণীর লোকই তাতে স্থান পায়। হংকং থেকে আরো ছাত্রী এসে এই গেরিলাদলে যোগ দেয়। স্থানীয় কৃষকশ্রেণী ও বাইরে থেকে প্রবাসী চীনারা এই গেরিলাদলকে প্রধানত অর্থসাহায্য করতো।

একদিন রাত্রে একজন কৃষকের খবরানুযায়ী গেরিলাদলের সেনাপতি একটি জাপানী ফাঁড়ির চলাচলপথ বিধ্বস্ত করবার জন্যে তিনজন গেরিলাকে পাঠান। তারা দু'জন জাপানীকে হত্যা করে একটি মেশিনগান দখল করে। এইটিই হয় তাদের প্রথম এবং একমাত্র মেশিনগান।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এই গেরিলা বাহিনীর কার্যকলাপে খুশি হয়ে কেন্দ্রীয় চতুর্থ রণাঙ্গনের একটি যোদ্ধ-দল হিসেবে এই গেরিলা বাহিনীকে স্বীকার করে নেয়। উক্ত রণাঙ্গনে চীনা বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হং-হিং-পিং। তাঁরই মারফৎ উক্ত গেরিলাদল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট থেকে রসদ ও অস্ত্র পাবার চেষ্টা করে। মাসখানেক বাদে তিনি গেরিলাদলের অধিনায়ককে জানালেন যে, কুওমিণ্টাং দলে যোগ না দিলে রসদ ও অস্ত্র দেওয়া হবে না। তার উত্তরে গেরিলাদলের অধিনায়কও জানালেন যে, কুওমিণ্টাং-এর বড় বড় কর্তা হবার আকাঙ্ক্ষা তাদের নেই, কাজেই কুওমিণ্টাং-এর সঙ্গে যোগ দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি আরও জানান যে, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাপানীদের পরাজিত করা ; কুওমিণ্টাং দলে যোগ না দিয়েও তাঁরা তা করতে পারেন।

এরপর গেরিলাদলের অধিনায়ক তাঁর লোকজনকে ডেকে বললেন :

"প্রিয় কমরেডগণ, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কুওমিণ্টাং এবং

আমাদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ অপ্রীতিকর হয়ে উঠছে। সরবরাহের জন্যে আপনারা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমরা এখন জানি গবর্ণমেণ্ট আমাদের সরবরাহ দেবেনা। কাজেই নিজেদের চেষ্টায়ই আমাদের সরবরাহ যোগাড় করতে হবে।

"সরবরাহ আমাদের পেতেই হবে। জাপানীদের কাছ থেকেই আমরা সরবরাহ পাব…কি ক'রে জাপানীদের কাছ থেকে পাব? জাপানীদের সন্ধানে আমরা বেরুব।

"এই, খানিকক্ষণ আগেই, আমাদের কৃষকদের কাছ থেকেই খবর পেলাম যে, কয়েক মাইল দূরে জাপ-ঘাঁটি সামচুনের দিকে গাড়ীতে করে জাপানীদের সরবরাহের একটি কন্‌ভয় যাচ্ছে। আমরা সেই সরবরাহ আনতে যাচ্ছি, আজ রাত্রেই আমরা তা পাব। আমার দুই কোম্পানী স্বেচ্ছাসৈন্য আবশ্যক। আপনাদের মধ্যে যারা যেতে ইচ্ছুক হাত তুলুন।"

উপস্থিত সকলেই প্রায় হাত তুললো। তাদের লক্ষ্য করে অধিনায়ক আবার বললেন:

"মনে রাখবেন যাঁরা যাবেন তাঁদের প্রত্যেককে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে হবে, আর সঙ্গে করে আনতে হবে জাপানীদের সরবরাহ।"

এই কাজের জন্যে যাদের বাছাই করা হলো তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো; আর যারা সুযোগ পেলনা তারা অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। রাত্রি দু'টার সময় গেরিলারা অভিযানে বেরিয়ে পড়লো এবং একটি সরু রাস্তার কাছে গিয়ে তারা উপস্থিত হলো। সেই রাস্তা দিয়েই জাপানী কন্‌ভয় যাবার কথা। গেরিলারা যে যার সুবিধেজনক স্থানে গিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রইলো। তাদের মধ্য থেকে একদল এগিয়ে গেল খানিক দূরে একটি কাঠের সেতু ভাঙ্‌বার জন্যে। সেই সেতুর ওপর দিয়েই জাপানীদের ট্রাকগুলি আসবে। কিন্তু

সেতুটি তারা ভাঙবে কি করে? তাদের মাইনও নেই, ডিনামাইটও নেই। তারা একটি বুদ্ধি বাৎলালো। করাত দিয়ে তারা সেতুর কাঠগুলিকে এমন ভাবে কেটে রাখলো যাতে সেতুর ওপরে মালবোঝাই জাপানী ট্রাকগুলি এলেই ভেঙে নীচে পড়ে।

জাপানী ট্রাক আসছে, শব্দ শোনা যেতে লাগলো। গেরিলাদলের অধিনায়ক আদেশ করলেন, প্রথম ট্রাকখানিকে লক্ষ্য করে মেশিনগান দাগতে। তাই করা হলো। প্রথম ট্রাকের চালক ও তার একজন সঙ্গী গুলীতে প্রাণ হারালো। ফলে ট্রাকটি রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ালো এবং তার পেছনে তিনখানি ট্রাক থেমে যেতে বাধ্য হলো। জাপানীরা মেশিনগান দাগতে সুরু করলো, কিন্তু গেরিলাদের তারা কোথাও দেখতে পেলনা। আধ ঘণ্টার মতো লড়াই চললো। জাপানীরা অবশেষে রণে ক্ষান্ত দিয়ে মালবোঝাই ট্রাকগুলি ফেলে রেখে সরে পড়লো। সমস্ত সরবরাহই গেরিলাদের হস্তগত হলো। তারা প্রায় দশ টন টিনেভরা খাদ্য, পাঁচ হাজার গুলী, প্রায় একশ' হাণ্ড-গ্রেনেড (হাতবোমা) ছত্রিশটি রাইফেল, অনেক যন্ত্রপাতি, দু'ডজন আনকোরা ওভার-কোট, প্রায় চল্লিশ জোড়া লম্বা বুট, দেড়শ' গ্যালন গ্যাসোলিন, পাঁচ গ্যালন আইওডিন, ব্যাণ্ডেজের অনেক তুলা এবং পাঁচশ' গুলী সমেত একটি লাইট মেশিনগান পেল। প্রায় ত্রিশ জন জাপানী নিহত হয়েছিল। তাদের কাপড়জামা, রাইফেল এবং গুলী-গোলাও গেরিলারা নিয়ে নিল। গ্যাসোলিন দিয়ে ট্রাকগুলিতে তারা আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর সূর্যোদয়ের আগেই তারা নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এল। এই যুদ্ধে গেরিলা পক্ষের মাত্র দু'জন মারা গেল।

তার চারপাচ দিন বাদেই আবার আর একটি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে উক্ত গেরিলা বাহিনীর প্রায় সকলেই যোগ দেয়। সামচুন স্টেশনে দু'টি জাপানী কোম্পানী কাওলুন-ক্যাণ্টন রেলপথ পাহারা দিচ্ছিল। ট্রেনে

করে সরবরাহ এসে পৌঁচেছে খবর পেয়ে একদিন মধ্যরাত্রে গেরিলারা সেই স্টেশনে হানা দেয়। কিন্তু তারা গিয়ে দেখে তাদের যাবার আগেই ট্রেনগুলি স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। ট্রেনের সরবরাহ না পেলেও গেরিলারা স্টেশনটি দখল করে নেয়। তাদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে জাপানীরা স্টেশন ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র ও রসদ গেরিলারা হস্তগত করে। এই যুদ্ধে প্রায় একশ' জাপানী নিহত হয়। গেরিলাদের পাঁচজন মারা যায় এবং জন পঞ্চাশেক আহত হয়।

গেরিলারা জাপানীদেরই কাছ থেকে পাওয়া মাইন দিয়ে সামচুন সেতু বিধ্বস্ত করে, জাপানীদের বাসস্থল পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের সমস্ত চলাচলপথ ধ্বংস করে ফেলে। পরদিন ছ'সাতটি জাপানী বোমারু বিমান এসে সামচুনে প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করে। গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে জাপানীরা আরো সৈন্য বাড়ায়। প্রায় এক সপ্তাহ কাল প্রত্যহ জাপানী বোমারু বিমান গেরিলাদের ঘাঁটিতে হানা দেয়। একদিন একখানি জাপানী বিমান নিম্নাকাশে এলে গেরিলারা গুলী করে সেইখানিকে ভূপাতিত করে।

ইতিমধ্যে গেরিলাদের সংখ্যা বেড়ে হাজার থেকে তেরশ হয়। তারা শস্যাদি উৎপাদন, বোমাবিধ্বস্ত এলাকায় ধ্বংসস্তূপ অপসারণ ও পুনরায় গৃহনির্মাণ, জনশিক্ষা, নাটকের সাহায্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার এবং হংকং যাবার একমাত্র পথ সার ইউ চুং সমুদ্রতটে পাহারা দেবার জন্যে বিভিন্ন দল গঠন করে। অভিনয় করবার জন্যে যে দলটি গঠিত হয় তার সকলেই ছিল নারী।

এখানে সার ইউ চুং সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। এই পথেই স্বাধীন চীন থেকে টাংস্টেন ও তেল হংকংএ নিয়ে চোরা কারবার করা হতো। প্রায় একমাস কাল হাজার হাজার লোক এই চোরা কারবার চালায়। হংকংএ নিয়ে তারা সেখানকার চীনা চোরা কারবারীদের কাছে মাল

বেচতো। তারা আবার জাপানীদের কাছে তা বেচে দিত। এখানে বলা দরকার, টাংস্টেন বিমান নির্মাণের কাজে লাগে।

তারপর কোয়াংতুং প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটী স্থাপন করে জনসাধারণকে জানায় যে, সরকারী প্রয়োজনেই ঐ সব মাল কেনা হবে। লোক তখন দাম কম পেয়েও সেই কমিটীর কাছেই মাল বেচতে চায়। কিন্তু কমিটির বডকর্তা হোর পিং কোয়ং বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই সব মাল জাপানীদের সঙ্গে চোরা কারবারে লিপ্ত হংকংএর চীনা ব্যবসায়ীদের কাছে বেচতে আরম্ভ করেন। সার ইউ চুং-এর পথেই সেইসব মাল চালান দেওয়া হতো। গেরিলারা যখন তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করে তখন তাদের বলা হয় যে, অস্ত্রের বিনিময়ে বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছেই সেই সব মাল বিক্রী করা হয়। গেরিলারা তখন মাল চালান হতে দেয়; কিন্তু কিছুদিন বাদেই গেরিলারা অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে, কুওমিণ্টাং দলের বড বড আমলারা হংকংএ এই সব মাল নিয়ে চোরা কারবার চালাচ্ছেন এবং মালগুলি জাপানী জাহাজেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। গেরিলারা তখন চোরা কারবার বন্ধ করবার ব্যবস্থা করে। সার ইউ চুং-এ টহল দিয়ে তারা চোরাই মাল হাত করে কমিটীর কাছে পাঠাতে থাকে। গোড়ার দিকে কমিটীর বড়কর্তা হোর পিং কোয়ং অবশ্য গেরিলাদের কাজের প্রশংসা করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার ইউ চুং থেকে মাল পাঠাতে কেউ যাতে বাধা না দিতে পারে তার জন্যে তিনি সশস্ত্র বাহিনী পাঠান এবং গেরিলাদের তিনি তখনো একথাই বোঝাতে চান যে, চীনা গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা ও বৃটেনের সঙ্গেই এই সব মাল দিয়ে বাণিজ্য করছে। এটা যে ধাপ্পা গেরিলারা তা বুঝতে পারে; তাই তারা মাল চালান বন্ধ করবার চেষ্টা করে। সরকারী বাহিনী তখন গেরিলাদের ওপর আক্রমণ চালায়। গেরিলাদের শক্তি বেশি ছিল। সরকারী বাহিনীকে

পরাজিত করে তারা মালগুলি দখল করলো। কমিটীর বড়কর্তা গেরিলাদলের অধিনায়ককে ডেকে পাঠালেন। তিনি নিজে না গিয়ে সহকারী নায়ক চ্যাং পাক-মিংকে পাঠালেন। কমিটীর বড়কর্তা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে *ার কুওমিণ্টাং দলে যোগ দেওয়াই উচিত। চ্যাং তাতে অস্বীকৃত হলে বড়কর্তা বললেন, "কুওমিণ্টাং দলে তুমি যোগ দিতে চাইছ না, অর্থাৎ তুমি একজন কম্যুনিস্ট!"

উত্তরে চ্যাং বললেন, "আমি কম্যুনিস্ট নই বা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সংশ্রব নেই। আমি চাই চীনের জনযুদ্ধে, জাপানের বিরুদ্ধে চীনা জাতির যুদ্ধে, জয়লাভ করতে।"

চ্যাং পাক-মিংকে কোন ভাবেই হাত করতে না পেরে বন্দী করা হয়। কিন্তু তিনি কৌশলে প্রহরীকে বশ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং পিংশানে ফিরে যান। হোর পিং-কোয়ং পিংশানের জনসাধারণকে আদেশ দেন যাতে তারা গেরিলাদের সাহায্য না করে, কেননা গেরিলারা কম্যুনিস্ট। তিনি গ্রামবাসীদের এই বলে শাসান যে, তাঁর আদেশ প্রতিপালিত না হলে সৈন্য পাঠিয়ে তিনি সেই গ্রামকে ছারখার করে দেবেন। গ্রামবাসীরা তাঁর আদেশ শুনলো না, আগের মতই তারা গেরিলাদের সাহায্য করতে লাগলো। গ্রামের প্রধান এক বৃদ্ধ হোর পিং-কোয়ং-এর লোককে বলে দিল, "আমার বয়েস ৭০ বছর। সারাজীবন আমি গুরু করভার বহন করে এসেছি। এই গেরিলাদল এসে আমাদের করভার থেকে মুক্ত করেছে। আমরা আজ খেয়ে-পরে ভালই আছি। গেরিলারা আমাদের কাছ থেকে যা নেয় তারা তা আমাদের ফিরিয়ে দেয়; কিন্তু সরকারী (কুওমিণ্টাং) সৈন্যরা যখন আমাদের গ্রামে ছিল তখন তারা আমাদের কাছ থেকে কেবলই নিত, কিছু দিত না। আমরা এখন নিজেরাই নিজেদের শাসক নির্বাচনের অধিকার পেয়েছি এবং গ্রামবাসীরাই তাদের নির্বাচন করে থাকি।"

তার দু'দিন পর সরকার পক্ষ থেকে লোর কুওন নামক একজন সেনানী এবং তার অধীনে একদল সৈন্যকে পাঠিয়ে বলা হয় যে, গেরিলারা তাদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করুক এবং তাদের আদেশ মতো চলুক ; তা না হলে তারা গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। লোর কুওন এবং তার সৈন্যরা আগে দস্যুতা করে বেড়াত ; তারপর চীন-জাপান যুদ্ধ বাধলে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার অছিলায় তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেত এবং গ্রামবাসীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করতো। অথচ সমস্ত জেনেশুনেও কুওমিণ্টাং দল এদের সমর্থন করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হয়নি।

গেরিলারা লোর কুওনের আদেশ মেনে চলতে অস্বীকার করলে তার দলের লোক গেরিলাদের আক্রমণ করে বসে। ফলে উভয় পক্ষে অনেক লোক নিহত হয় ; তবে কুওনের প্রায় একশ' লোক গেরিলাদের হাতে বন্দী হয় এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং সরবরাহও তাদের হাতে পড়ে। ফলে সংঘর্ষ হ্রাস পায়। গেরিলারা বন্দীদের লোর কুওনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে জানায় যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই হয় এটা তারা চায় না— দেশের সকলের যারা শত্রু অর্থাৎ জাপানীদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে সংগ্রাম করাই সবার উচিত।

এর এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ৬ই মার্চ ইয়াং মুন-এর অধিনায়কত্বে কেন্দ্রীয় আর্মির দু' ডিভিসন সৈন্য গেরিলাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। গেরিলারাও এ জন্যে প্রস্তুত না ছিল এমন নয়। ভোর পাঁচটার সময় এক ডিভিসন সৈন্য গেরিলাদের ঘেরাও করে এবং শ্বেত পতাকা নিয়ে দু'জন লোক গেরিলা-শিবিরে এসে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলে। গেরিলাদলের অধিনায়ক জানান যে, তাদের এই দাবী অসঙ্গত, কেননা গেরিলারা দেশরক্ষার জন্যেই যুদ্ধ করছে। সরকারী দলের প্রতিনিধি বলে গেলেন যে, তাঁরা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবেন। তার মধ্যে তাঁদের আদেশানুযায়ী কাজ না হলে সরকারী সৈন্যরা

গেরিলাদের ওপর গুলী চালাবে। গেরিলাদলের অধিনায়ক আদেশ করলেন যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এর প্রতিরোধ করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে গেরিলাদের ওপর কামানের গোলা বর্ষণ হতে লাগলো। আধঘণ্টাকাল গুলীগোলার বৃষ্টি হলো। ইতিমধ্যে তারা গেরিলাদের নিকট এগিয়ে এল। এবার গেরিলারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো। তারা মাইন বিদীর্ণ করে শ' শ' সরকারী সৈন্যকে ধরাশায়ী করলো। গেরিলারা তারপর চালালো গুলীগোলা। সরকারী সৈন্যরা আবার কিছুটা পশ্চাতে সরে যেতে বাধ্য হলো। গেরিলারা তখন পুনরায় মাইন পেতে তাদের প্রথম আত্মরক্ষাব্যূহ দৃঢ় করে নিল এবং তারা সেখানে এগিয়ে গেল। অর্ধেক দিন যুদ্ধের পর সরকারী সৈন্যরা আবার অগ্রসর হলো এবং জোর গোলাগুলী বর্ষণ করতে লাগলো। গেরিলারা আবার হটে গিয়ে তাদের মাইনগুলিকে বিস্ফুরিত করলো। তার ফলে আরো কয়েক শ' সরকারী সৈন্য মারা গেল। গেরিলারা তখন প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, আর বেশিক্ষণ বেষ্টনের মধ্যে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হলো না। নিরুপায় হয়ে বিকেল চারটায় গেরিলাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে সাদা নিশান হাতে লোক সরকারী সৈন্যের শিবিরে গেল। সেখানে গেরিলাদের প্রতিনিধি বোঝাবার চেষ্টা করলেন যাতে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি না করে সকলে সমবেতভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু সরকারী পক্ষ থেকে গেরিলাদের বিনাসর্তে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হয়। গেরিলারা তাতে অস্বীকৃত হয় এবং আবার যুদ্ধ বাধে। গেরিলারা চারদিকেই প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে থাকে; কিন্তু সরকারী সৈন্যরা ক্রমশই এগিয়ে আসতে আরম্ভ করে। অকস্মাৎ গেরিলারা প্রথম রক্ষাব্যূহ ছেড়ে দ্বিতীয় রক্ষব্যূহে চলে আসে এবং

চারদিকে ধূমোৎপাদক মাইন ফাটিয়ে গাঢ় ধূমজালের সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে নারী গেরিলা বাহিনী জাতীয় রণসঙ্গীত গেয়ে সকলকে সংগ্রামের জন্যে অনুপ্রাণিত করে তোলে। তাদের ব্যাটেলিয়ন ধূমজালের অন্তরালে পুরুষ গেরিলা সৈন্যদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। এই নারী গেরিলা ব্যাটেলিয়নে বড় বড় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। নারী পুরুষ একত্র হয়ে সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম শুরু করে। অবশেষে তারা প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে পার্বত্য এলাকায় চলে যেতে সক্ষম হয়। সরকারী সৈন্যরা তখন গ্রামে প্রবেশ করে সমগ্র গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই যুদ্ধে গেরিলাদের প্রায় শ'দুয়েক লোক নিহত এবং শ'চারেক লোক আহত হয়। তাদের ত্রিশজন সুশিক্ষিতা নার্স এবং বিশজন ছাত্রী প্রাণ হারায়। কিন্তু একজন গেরিলাও প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হয়নি। গেরিলাদলের চারজন লোক চারদিন পর্যন্ত সেই গ্রামে একটি গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তারপর তারা হংকংএ অতিকষ্টে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা শুনতে পায় যে, তাদের গেরিলা বাহিনী শ' শ' মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে ক্যাণ্টনের একশ' মাইল পূবে হয়লুক-ফং নামক স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

এর প্রায় এক বছর পরে এই গেরিলাদলের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে পনের হাজারে পরিণত হয়। তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং অনেক এলাকা মুক্ত করে; কিন্তু কুওমিণ্টাং দল তখনো পর্যন্ত তাদের সন্ধান করেই চলে।

কেবল এই একটিই নয়, চীনের বহু গেরিলাদলকেই এভাবে একদিকে গৃহশত্রু এবং অপর দিকে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। এই একটিমাত্র গেরিলাদলের ইতিহাসই স্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে, দেশের মুক্তিসংগ্রামে চীনের জনসাধারণকে কি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

গেরিলা মা

এবার চীনের এক গেরিলা মায়ের জীবন-কাহিনী বলেই এই অধ্যায় শেষ করব।

এই বীরাঙ্গনা মহাচীনেব জনসাধারণের নিকট 'মামা মস্কুইটো' নামে সুপরিচিতা। তাঁর বয়েস প্রায় ৭০ বছর, নাম মাদাম চাও উ তাং।

১৯৩১ খৃস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে জাপ সৈন্যগণ মাদাম চাও-এর পল্লীভবনে প্রবেশ করে তাঁর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং তাঁর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে বিতাড়িত করে। এই সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন-যে, এই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম কবে পবিত্র মাতৃভূমিকে শত্রুকবল থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রথম দুই পুত্র এবং মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিয়ে চাঙ্গানসিয়েনে তিনি একটি শিবির স্থাপন করলেন। এক বান্ধবীর স্বামীর একটি পিস্তল চেয়ে নিয়ে তিনি গুলীচালনা শিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন এবং ক্রমে রাইফেল-চালনায় দক্ষতা অর্জন করলেন। এই বিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি গ্রামে গ্রামে গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করবার নিমিত্ত লোক অন্বেষণ করতে লাগলেন। কেউ এই বাহিনীতে যোগদান করতে স্বীকৃত হলো না। কারণ জনসাধারণ প্রথমেই এই বৃদ্ধাকে উপহাস করে বলতে লাগলো, "তুমি বুড়ী, যুদ্ধের কি জান? তোমার ও সব পাগলামীতে কাজ হবে না। তোমার বুদ্ধিতে গেলে ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনা হবে।" কিন্তু এই নৈরাশ্যকর মন্তব্যে তিনি আশা পরিত্যাগ করলেন না। একদিন রাত্রিকালে উত্তর শানসি প্রদেশে একটি ক্ষুদ্র শহরে মুষ্টিমেয় শ্রমিক এবং কৃষকদের ক্ষুদ্র সভায় তাঁর গেরিলা-রণনীতি তিনি বিশ্লেষণ করলেন এবং সভান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করলেন; কিন্তু কেউ স্বীকৃত হলো না। প্রায় সকলেই তাঁকে সমস্বরে বাতুল বলে উপহাস করছে—এমন সময় একজন বলিষ্ঠ

কৃষক যুবা উঠে তাঁকে প্রশ্ন করলো, "আমার এই বজ্রমুষ্টি এবং লৌহময়দেহ আপনার কর্মে নিয়োগ করতে রাজী আছি যদি আপনি স্বয়ং আমাকে গেরিলাযুদ্ধ দেখাতে পারেন।" মাদাম চাও লক্ষ্য করলেন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কালক্ষেপ না করে প্রশ্ন করলেন, "নিকটে কোন শত্রু সৈন্যের ঘাঁটি আছে?" নিকটবর্তী একটি শত্রু সৈন্যের ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি আদেশ দিলেন, "তোমরা নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ কর। তোমাদের গেরিলাযুদ্ধ দেখিয়ে দেব।" শ্রমিক ও কৃষকগণ তাঁর নির্দেশমতো তাঁকে অনুসরণ করলো। শত্রু-ঘাঁটির নিকটে তিনি গিয়ে লক্ষ্য করলেন প্রথম প্রহরী প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। আপন বস্ত্রাঞ্চল থেকে পিস্তলটি বার করে প্রথম প্রহরীর প্রতি গুলী নিক্ষেপ করলেন। প্রথম প্রহরী ধরাশায়ী হলে দ্বিতীয় প্রহরীকে লক্ষ্য করলেন। দ্বিতীয় প্রহরীও পূর্ববৎ ধরাশায়ী হলো। তৃতীয় প্রহরী বেগতিক দেখে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো। তৎক্ষণাৎ মাদাম চাও আদেশ দিলেন, "শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পলায়ন কর।" তাঁর আদেশ পালন করতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না। তখন অবিশ্বাসী জনসাধারণ চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে তাঁর বাহিনীতে সোল্লাসে যোগদান করতে সম্মত হলো। তাঁর রোজ-নামচার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেই রাত্রে প্রায় চার শতাধিক লোক গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করেছিল।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে মাদাম চাও একটি বিষয়ে যথেষ্ট অভাব অনুভব করতে লাগলেন। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়েও কোন ফল হচ্ছে না দেখে তিনি একটি রাজনৈতিক বিদ্যালয় পরিচালনা করতে সংকল্প করলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। এই ছাত্রদের সাহায্যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে

তাদের ওপর রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। জনসাধারণের অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার মানসে তিনি দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনা-লাভ করে জন্মভূমি রক্ষার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠলো। সর্বত্রই একটি ধ্বনি উঠলো, "পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রু নির্মূল করতেই হবে।" রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ শত্রুকবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে লাগলো। সে বছর জুন মাসে অকস্মাৎ এক বিপদ উপস্থিত হল। পাঁচজন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক চীনা গুপ্তচরের সাহায্যে একশ' জাপ সৈন্য মাদাম চাওকে বন্দী করলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হল—জাপানীদের উৎখাত করবার নিমিত্ত তিনি একটি বিরাট ষড়যন্ত্র করছেন। সুতরাং তিনি দেশদ্রোহী। অন্যূন তিনমাস পরে তাঁর বিচার আরম্ভ হলো। বিচার দেখবার জন্যে আদালতকক্ষ জনসমাগমে পরিপূর্ণ—তিলধারণের স্থান নেই। বিচারক, সাক্ষী, পুলিশ, দর্শকবৃন্দ প্রভৃতি উদ্‌গ্রীব। এমন সময়ে পুলিশ-পাহারায় বেষ্টিত হয়ে এক বৃদ্ধা আসামীর কাঠগড়ায় উপনীত হলেন। উপস্থিত সকলেই আপন অন্তরে প্রশ্ন তুললো: এই বৃদ্ধা কি করে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব করতে পারে? এ নিশ্চয়ই মিথ্যা অভিযোগ। বিচারকের অন্তরেও এই প্রশ্ন উঠলো। তিনি আসামীকে লক্ষ্য করে বললেন, "এই অভিযোগ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?" আসামী কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "আমার মত বৃদ্ধার পক্ষে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব করা কি সম্ভব? এই দেখুন আমার শরীর—এই জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে কেউ কি যুদ্ধের কথা চিন্তাও করতে পারে?" বিচারকের পূর্ব থেকে সন্দেহ হয়েছিল। তিনি বললেন, "এই বৃদ্ধার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পূর্ব-পরিকল্পিত। সুতরাং আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হল।"

বিচারকের মন্তব্য শোনবামাত্র অভিযোগকারীরা মহাবিপদগ্রস্ত হলো। তারা বিচারককে বোঝাবার নিমিত্ত নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করলো, কিন্তু বিচারক তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসামীকে মুক্তি দিতে হলো। মাদাম চাও মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে আপন শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে সমগ্র বৃত্তান্ত সহযোগিদের নিকট বিবৃত করলেন। জনসাধারণ পুনরায় তাঁর অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে দলে দলে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিল। ঐ দিন রাত্রিকালে মাদাম চাও তাঁর দলবলসহ জাপ-সৈন্য ব্যারাকের তলে বোমা লুকিয়ে রেখে ব্যারাকটি বিধ্বস্ত করলেন এবং এই সুযোগে শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ একখানি ট্রেন অতর্কিতে আক্রমণ করে আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করে পলায়ন করলেন। এই কাজ কে করেছে তা জাপ-সৈন্য-বিভাগের অজ্ঞাত রইল না। এর কয়েক দিন পরে জাপ-সেনাধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন, "জীবিত অথবা মৃতাবস্থায় যে কেউ মাদাম চাওকে বন্দী করে আনতে পারবে তাকে পঞ্চাশ হাজার ইয়েন (জাপানী মুদ্রা) পুরস্কার দেওয়া হবে।" দাবানলের ন্যায় মাদাম চাও-এর নাম পুনরায় মহাচীনে ছড়িয়ে পড়লো।

মাদাম চাও-এর নাম শোনবামাত্র জাপ-সৈন্যের হৃদকম্প উপস্থিত হয়। প্রত্যেক জাপ-সৈন্যের নিকট মাদাম চাও এবং তাঁর পুত্রদ্বয়ের ফটো থাকে। কে জানে—কখন আবার মাদাম চাও আক্রমণ করে বসে। জাপ সৈন্যগণ মহাচীনের কোন গ্রামে সহসা সাহস করে প্রবেশ করতে পারতো না। সর্বত্রই মাদাম চাও-এর অনুচর আছে এবং তারা প্রতিশোধ নিতে পারে—এই আশঙ্কা জাপ সৈন্যদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সর্বত্র মাদাম-চাও-ভীতি। কোন চীনা রমণী দৃষ্টিপথে পড়লেই জাপ-সৈন্যগণ মাদাম চাও-এর ফটো বের করে তা পরীক্ষা করে দেখতো। এত চেষ্টা সত্ত্বেও জাপ-সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করতে

পারলো না। এই অপারগতার জন্যে মাদাম চাও-ভীতি তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে ওঠে। জাপানী গুপ্তচরের চক্ষে ধূলি দিয়ে মাদাম চাও অন্তত দশবার বার পিপিংএ প্রবেশ করেন। তিয়েনসিয়েনের পথে যে অন্ধ সব্‌জীওয়ালীকে দেখা গেল, তিনি যে এক বিরাট গেরিলা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাত্রী এবং অধিনায়িকা জাপানী গুপ্তচর জানতে পারলো না। . এইভাবে তিনি জাপানীদের সর্বনাশ সাধন করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর ফটো থাকা সত্ত্বেও জাপানীরা তাঁকে চিনতে পারেনি কেন? মাদাম চাও শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে যখন প্রবেশ করতেন তখন তিনি বহুরূপীর বেশে যেতেন। এমনভাবে বেশবিন্যাস করতেন যে, তাঁর নিকটতম অনুচরবর্গের পক্ষেও তাঁকে চেনা কঠিন হতো। স্বাভাবিক অবস্থায় তার পরিচ্ছদ ছিল একটি পাজামা এবং সঙ্গে থাকতো একটি অটোমেটিক রাইফেল। জাপানীরা তাঁর স্বাভাবিক অবস্থার ফটো পেয়েছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় তিনি কখনো খঞ্জ—কখনো অন্ধ—কখনো সব্‌জীওয়ালী—আবার কখনো ভিখারিণী বেশে বিচরণ করতেন; তাকে চিনবার সাধ্য ছিল না।

তাঁর গেরিলা বাহিনী ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত জাপানীদের কত ক্ষতি করেছিল নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া গেল :—

নিহত জাপ সৈন্য ৫০০০, হস্তগত জাপানী রাইফেল ৬০০০, মেশিনগান ১৫০, গোলাগুলী ১০০০০। এই দ্রব্যগুলি হস্তগত করতে নিহত হয়েছিল ৭ শত গেরিলা যোদ্ধা।

তাঁর গেরিলা বাহিনীতে ৪০০০০ গেরিলা যোদ্ধার হিসেব পাওয়া যায়। সেই বাহিনীতে তাঁর স্বামী, চার পুত্র এবং একমাত্র কন্যা লিজেমুও ছিল।

ব্রহ্মদেশ

১৯৪২ খৃস্টাব্দে জাপানীরা যখন ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে তখন সেখানকার অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীই জাপানীদের সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। একমাত্র ব্রহ্মের কম্যুনিস্টরাই তখন জাপানীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে ব্রহ্মবাসীদের আহ্বান করেছিল; কিন্তু বর্মী কম্যুনিস্টদের সংখ্যা ছিল তখন মুষ্টিমেয়। তাদের কথায় সেদিন কেউ তেমন কর্ণপাত করেনি। ব্রহ্মের জনসাধারণের সঙ্গে বৃটিশ পক্ষেরও কোন যোগাযোগ ছিল না। ফলে বৃটিশ সৈন্যদের ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং ব্রহ্মদেশ জাপানীদের দখলে যায়। দেশ জাপানীদের দখলে গেলে পর ব্রহ্মের কোন কোন জাতীয়তাবাদী বুঝতে পারেন যে, ব্রহ্মে জাপানীদের আগমনের ফলে দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব মিলেছে, ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা পায়নি। জাপ-শাসনের স্বরূপ যতই প্রকট হতে থাকে জাপানীদের প্রতি ব্রহ্মবাসীদের বিতৃষ্ণা ততই তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রহ্মের কম্যুনিস্টরা তখন জাপানীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা ক্রমশ ফলবতী হয় এবং ব্রহ্মে স্বদেশপ্রেমিক দলের সভ্যসংখ্যা গিয়ে প্রায় দু'লক্ষে দাঁড়ায়। এছাড়া বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী বৃটিশ বাহিনীর সাহায্যে ব্রহ্মদেশ থেকে জাপানীদের বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রহ্মে যে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, পরাধীন দেশের ইতিহাসে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জাপানীরা যখন ব্রহ্ম অভিযান করে তখন ব্রহ্মের আইনসভায় উ স'র মিয়োচিট (জাতীয়তাবাদী) দল এবং বা ম'র সিনিয়েথা (দরিদ্র প্রজা) দলের প্রাধান্য ছিল। উ স' এবং বা ম' উভয়েই স্বতন্ত্র ভাবে চেষ্টা করছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব জাপানীদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে

নিতে। ব্রহ্মে জাপ-অভিযানের প্রাক্কালে উ স' ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বৃটেনে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন যাতে মিঃ চার্চিল ব্রহ্মদেশকে ঔপনিবেশিক মর্যাদা দেন। কিন্তু তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে পথিমধ্যে আটক করা হয়। রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করার অপরাধে বা ম' তখন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। মোভাক জেল থেকে তিনি শান রাজ্যে পালিয়ে যান এবং মান্দালয় জাপ-দখলে আসবার পর তিনি ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্রহ্মে জাপানীদের সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করে দোবামা আসিয়াওন দলের একটি শাখা। এই দলটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি দল কম্যুনিস্টপন্থী হয়ে যায় এবং আর একটি দল আউং সানের নেতৃত্বে জাপ-পক্ষ অবলম্বন করে। আউং সান টোকিওতে চলে গিয়ে জাপানী গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং অর্থ ও অস্ত্রসাহায্য পেয়ে দেশে ফিরে এসে জাতীয় বিপ্লবী দল ও তার অধীনে 'ব্রহ্ম স্বাধীনতা বাহিনী' গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ছাত্র এবং দোবামা দলের সভ্য। ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যেই তারা এই দলে যোগ দিয়েছিল। কিছুদিন বাদে আউং সানের মত পরিবর্তিত হয়। তিনি কম্যুনিস্ট দলে যোগ দেন এবং জাপ-বিরোধী বর্মী জনসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কাহিনী পরে বলবো।

আগেই বলেছি ব্রহ্মে গোড়া থেকেই কম্যুনিস্টরা জাপানীদের বিরোধিতা করবার কথা বলে আসছিল। বর্মী কম্যুনিস্ট দলের নেতা ছিলেন থাকিন স্থ। বৃটিশ আমলাতন্ত্রীরা থাকিন স্থ, থান তুন্, এইচ, এন, ঘোষাল এবং আরো কয়েকজন কম্যুনিস্ট নেতাকে জেলে পুরে রেখেছিল। জেল থেকেই তাঁরা এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন যে, জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ব্রহ্মের স্বাধীনতা আসবে না, তাদের

বিরোধিতা করেই আসবে। এ সত্ত্বেও বৃটিশ আমলাতন্ত্রীরা কম্যুনিস্ট নেতাদের মুক্তি দিল না ; এমন কি যে-সব শহরে কম্যুনিস্ট নেতারা বন্দীশালায় আটক ছিলেন সেই সব শহর ছেড়ে চলে আসবার সময়ও বৃটিশ কর্তারা কম্যুনিস্টদের মুক্তি দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। মান্দালয় জেলের ফটক ভেঙ্গে থাকিন স্থ এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতা বেরিয়ে পড়েন এবং গুপ্ত অবস্থায় থেকে জাপ-বিরোধী আন্দোলন চালাতে থাকেন। জাপানীদের বোমায় কাথা জেলের প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। ব্রহ্মের বাঙ্গালী কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড ঘোষাল এবং আরো কয়েকজন কম্যুনিস্ট সেই জেল থেকে তখন বেরিয়ে পড়েন।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে মার্শাল চিয়াংএর ব্যক্তিগত দূত জেনারেল পি এস ওয়াং চীন থেকে ব্রহ্মে আসেন এবং থাকিন স্থ, থান তুন এবং স্থর সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা চালান। থাকিন স্থ প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে বর্মা গবর্ণমেণ্টের নিকটও প্রস্তাব করেছিলেন ; কিন্তু ডরম্যান স্মিথের গবর্ণমেণ্টের অন্ধ আমলারা তখন স্থর কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন কি বর্মা ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর মিঃ যুপ যখন থাকিন স্থর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন তখন তাঁকে পর্যন্ত বর্মা গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাতের অনুমতি দেননি।

জাপানীরা ব্রহ্মে প্রবেশ করে সেখানকার সকল দলের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে বা ম, উ বা পে, থীংলা পে, বা সীন প্রভৃতি বিশজন নেতার এক সম্মেলন জেনারেল আইডা আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে বা ম'কে প্রধানমন্ত্রী করে এক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। যে-সব থাকিন জাপানীদের সাহায্য করেছিল তাঁদের সঙ্গে বা ম'র পঞ্চাশ পঞ্চাশ বখরা হয়।*

* দোবামা আসিয়াওন দলের নেতাদের থাকিন বলা হতো।

বা ম’ চাইলেন যাতে বর্মীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জাপ-সমর্থক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তিনি থাকিনদের সহায়তায় দোবামা সিনিয়েথা আসিয়াওন দল গঠন করলেন এবং তিনি তার নেতা ও থাকিন নু দলের জেনারেল সেক্রেটারি হলেন। স্লোগান দেওয়া হলো, “এক রক্ত, এক বাক্য, এক নেতৃত্ব।” ওপর দিক থেকে মনোনীত ক’রে সব দলের নেতা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। আইন করে একমাত্র এই দলকেই বৈধ রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করা হলো। বর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হলো, তারা একটি সৈন্যদল পাবে, ভারতীয় চেট্টিয়ারদের নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করা জমি কিষাণদের পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, বর্মী ছাত্রদের যন্ত্রশিল্পে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং এ ধরণের আরো কত কি। এই স্লোগান দেওয়ায় দলের সভ্যসংখ্যা তিন মাসে প্রায় দু’লক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো।

থাকিনদের মধ্যে যারা জাপ-বিরোধী ছিলেন তাঁরা দেখলেন যে, বা ম’র ফতোয়া অনুযায়ী অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রাখা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা এই স্লোগান দিয়ে বর্মী যুবশক্তিকে সংহত করতে চেষ্টিত হলেন, “দেশপ্রেমের দ্বারা আত্মরক্ষার জন্যে বর্মার যুবশক্তি সংঘবদ্ধ হও।” এর দ্বারা কার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে ঠিক বোঝা না যাওয়ায় সকলেরই এটা মনঃপূত হলো। জাপানীরা মনে করলো বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে গড়ে তোলবার এটা চমৎকার উপায়। বা ম’ মনে করলেন এর ফলে তাঁরই দলের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। বা ম’র মারফৎ জাপানীরা এই আন্দোলনের জন্যে ৬০ হাজার টাকা দিল। স্লোগানে কাজ হলো, যুবকরা সাড়া দিল, এক বছরের মধ্যে দলের সভ্যসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার হলো। বহু তরুণীও এসে এই দলে যোগ দিল। জাপ-বিরোধী থাকিন নামে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁরা কার্যত ছিলেন কম্যুনিস্ট। এই যুব-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই

তাঁরা জাপ-বিরোধী প্রচারকার্য চালালেন এবং ব্রহ্মরক্ষী বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। যে প্রতিষ্ঠান গঠনে জাপানীরা গোড়ার দিকে অর্থসাহায্য করেছিল সেটাই ক্রমশ এক শক্তিশালী জাপ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। জনসেবা ক'রে যুবকযুবতীরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলো। কম্যুনিস্ট মেয়েরা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মের নারীসমাজকে সংগঠিত করতে লাগলো।

আগেই বলেছি যে অনেকে ব্রহ্ম স্বাধীনতা বাহিনীতে এই আশায় যোগ দিয়েছিল যে, তারা জাপানীদের সাহায্যে বৃটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা পাবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদেব সে ধারণা ভেঙ্গে গেল। তারা দেখতে পেল, জাপানীদের ডেকে এনে বৃটিশদের তাড়ানো যতটা সহজ, জাপানীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া ততটা সহজ নয়। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হলেও তাদের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার প্রেরণা; তাই তাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে বেশি দেরি হলো না। কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে এসে সেনানায়কগণ তাঁদের নীতির পরিবর্তন করলেন এবং সৈন্যদলের নাম পাল্টিয়ে তার নাম দিলেন বর্মা রক্ষী বাহিনী। থাকিন সু নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বর্মা রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ও দেশরক্ষা সচিব আউং সানের সঙ্গে দেখা করলেন এবং দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে জগতের পরিবর্তনের কথা বোঝালেন। আউং সানের অন্তরে ছিল স্বদেশপ্রেমের বহ্নি; কাজেই সম্পূর্ণরূপে একমত হতে না পারলেও তিনি থাকিন সুর মত খানিকটা মেনে নিলেন। তিনি জাপানীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না করলেও তাঁর বাহিনী যাতে জাপানীদের হাতের পুতুলে পরিণত না হয় তার জন্যে স্বাধীনতার বাণী তাদের মধ্যে বেশি ক'রে প্রচার করতে লাগলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদলকে গোপনে এক আদেশ দিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত বর্মা রক্ষী বাহিনীর কোন লোক

যেন জাপানী সৈন্যদের দ্বারা দেহতল্লাস হ'তে না দেয়।" স্বদেশপ্রেম, শৃংখলা, নির্ভীকতা ও নিয়মানুবর্তিতায় বর্মা রক্ষী বাহিনী আদর্শ স্থানীয় হয়ে ওঠে। এখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। বর্মা রক্ষী বাহিনীর মান্দালয় হেডকোয়ার্টার্স থেকে কাথা জেলায় কোন সামরিক কার্যোপলক্ষ্যে একজন অফিসার ও তাঁর সঙ্গে একজন সাধারণ সৈন্যকে পাঠানো হয়। অফিসারটি ছিলেন বদমায়েস প্রকৃতির লোক। তিনি সেখানকার লোকজনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করেন। এতে সৈনিকটি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়। অবশেষে একদিন অফিসারটি ডাকাতির প্রস্তাব করেন এবং সৈনিকটিকে তাতে যোগ দিতে বলেন। সৈনিকটি তাতে চটে গিয়ে অফিসারকে গুলী ক'রে মেরে ফেলে। জাপানী সামরিক পুলিশ তখন সৈনিকটিকে গ্রেপ্তার ক'রে এবং খবর জানবার জন্যে তার ওপর নির্যাতন চালায়। সে সব কথা চেপে গিয়ে কেবল বলে যে, অফিসারটি দৈবাৎ মারা গিয়েছেন। জাপানীরা তখন তাকে আবার তার সৈন্যদলে পাঠিয়ে দেয়। সে ফিরে গেলে যখন তাকে জিগ্যেস করা হলো যে, জাপানীদের কাছে সে সত্য কথা প্রকাশ করলো না কেন, তখন সে উত্তর করলো, "বারে, আমি কি করে বলি! এতে জাপানীদের কাছে আমাদের সৈন্যদল ও দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো।"

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ব্রহ্মবাসীদের কর্তব্য, ব্রহ্মের শাসনপদ্ধতি, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার এবং ব্রহ্মের নারীসমাজ কর্তৃক জাপানীদের বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে বর্মা রক্ষী বাহিনীর সৈন্যদের নিকট বক্তৃতা দেওয়া হতো। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে খবর পাওয়া যায় যে, বর্মা রক্ষী বাহিনীতে ৫ হাজার বর্মী, ৩ হাজার তালঙ্গী, এক হাজার ক্যারেন, ৪০০ চিন, ২০০ ক'রে জারবাদিস ও শান, ১০০ ক'রে আরাকানী, কাচিন ও চীনা এবং ৫০ জন ভারতীয় আছে। সেই সময়

পর্যন্ত বর্মা রক্ষী বাহিনীর সশস্ত্র ১০ হাজার ও রিজার্ভ ১০ হাজার সৈন্যের হিসেব পাওয়া যায়। এই সৈন্যদলের শতকরা ১০ ভাগ উচ্চ শ্রেণীর, শতকরা ৪৫ ভাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং বাকী শতকরা ৪৫ ভাগ চাষী ও মজুর শ্রেণীর লোক।

এই দলের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ব্রহ্মের দেশরক্ষা সচিব আউং সানের অফিসে সেনানীদের যে সম্মেলন হয় তাতে তিনি বলতে বাধ্য হন, "কমরেডগণ, আমি জানতে পারলাম যে, কোন কোন অফিসার জাপানীদের বিরুদ্ধে আমাদের উত্থানের তারিখ নিরূপণের চেষ্টা করছেন। জাপ-বিরোধী মনোভাবের জন্যে আপনাদের আমি অভিনন্দিত করছি। কিন্তু অকালে যদি এই উত্থান হয় তবে আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। এই বিষয়ে আমি পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। কমরেডগণ, আপনাদের চিন্তার কারণ নেই। সময় উপস্থিত হ'লে আমি আপনাদের বলবো।"

কম্যুনিস্ট পার্টির তৎপরতা

বর্মী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা থাকিন স্থর বয়েস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। তিনি বেশ সুস্থ সবলদেহ। তিনি একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। তারপর তিনি বর্মা অয়েল কোম্পানীর রসায়ন বিভাগে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন ভালো রাসায়নিক হয়ে ওঠেন। তিনি বৌদ্ধ দর্শন পাঠ করেন এবং তারপর মার্ক্সীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। তিনি নয়বার মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' বই পড়েন। ব্রহ্মের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি তার সভ্যপদে আছেন এবং শ্রমিক ও কিষাণ আন্দোলনে কাজ করেছেন। তিনি একজন সুবক্তা।

১৯৪০ খৃস্টাব্দে বৃটিশ আমলাতন্ত্র তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। বন্দী অবস্থায় থেকেই তিনি বিশ্বসংগ্রামে এক বিরাট পরিবর্তনের কথা উপলব্ধি করেন এবং অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে একমত হয়ে এক বিবৃতিতে বলেন যে, সম্মিলিত জাতিবর্গের গণতান্ত্রিক জনসাধারণের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হলে এবং আক্রমণকারী জাপানীদের প্রতিরোধ করলেই বর্মীরা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে পারবে। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে তিনি মান্দালয়ে জেলের ফটক ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েন এবং গুপ্তভাবে থেকে জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

থাকিন স্থ কেবল পণ্ডিতই নন, তিনি একজন শিল্পীও বটে। একবার একটি বেহালা বাজনার প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পদক পান। ব্রহ্মে যে জাপ-বিরোধী জনস্বাধীনতা সংঘ (Anti-Fascist People's Freedom League) গঠিত হয় তিনি তার সর্বোচ্চ পরিষদের একজন সদস্য।

এর পরেই নাম করতে হয় থান তুনের। তিনি কঠোর পরিশ্রমী এবং থাকিন স্থর সহকর্মী। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কঠোর শ্রম, বাগ্মিতা ও স্থলেখনীর গুণে তিনি দোবামা আসিয়াওন দলে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন এবং একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। স্থর মতন তাঁরও জাগতিক পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ব্রহ্মদেশ জাপ-দখলে গেলে পর দলে প্রাধান্য থাকার দরুণ তিনি বা ম'র গবর্ণমেণ্টে কৃষিসচিবের পদ পান এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বৈধ ছিল যেমন দোবামা সিনিয়েথা পার্টি (বা ম'র ফাসিস্ত দল), পূর্ব এসিয়া যুব সংঘ প্রভৃতি দলের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ চালান। মন্ত্রিপদে থেকে তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কম্যুনিস্ট পার্টি ও জাপ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে নিয়োজিত করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় দেশের সর্বত্র জাপানীদের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি গোয়েন্দা দলের সৃষ্টি হয়। পরে

তিনি জাপ-বিরোধী জনস্বাধীনতা সংঘের সর্বোচ্চ পরিষদের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

কম্যুনিস্ট পার্টির দু'হাজার সভ্যের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই হলো পুরণো দোবামা আসিয়াওন দলের থাকিনগণ, শতকরা ৩০ জন কৃষাণ, শতকরা ১০ জন শ্রমিক এবং শতকরা ১০ জন নারী। কমিটীর ২২টি জেলা কেন্দ্র আছে। টেনাসেরিম ও পিয়াপনে যথাক্রমে ৫০০ ও ৪০০ সভ্য আছে। রেঙ্গুন ও থাটনে ২০০ ক'রে সভ্য রয়েচে। এছাড়া শান রাজ্যেও লোক কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছে। পার্টির সভ্যদের মধ্যে একদল সর্বসাধারণের মধ্যে গিয়ে মিশে কাজ করে। তারা পূর্ব এসিয়া যুব সংঘ, বর্মা রক্ষী বাহিনী, বর্মা ন্যাশনাল সার্ভিস, কিষাণ সভা, ক্রেতা সমবায় সংঘ, এ আর পি, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলে পর্যন্ত প্রবেশ ক'রে পার্টির প্রচারকার্য চালায়। কোন কোন কম্যুনিস্ট সরকারী পুলিশ অফিসারও হয় এবং কেউ কেউ সামরিক পুলিশের কাজেও ঢোকে।

পার্টিতে থেকে সর্বক্ষণের জন্যে কাজ করে দু'শ জন সভ্য। তাদের গুপ্তভাবে থেকে কাজ করতে হয় এবং পার্টির তহবিল থেকে তারা ভাতা পায়। পার্টিতে সর্বক্ষণের জন্যে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা জন ত্রিশেক। জাপানী ও সরকারী গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলি দিয়ে তারা গুপ্তভাবে তিন বছর কাজ চালিয়ে যায়।

গোড়ার দিকে কম্যুনিস্টরা সবাই থাকিন নামে পরিচিত ছিল; কারণ জাপানীরা আসবার আগে থাকিনদের দোবামা জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাদের ত্রিবর্ণ পতাকায় হাতুড়ি ও কাস্তে প্রতীক রূপে ব্যবহার করতো এবং 'বনওয়াড়া' অর্থাৎ কম্যুনিজম্‌কেই তারা দলের আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

ব্রহ্মে বৃটিশ শাসনের আমলে যারা ধনী ছিল জাপ শাসনের আমলে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়লো। প্রাচীন জমিদারদের অবস্থা খুব খারাপ

হয়ে দাঁড়ালো ; যানবাহনের অভাবে তাদের শস্য চালান দিয়ে বাজারে বিক্রী করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। জাপানীরা তাদের অসম্মান ক'রে চলতো। জাপানী একচেটে ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ে বর্মার কারখানার মালিক ও ছোটখাট পুঁজিপতিদের কাজকারবার বন্ধ হয়ে গেল। চাল ব্যবসায়ী সমিতি, কাষ্ঠ ব্যবসায়ী সমিতি, তেল ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে। পুরণো ধনিক শ্রেণীর শতকরা প্রায় ৫০ জনই কম্যুনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করে। তারা চাঁদা দেয়, কম্যুনিস্টদের আশ্রয় দান করে, জাপ-বিরোধী কর্মীদের আহার যোগায় এবং তাদের বাড়ীতে তারা জাপ-বিরোধী গুপ্ত বৈঠক করতে দেয়। প্রায় প্রত্যেক জেলা শহরেই তিন-চারটি ক'রে ধনিক পরিবার ছিল যারা কম্যুনিস্টদের নানাভাবে সাহায্য করতো। কম্যুনিস্টদের প্রতি বিদ্বেষ তারা পরিহার করেছিল ; কারণ তারা জানতো যে কম্যুনিস্টরা বর্মার স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক সৈনিক।

বর্মার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবী সবাই ক্রমশ জাপবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যেখানে বড় জোর দশ কোটি টাকার মুদ্রা-প্রচলন হতে পারে সেখানে জাপানীরা দু'শ' কোটি টাকার নোট ছড়িয়ে দেয়। তার ফলে বর্মায় অসম্ভব রকম মুদ্রাবাহুল্য হয় এবং জিনিসপত্র দুর্মূল্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধের ফলে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমে যায়। একদিকে দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস—অপর দিকে মুদ্রাবাহুল্য। এর ফলে জিনিসের দাম এত বাড়ে যে তা লোকের ক্রয়শক্তির বাইরে চলে যায়।* মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পড়ে। এর পর আবার বা ম' সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করেন। এই ক রে তিনি দেখাতে চান যে, তাঁর গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই দেশের শাসনকার্য চালাচ্ছেন। ফলে সরকারী কর্মচারীদের

* যুদ্ধের সময় মুদ্রাবাহুল্যের দরুণ ভারতেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অনেকেই আর জীবনযাত্রার মান রক্ষা করতে পারলো না। অনেক কেরানী চাকরি ছেড়ে সাইকেল-রিক্স চালাতে লাগলো। ফলে তাদের একটি বৃহৎ দল কম্যুনিস্টদের সমর্থক হয়ে উঠলো এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলো।

সরকারী কর্মচারীরা জাপানীদের যেমন ঘৃণা করতো তেমন বা ম'কেও ঘৃণার চক্ষেই দেখতো। বা ম' সিনর মুসোলিনীর ন্যায় বক্তৃতার একটা কায়দা করেছিলেন। রাস্তার দিকে বাড়ানো একটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন; কিন্তু লোক তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসত না। তিনি তখন এক ফতোয়া জারী করলেন যে, সরকারী কর্মচারীদের তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেই হবে। ফলে সরকারী কর্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে আরো ক্ষেপে উঠলো। অধিকাংশ জেলায়ই সরকারী কর্মচারীদের বেশির ভাগ, এমন কি ডেপুটি কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ পর্যন্ত কম্যুনিস্টদের সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো।

কম্যুনিস্ট পার্টির আহ্বানে ব্রহ্মের যেসব ছাত্র ও কিষাণ যুবক এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয় তারা বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বীরত্ব, নির্ভীকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। অনেকের ওপর জাপানীরা অমানুষিক অত্যাচার ক'রেও তাদের মুখ থেকে একটি কথা বের করতে পারেনি। উপস্থিতবুদ্ধির জোরে তারা অনেক সময় এমন সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে যে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নিম্নে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

সাগাইংএর কম্যুনিস্ট নেতা থেইন দানকে জাপানীরা আভা সেতুর ওপর হত্যা করে এবং তাঁর মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয়। হত্যার আগে কথা বের করবার জন্যে জাপানীরা তাঁর আঙুলের নখগুলি খুলে ফেলে, তাঁর ওপর গরম জল ঢেলে দেয় এবং এই ধরণের আরো সব অকথ্য

অত্যাচার করে ; কিন্তু নীরবে তিনি সব সহ্য করেন, একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরয়নি।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের অগাস্ট মাসে একদিন একজন জাপানী 'কিন্‌পি' (জাপ-গোয়েন্দা) বর্মা রক্ষী বাহিনীর হেডকোয়ার্টাসে এসে একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে বললো তার সঙ্গে অফিসে যেতে। লেফ্‌টেনাণ্ট ছিলেন কম্যুনিস্ট। তাঁকে মান্দালয়ে একটি বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো। কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যরা রণাঙ্গনে জাপানীদের যে-সমস্ত টেলিফোনের লাইন কেটে দিচ্ছিল উক্ত লেফ্‌টেনাণ্টিও তার মধ্যে জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করা হলো। জাপানীরা তাঁকে অসম্ভব রকম মারপিট করলো, কিন্তু তিনি কোন কথাই বললেন না। তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে লোহার শিকলে বেঁধে টানতে টানতে তাঁর সামনে আনা হলো। জাপানীরা বললো, "বলো, এই তার কাটার পিছনে কারা আছে। আমরা তা বন্ধ করব।" মারতে মারতে বৃদ্ধকে অজ্ঞান করে ফেলা হলো। ছেলের মুখে কোন কথা নেই। তারপর জাপানীরা একটি ডায়নামো এনে লেফ্‌টেনাণ্টের গায়ে তার জড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যে তাঁর ওপর অত্যাচার চালালো।

এভাবে উক্ত লেফ্‌টেনাণ্টের ওপর মাস খানেক অত্যাচার চললো। অনাহারে ও অত্যাচারে তার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু এত সত্বেও তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না। অবশেষে জাপানীরা নিরাশ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিল। তাঁর চেহারা দেখে দলের সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হলো, কিন্তু তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুনে গর্বে সবার বুক উঁচু হয়ে উঠলো।

তৌঙ্গু জেলার কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠক বাইশ বছরের যুবক বা হান একদিন একতাড়া বেআইনী কাগজপত্র ও একটি গুলীভরা রিভল্‌বার থলেতে ভরে তাঁর কাজের জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে একজন জাপ

সেনা তাঁকে থামিয়ে দেহতল্লাস করতে চায়। বা হান অত্যন্ত শান্ত ভাবে থলেটি একহাতে চেপে ধরে রিভল্‌বারটি দেখান এবং জাপ সৈন্যের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলেন, "আমি একজন কিন্‌পি" (অর্থাৎ জাপানীদের গুপ্তচর)। গুপ্তচর বলতেই জাপসৈন্যের মুখ শুকিয়ে চুণ হয়ে গেল এবং সে নত হয়ে বার কয়েক কুর্নিশ জানালো। বা হান তখন হেঁটে চলে গেলেন এবং নিশ্চিত মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পেলেন।

পূর্ব এসিয়া যুব সংঘে থেকে কাজ করতো কম্যুনিস্ট পার্টির এমন একজন বর্মী যুবক একদিন পার্টির অনেকগুলি বেআইনী কাগজপত্রসহ শোয়েগুতে ধরা পড়লো। একদল জাপ কিন্‌পি ইস্তাহারগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন বর্মী ভাষা বুঝত, কিন্তু পড়তে পারত না। তারা কম্যুনিস্ট যুবককে ইস্তাহারগুলি পড়ে শোনাতে আদেশ করলো। যুবক বললো যে সেগুলি পূর্ব এশিয়া যুব সংঘেরই ইস্তাহার। এই বলে সে চেঁচিয়ে পড়বার ভান করে বলতে লাগলো, "বদমাশ ইংরেজরা আবার বর্মা জয় করতে আসছে। বর্মার জনসাধারণকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে, ইংরেজদের বাধা দিতে হবে এবং জাপ ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলনের ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নতির পথকে প্রশস্ত রাখতে হবে।" জাপ গুপ্তচরেরা খুশি হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। যুবকটি বানানো কথাগুলি এমন জলের মতো বলে গিয়েছিল যে জাপানীরা সত্যি বিশ্বাস করেছিল সে ইস্তাহার থেকেই কথাগুলি পড়ে শোনাচ্ছে।

একদিন পার্টির দু'জন সভ্য কতকগুলি ইস্তাহার ও গেরিলাদের জন্যে একটি লাইট মেশিনগান নিয়ে তোয়াস্তে খাল দিয়ে একখানি নৌকায় করে রেঙ্গুনের দিকে যাচ্ছিল। একজন জাপানী প্রহরী তাদের থামিয়ে খানাতল্লাস করলো। জাপানী যখন একখানি ইস্তাহার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

দেখতে লাগলো তখন একজন কমরেড অতি সহজভাবে হাসতে হাসতে বললো, "দেখুন, এগুলি বিজ্ঞাপন।" সে হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে এমন একটা ভাব দেখালো যেন কাগজগুলিকে বেআইনী ইস্তাহার বলে সন্দেহ করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। জাপানীটি একটু হতভম্ব হয়ে গেল। আর একজন কমরেড মেশিনগানটি বের করে বললো, "জানেন, পথে আমাদের ডাকাতে ধরেছিল, তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে আমরা এই মেশিনগানটি হাত করেছি। আমরা এটাকে নিয়ে রেঙ্গুনে কিন্‌পিদের কাছে যাচ্ছি। তাঁরা নিশ্চয়ই এ দেখে খুশি হবেন।"

জাপ প্রহরীটি তাদের ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো, কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা ও চালচলনে সন্দেহজনক কিছু না দেখে ছেড়ে দিল। কমরেড দু'জন তখন আবার জলপথেই এগিয়ে চললো।

এই ধরণের ব্যক্তিগত সাহস ও বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত ইচ্ছে করলে আরো অনেকই দেওয়া যায়। কম্যুনিস্টদের দৃষ্টান্ত দেখে বহু অকম্যুনিস্টও এই ধরণের সাহসিকতাপূর্ণ কাজে অগ্রসর হয়। জাপানীরা বুঝতে পারে যে, ব্রহ্মে তাদের বিরুদ্ধে যে শক্তির অভ্যুদয় হচ্ছে তার মূলে রয়েচে কম্যুনিস্টদের প্রচেষ্টা। তারা প্রকাশ্যেই বলতে আরম্ভ করে যে, ব্রহ্মের জনসাধারণের শত্রু তিন ধরণের আছে: কম্যুনিস্ট পার্টি, বৃটিশ গোয়েন্দা ও প্যারাশুটের সাহায্যে অবতীর্ণ মার্কিন গোয়েন্দাগণ। কম্যুনিস্টদের ধরবার জন্যে জাপানীরা সব লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করে। কম্যুনিস্ট বলে কেউ সন্দেহভাজন হলেই তার ওপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার চলতো এবং গুলী করা হতো। কম্যুনিস্ট সন্দেহে প্রায় ৫০০ জন থাকিনকে জাপানীরা হত্যা করে। বিদ্যালয়গুলিতে গুপ্তচরের কাজ করবার জন্যে বর্মী ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু এসব ব্যবস্থার ফল বিপরীতই হলো। কম্যুনিস্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে জাপানীরা বা ম'র তাঁবেদার প্রতিষ্ঠান মহাবামার সাহায্যে তার

প্রত্যেক জেলা ও গ্রাম্য শাখার নিকট এক ফরমান পাঠালো। তাতে বলা হলো যে, কম্যুনিস্টরা বর্মী জনসাধারণের ভীষণ শত্রু; সুতরাং জনসাধারণ কোন কম্যুনিস্টের সন্ধান পেলেই যেন তাকে জাপ পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু কম্যুনিস্টদের পক্ষে এতে শাপে বর হলো। লক্ষ লক্ষ লোক যারা কম্যুনিস্টদের নামগন্ধও জানত না তারা সবাই কম্যুনিস্টদের কথা জানতে পারলো এবং জাপ-বিরোধী কার্যকলাপের কাহিনীও তাদের কানে গিয়ে পৌঁছাল। অনেকেই কম্যুনিস্টদের দরদী হয়ে উঠলো এবং ধরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, তারা আরো জাপ-বিরোধী আন্দোলনে সাহায্য করতে লাগলো।

থাকিন সু ও পার্টির গুপ্ত কর্মীদের ধরবার জন্যে জাপানীরা চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করেনি। জাপানী গুপ্তচর বিভাগের একজন অফিসার একদিন একজন বর্মী অফিসারকে বললেন যে সর্বনাশ হয়েছে, ব্রহ্মের কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কি ভাবে এই যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হলো তা অনুসন্ধান ক'রে বের করবার জন্যে জাপ-অফিসার বর্মী অফিসারকে আদেশ করলেন। আদেশ পালন করা দূরে থাক, উক্ত বর্মী অফিসার কম্যুনিস্টদের প্রধান গুপ্তশিবিরে এই খবর পাঠিয়ে তাদের আরো সতর্ক ক'রে দিলেন।

কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে জাপানীরা ব্রহ্মে কতটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল একদল বর্মী সামরিক পুলিশ শিক্ষানবীশের কাছে একজন জাপ সামরিক পুলিশের অধ্যক্ষের বক্তৃতায়ই তা ভালোভাবে প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন:

> "আমরা, জাপানীরা কোন শত্রুর ভয়ে ভীত নই। সর্বত্রই আমরা আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছি, কিন্তু কম্যুনিস্টদের এখনো ধ্বংস করতে পারিনি। আপাতদৃষ্টিতে

মনে হয় কম্যুনিস্টরা বুঝি আমাদের চাইতে বেশি চালাক; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। এদের খুঁজে বার করা কঠিন এজন্যে যে সাধারণ লোক ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ঠিক বোঝা যায় না। ব্রহ্মে আমরা বিদেশী, কাজেই জনসাধারণের মধ্য থেকে কম্যুনিস্টদের খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে শক্ত। কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা সম্ভব, কেননা তোমরা তোমাদের দেশের লোককে চেন। এসিয়ার পারস্পরিক উন্নতির গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কিভাবে কম্যুনিস্টদের উৎখাত করা যায় সে সম্বন্ধে তোমরা অবহিত হও।"

কিন্তু জাপানীদের সে আশা আর পূর্ণ হয়নি। ব্রহ্মে কম্যুনিস্টদের দমন করতে গিয়ে তারা নিজেদের ধ্বংসের পথকেই আরো প্রশস্ত করে তোলে।

আউং সান

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মেজর জেনারেল আউং সান ব্রহ্মের স্বাধীনতা পাবার আশায় গোড়ার দিকে জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে যায় এবং তিনি জাপানীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত বর্মা রক্ষী বাহিনীকেই ক্রমশ জাপ-বিরোধী বাহিনীতে পরিণত করেন। তাঁর হৃদয়ের অফুরন্ত স্বদেশপ্রেমই তাঁকে ব্রহ্মের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথম জীবনেই তিনি দেশপ্রেমের প্রেরণায় কিরূপ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার একটি কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে তাঁরই একজন সহকর্মী কমরেড এইচ এন ঘোষাল বলেছেন:

"আমার এখনো সেই দিনটির কথা মনে পড়ে। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষার আগে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের এক সভা বসেছে। সভায় ধর্মঘট সম্পর্কে আলোচনা হবে। ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি সভায় বললেন :

'কমরেডগণ, এরূপ একটা সামান্য ব্যাপারে পরীক্ষার মুখে আপনাদের ধর্মঘট করা নীতির দিক দিয়ে অন্যায়। আপনারা যদি সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পারেন তবে আপনাদের বাইরে গিয়েই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। অন্তত আমার নিজের সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদে আমি চিরদিনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমি আমার স্বদেশবাসীর সঙ্গে একত্র হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।'

"সেদিন তাঁর বক্তৃতা সভার অনেকেরই মনঃপূত হয়নি ; কিন্তু সেই যুবক ছাত্র অন্তরে যা উপলব্ধি করেছিলেন তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। সেই নির্ভীক যুবকই হলেন আউং সান। তখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র বাইশ বছর। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মে যে বিরাট ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তিনি তাতে নেতৃত্ব করেছিলেন।"

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের পর তিনি তখনকার ব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান দোবামা আসিয়াওনে যোগদান করেন। প্রবীণ নেতারা আউং সানের মধ্যে শক্তির সন্ধান পেলেন ; কাজেই তাঁরা তাঁকে দলের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত করলেন।

এর পর এলো ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র তখন ব্রহ্মে নির্বোধের ন্যায় দমননীতির আশ্রয় নিল। সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হলো। থাকিন সু, থান তুন প্রভৃতি নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। আউং সান বাধ্য হয়ে গুপ্ত

পথের আশ্রয় নিলেন। গুপ্তভাবে থেকেই তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালাতে লাগলেন।

আউং সান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত থেকেই ফাসিস্ত-বিরোধী ছিলেন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার তাঁর মনকে এতটা ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বর্মার বিপ্লবকে স্বাভাবিক পথে আনবার জন্যে যেটুকু অপেক্ষা করা দরকার সেটুকু অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্য আর তাঁর ছিল না। তিনি বর্মীদের স্বাধীনতার সহজ পথ খুঁজতে লাগলেন এবং তা করতে গিয়েই তিনি গণ-আন্দোলন থেকে দূরে সরে পড়লেন। তাঁর এই মনের গতিই তাঁকে জাপানীদের পঞ্চম বাহিনীর দিকে টেনে নিয়ে গেল। জাপবিরোধী সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলো। জাপানী পঞ্চম বাহিনী সুযোগ পেয়ে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজনকে সামরিক শিক্ষার জন্যে টোকিও পাঠালো। কয়েক মাস বাদে জাপান থেকে তিনি রেঙ্গুনে ফিরে এলেন। বৃটিশ গোয়েন্দারা এ-সবের কোন খবরই রাখলো না।

জাপানে সামরিক শিক্ষা পেয়ে আউং সানের স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলো। তিনি একটু গর্বিত ও মেজাজী হয়ে উঠলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি রেঙ্গুনে একটি জাপসমর্থক দল গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন। স্থির হলো, জাপানীরা ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করলে তারা তাকে সাহায্য করবে। এই দল গঠনের পর তিনি আবার জাপানে গেলেন। তিনি ভাবলেন জাপানীদের সাহায্যে আগে বৃটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে পরে নিজের জাতীয় বাহিনীর সাহায্যে জাপানীদের ব্রহ্ম থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি তাঁর বর্মা স্বাধীনতা বাহিনীর পুরোভাগে থেকে জাপানীদের সঙ্গে একত্র ব্রহ্মে মার্চ করে এগুলেন। বলা বাহুল্য, আউং সানের মতো একই বিশ্বাসের

বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মের বহু স্বদেশভক্তই স্বাধীনতা বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছিল।

বা ম'র সাহায্যে জাপানীরা যখন বর্মীদের ব্যাপক সমর্থন লাভে অসমর্থ হয় তখন তারা আউং সানকে 'আদিপতিস' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ দিতে চায়। কিন্তু তিনি তাতে এই কারণে অসম্মত হন যে, প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেই বাধ্য হয়ে তাঁকে জাপানীদের সকল নির্দেশ পালন করতে হবে এবং তার ফলে তাঁর দ্বারা জনসাধারণ অত্যাচারিত হবে।

আউং সানের ভুল ভাঙতে বেশিদিন লাগলো না। জাপানে থাকা-কালেই জাপানীদের শাসনব্যবস্থা দেখে তিনি তাদের প্রতি কতকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। বর্মা স্বাধীনতা বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তাকে যখন বর্মা রক্ষী বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হলো তখন তিনি তার সেনাপতিপদে থেকেও একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সহকর্মী থাকিন সু নিজের জীবন বিপন্ন করে গুপ্তভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তারই ফলে আউং সান সে-যাত্রা নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পান। থাকিন সু ভারতের কম্যুনিস্ট নেতা জোশীর একখানি চিঠি আউং সানকে দেখান। উক্ত চিঠিখানি লেখা হয়েছিল ব্রহ্মের কম্যুনিস্ট পার্টিকে। সেই চিঠি দেখিয়ে থাকিন সু আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক আউং সানকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেন। এই আলোচনার ফলে আউং সানের মতের পরিবর্তন হয় এবং তিনি ফাসিস্ত-বিরোধী জনসংঘকে সমর্থন করতে সম্মত হন।

আউং সান যখনই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখনই তিনি গা-ঢাকা দিয়ে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে গিয়ে কাজ করতে চাইলেন। কিন্তু থাকিন সু তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, সৈন্যদলে থেকে তিনি যদি

জাপানীদের অত্যাচার থেকে ব্রহ্মবাসীদের রক্ষার চেষ্টা করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলেন, তাতেই বেশি কাজ হবে। আউং সান এই যুক্তি মেনে নিলেন এবং বর্মা রক্ষী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্যে জোর আন্দোলন চালালেন। সৈন্যদলের বিভিন্ন শাখার নিকট তিনি গোপনে নির্দেশ পাঠালেন যে, বর্মা রক্ষী বাহিনীর কোন সৈন্য যখন গুপ্ত কাগজপত্র বহন করে নিয়ে যাবে তখন কোন জাপানী তাকে তল্লাস করতে চাইলে আউং সানের অনুমতি ব্যতীত সে যেন তা করতে না দেয়। কোন জাপানী যদি তাতে পীড়া-পীড়ি করে তবে সে যেন সেই জাপানীকে গুলীতে হত্যা করে আউং সানকে খবর দেয়।

কামিয়াতে একজন জাপানী সামরিক অফিসার একদিন একটি বর্মী মেয়েকে অপমান করতে উদ্যত হলে বর্মা রক্ষী বাহিনীর একটি তরুণ সার্জেণ্ট সেই অফিসারকে হত্যা করে। সার্জেণ্ট তার সৈন্যদলের হেড-কোয়ার্টার্সে গিয়ে এই ঘটনার কথা জানায়। হেডকোয়ার্টার্স তাকে রক্ষা করে। আর একদিন বর্মা রক্ষী বাহিনীর একজন সৈন্য একটি গ্রাম্য দোকানে বিশ্রাম করছিল। সেই সময় কয়েকজন জাপানী এসে সেই দোকান লুট করতে চায়। সৈন্যটি গুলী চালিয়ে তাদের বিতাড়িত করে। এর পর জাপানীরা তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলে বর্মা রক্ষী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স তাকে রক্ষা করে। এরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। বাইরে থেকে তখন মনে হতো বর্মা রক্ষী বাহিনী বুঝি জাপানীদেরই তাঁবেদারী করছে ; কিন্তু মেজর জেনারেল আউং সানের নেতৃত্বে উক্ত বাহিনী ভেতরে ভেতরে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং জাপ-বিরোধী বাহিনীতে পরিণত হয়। এই বাহিনীতে জাপ-বিরোধী মনোভাব এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, ব্রহ্মে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা গিয়ে পৌছাবার আগেই তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঘোষণা করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। আউং সান তাদের বুঝিয়ে বলেন যে, অকাল-বিদ্রোহ করলে (যেমন ওয়ারস'তে হয়েছিল) সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে।

জাপানীরা ব্রহ্মের তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ব্রহ্মের নেতাদের মধ্যে একমাত্র আউং সানই তখন সাহস ক'রে প্রকাশ্যে বর্মী জনসাধারণকে বলতে পেরেছিলেন, "বর্মীরা স্বাধীনতা পায়নি, তা অর্জন করবার জন্যে এখনো যুদ্ধ করতে হবে।" এতে ব্রহ্মের জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আউং সানকে আরো বেশি শ্রদ্ধা করতে থাকে। আউং সানের নেতৃত্বে বর্মা রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা যতভাবে পারে জনসাধারণকে সাহায্য করে। সৈন্যদের বরাদ্দ করা খাদ্য থেকে যা বাঁচত তা বুভুক্ষু জনসাধারণকে দিয়ে দেওয়া হতো। বর্মী মেয়েদের ওপর জাপানীরা যাতে কোন অত্যাচার না করতে পারে তার দিকে তারা দৃষ্টি রাখতো। নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রেও তারা জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করতো। এই সব কারণেই বর্মা রক্ষী বাহিনী ও তার নেতা আউং সান অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৮ই মার্চ বৃটিশ চতুর্দশ আর্মি মান্দালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। মেজর জেনারেল আউং সানের গোপন নির্দেশ অনুযায়ী তখন মান্দালয়ে বর্মা রক্ষী বাহিনীর ডিটাচ্‌মেণ্টের অধিনায়ক বো বা তু সদলবলে জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বো বা তু-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এক সঙ্গে বিদ্রোহ করেনি বলে আউং সানের যেন তিনি প্রকাশ্যে নিন্দা করেন। এ ছিল জাপানীদের চোখে ধূলি দেবার একটা কৌশল মাত্র। জাপানীরা অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং আউং সানকে ব্রহ্মের জাপ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আদেশ করেন যাতে তিনি জাপানীদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ক'রে জাপ-বাহিনীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আউং সান তৎক্ষণাৎ তা

করলেন। ব্রহ্মের সর্বত্র জাপানীদের বিরুদ্ধে একযোগে অভ্যুত্থানের জন্যে তিনি কেবল সময় নিচ্ছিলেন। ১৫ই মার্চ তিনি জাপানীদের সম্পূর্ণরূপে ধাপ্পা দেবার জন্যে সর্বত্র বর্মা রক্ষী বাহিনীকে এক উৎসব উদ্‌যাপনের আদেশ দিলেন। রেঙ্গুনেই বর্মা রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল। সেখানকার অনুষ্ঠানে ব্রহ্মের জাপ প্রধান সেনাপতি এবং সকল মন্ত্রীই যোগ দিলেন। অনুষ্ঠান দেখে প্রত্যেকেই খুব খুশি হলেন। আউং সান ঘোষণা করলেন যে, অবিলম্বে তিনি মিত্রশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করতে চান। তদনুসারে পরদিন বর্মা রক্ষী বাহিনীর সৈন্যদলসমূহকে সেনানীদলসহ থায়েটমিয়োতে পাঠানো হলো, কেননা সেখানেই যুদ্ধ চালাবার জন্যে হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে বিদ্রোহের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করা হলো।

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ১৭ই মার্চ পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী আউং সান তাঁর জাপ পরামর্শদাতাদের কোনরূপ খবর না দিয়েই যুদ্ধচালনার হেডকোয়ার্টার্স অভিমুখে রওনা হলেন। প্রোম যাবার পথে তিনি তাঁর মোটর গাড়ী বদল করলেন এবং গুপ্তশিবিরের পথ ধরলেন। এমন কৌশলে সব করা হলো যে জাপানীরা কোনরূপে সন্দেহই করতে পারলো না।

ইতিমধ্যে বর্মার দেশপ্রেমিক দল মিত্রপক্ষের সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হলো। মিত্রপক্ষের অভিযানের পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্মার দেশপ্রেমিক দল নিজেদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা স্থির করলো। বর্মা রক্ষী বাহিনীর এক একটি দলকে কেন্দ্র ক'রে সর্বত্র গেরিলাদল গঠন করা হয়েছিল। এভাবে সামনে মিত্রপক্ষের বাহিনী আর পিছনে রইলো বর্মা রক্ষী বাহিনী ও তাদের সঙ্গে গেরিলাদল—মাঝখানে পড়লো জাপানীরা। গেরিলারা অতর্কিতে জাপানীদেব ওপর আক্রমণ চালিয়ে আবার পাহাড়ে ও

জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। জাপানীদের সাধ্য ছিল না সেখান থেকে তারা গেরিলাদের খুঁজে বার করে। গেরিলারা জাপানীদের চলাচলপথ নষ্ট ক'রে দিতে লাগলো। যথেষ্ট সশস্ত্র সৈন্য সঙ্গে দিয়ে কনভয় করে পাঠানো ছাড়া জাপানীদের কোন মালামাল চালান দেওয়া সম্ভব ছিল না। এর ফলে তাদের খুবই অসুবিধে হয়। সর্বত্র জাপানীরা বিশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গেরিলাদের আক্রমণে হাজার হাজার জাপানী সৈন্য হতাহত হয়। আহত সৈন্যদের নিয়ে তারা কোনরকমে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অত্যন্ত দ্রুত পশ্চাতে হটে যেতে আরম্ভ করে। গেরিলারা শহরের পর শহর দখল ক'রে চলে। তারপর মিত্রসেনা সেইগুলিতে নির্বিবাদে প্রবেশ করে মাত্র।

তৌঙ্গুতে জাপানীদের সঙ্গে গেরিলাদের ২রা ও ৩রা এপ্রিল তুমুল যুদ্ধ হয় এবং গেরিলারা সমগ্র জেলাটি উদ্ধার করে। এই যুদ্ধে জাপ সৈন্য ও রসদবাহী ১৭৩টি ট্রাক এবং দু'খানি ট্রেন গেরিলারা উড়িয়ে দেয়। এছাড়া জাপানীদের কত নৌকা ও গরুরগাড়ী যে বিধ্বস্ত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

পিন্‌মানায় বর্মা রক্ষী বাহিনীর প্রায় ৬ শ' সৈন্য গেরিলাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কুড়িদিন যুদ্ধ চালায় এবং প্রায় ১৫ শ' জাপানীকে নিহত করে। একজন জাপানী লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল এবং একজন মেজর জেনারেলও সেই যুদ্ধে নিহত হন। এছাড়া বিস্তর সমরোপকরণ বর্মীদের হস্তগত হয়।

মিত্রবাহিনী গিয়ে পৌঁছাবার দু'দিন আগেই রেঙ্গুন শহর গেরিলারা দখল করে। ব্রহ্মের এই যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে যতদূর জানা গিয়েছে তাতে দেখা যায়, গেরিলাদের আক্রমণে ব্রহ্মে অন্তত ১০ হাজার জাপানী নিহত এবং অসংখ্য জাপসৈন্য আহত হয়।

গোড়ার দিকে ব্রহ্মের গেরিলা বাহিনীর প্রতি বৃটিশ সামরিক কর্তাদের একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব ছিল; কেননা তখন তাঁরা ভাবতেই পারেননি যে একটা পরাধীন দেশের লোক নিজেদের চেষ্টায় এমন একটি সুশৃংখল ও শক্তিশালী সৈন্যদল গ'ড়ে তুলতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বৃটিশ সামরিক কর্তাদের এই ভুল ভেঙ্গে যায়। তাঁরা ব্রহ্মের এই জাতীয় বাহিনী ও তার অধিনায়ক আউং সানকে মেনে নিতে বাধ্য হন; অর্থাৎ ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনী রেগুলার সৈন্যদল রূপে স্বীকৃত হয়।

ব্রহ্মবাসীরা ফাসিস্তবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে সত্য, কিন্তু পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ তাদের আজো হয়নি; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাবর্তে তাদের সেপথ খানিকটা প্রশস্ত হয়েছে মাত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা আজো চাইছে নানা পাকচক্রে তাদের দাবিয়ে রাখতে। কোন দেশের জাগ্রত জনমতকে যে দাবিয়ে রাখা চলে না ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মবাসীদের যে আত্মচেতনা এসেছে এবং স্বাধীনতার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রাণে জেগেছে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। পরাধীন দেশের মুক্তি-আন্দোলনের পক্ষে আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও পূর্বাপেক্ষা অনুকূল। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে ব্রহ্মের ফাসিস্তবিরোধী সংগ্রাম যে আরো উগ্র হয়েই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হবে এমন অনুমাণ করা কিছু অসঙ্গত নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিহাসের এই ইঙ্গিত স্বীকার করুক না করুক, বৈদেশিক শোষণ থেকে ব্রহ্মবাসীরা মুক্তি চাইবেই। এই শোষণ থেকে তারা যেদিন মুক্তি পাবে সেদিনই হবে ব্রহ্মের স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ অবসান।

আরাকান

এবার আমাদের অতি নিকটবর্তী প্রতিবেশী আরাকান সম্পর্কে কিছু বলা যাক। মিত্রপক্ষের বাহিনী দু'বছর নানাভাবে চেষ্টা করেও আরাকানে প্রবেশ করতে পারলো না। তারপর একদিন অকস্মাৎ অক্লেশে তারা সেখানে প্রবেশ করলো। এর পিছনে রয়েচে এক চমকপ্রদ অথচ অপ্রকাশিত ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এখানে সংক্ষেপে বলছি।

বর্মীদের মতো আরাকানীরাও ১৯৪২ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতা পাবার আশায় জাপানীদের সঙ্গে যোগ দেয়। জাপানীরা গোড়ার দিকে সুতায় একটু ঢিলা দিয়ে তাদের খেলিয়ে নেয়। আরাকানীরা তাদের সমস্ত বেসামরিক শাসনকার্য চালাবার অধিকার পায় এবং জাপানীরা একটি 'আরাকান রক্ষী বাহিনী' গড়ে তোলবার অনুমতিও তাদের দেয়। যুদ্ধজনিত দুঃখকষ্ট থাকা সত্বেও তারা এই সামান্য অধিকার পেয়েই আনন্দিত হয়ে ওঠে। জনসাধারণ ও তাদের নেতৃবৃন্দ হাসিমুখেই সমস্ত ক্লেশ বরণ করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই নেতারা উপলব্ধি করেন যে, স্বাধীনতার নাম করে তাদের ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। নেতারা তখন জনসাধারণের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন। দেখতে দেখতে আরাকানবাসীরা জাপ-বিরোধী হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার নাম করে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করায় জাপানীদের বিরুদ্ধে লোকের মনে বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়। আরাকানের জনসাধারণ জাপানীদের সরবরাহ যোগাতে অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্য থেকে একটি গেরিলাদল গড়ে ওঠে। মিত্রপক্ষের সামরিক কর্তাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়। প্রথমে মিত্রপক্ষ

আরাকানের গেরিলাদের বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপর অনেক দিনের চেষ্টায় মিত্রপক্ষের সন্দেহ দূর হয়। তখন স্থির হয় যে, আরাকানে মিত্রসেনার অভিযান ও গেরিলাদের অভ্যুত্থান একযোগে হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের ফলেই আরাকান থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হয়। অর্থচ এই গেরিলাদের তৎপরতার কথা মিত্রপক্ষের সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একরকম চেপেই যায়। সেই জন্যেই আরাকানী গেরিলাদের কথা জগদ্বাসীর কাছে তেমন পৌঁছায়নি, আর আমরাও এত কাছে থেকে তা যথাসময় জানতে পাইনি।

একদিকে পর্বত ও আর একদিকে সমুদ্রের দ্বারা আরাকান ব্রহ্ম এবং ভারতবর্ষ উভয় দেশ থেকেই একরূপ বিচ্ছিন্ন। আরাকানীদের মধ্যে পার্বত্য জাতীয় ধারা আজো পর্যন্ত অল্পবিস্তর বিদ্যমান। তারা যেন নিজেদের একটু বিচ্ছিন্ন করে রাখতেই ভালোবাসে। প্রাচীন বর্মী সভ্যতা ও ভাষাকে তারা সযত্নে রক্ষা করে আসছে। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং স্থানীয় জমিদাররাই প্রতিপত্তিশালী লোক। সব চেয়ে যিনি আরাকানের বড় জমিদার তাঁর জমিদারীর আয়তন ৬৪ হাজার একর জমি ; এছাড়া তিনি আরাকানের সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাঙ্কের মালিক। দেশের ব্যবসাবাণিজ্যও জমিদারদেরই হাতে। জমিদার ঘরের ছেলেরা সমগ্র ব্রহ্মে বহুদিন ধরে সরকারী চাকরি করে আসছে। এছাড়া আরাকানে রয়েচে কৃষক, মাঝি, জেলে ও গ্রাম্য কারিকর শ্রেণীর লোক। ছেলেমেয়েরা বৌদ্ধ মঠগুলিতে গিয়ে বর্মী ভাষা শেখে। একটু অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারের ছেলেরা স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে পড়বার জন্যে কলকাতা অথবা রেঙ্গুনে যায়।

অতীতে আরাকানীরা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পাঁচ বার চেষ্টা করে। কিন্তু অধুনা আরাকানের জমিদারশ্রেণী বৃটিশ প্রভুদের

একেবারে পদলেহী হয়ে পড়ে। তাহলেও স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিক দিয়ে আরাকান একেবারে পিছনে পড়ে নেই। কৃষক ও ছাত্র সমাজের চেষ্টায় সেখানে একটি স্বাধীনতা-আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন অবশ্য বেশিদিনের নয়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্তও সেখানে বিশেষ কোন জাতীয় আন্দোলন ছিল না। ১৯৩৮-৩৯ খৃস্টাব্দ থেকেই সেখানে জাতীয় আন্দোলন বিশেষ প্রসার লাভ করে। আরাকান জাতীয় কংগ্রেসই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই আরাকান জাতীয় কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়; ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। আরাকান জাতীয় কংগ্রেসই স্বাধীনতার বাণী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌছে দেয়। প্রজাদের স্বার্থ নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান আন্দোলন করে। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে রেঙ্গুনে ছাত্রদের বিরাট আন্দোলনের সময় আরাকান জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে আরাকানেও ছাত্ররা জাতীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবীতে সভা ও শোভাযাত্রাদি করে।

তারপর জাপানীরা যখন ব্রহ্মে প্রবেশ করে তখন আরাকানের রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত গরম। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আরাকান জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। নেতারা বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেন। সমগ্র আরাকানে তখন বৃটিশবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। জাপানীরা যখন আরাকানের কাছে উপস্থিত তখন আরাকানে চরম বিশৃঙ্খলা। আরাকানের স্বদেশপ্রেমিকরা অন্তত গোটা চারেক শহর দখল করে বসে। কোন কোন শহর থেকে বৃটিশ সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং সেগুলিও স্বভাবতই আরাকানের দেশপ্রেমিকদেরই হাতে আসে। বৃটিশ পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করেও আরাকানীরা দু'একটি শহর দখল করে।

জাপানীরা চতুর। কাজেই তারা নিজেরা না এসে 'ব্রহ্ম স্বাধীনতা বাহিনীকে' আগে আরাকানে পাঠালো। আরাকানের নেতারা 'ব্রহ্ম স্বাধীনতা বাহিনীকে' সাদর সম্ভাষণ জানালেন। এর কিছুদিন পরেই এলো জাপানীরা। আরাকানে তাদের আসবার উদ্দেশ্য তারা যেভাবে বুঝালো তাতে আরাকানের নেতারা বিশ্বাস করলেন। তাঁদের বুঝানো হলো একমাত্র সামরিক প্রয়োজনেই জাপানীদের আরাকানে আসা ; কারণ বৃটিশ সৈন্যদের ধাওয়া ক'রে জাপানীরা তাদের পরাজিত করতে চায়। বেসামরিক শাসনভার সবই তারা আরাকানবাসীদের হাতে ছেড়ে দেবে। তার পরিবর্তে তারা কেবল এটুকু চায় যে, বৃটিশদের শেষ করবার যে ব্রত জাপানীরা নিয়েছে তাতে যেন আরাকানীরা তাদের সাহায্য করে। এই ধাপ্পায় ভুলে আরাকানের দেশপ্রেমিকরা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জাপানীদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং আরাকানের দেশপ্রেমিকরা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। জাপ-সৈন্যদের জন্য শস্য গুদামজাত হতে লাগলো। বাজার দরের দশ ভাগের এক ভাগ দরে জাপ-সৈন্যদের কাছে চাল বেচবার জন্যে আরাকানী কৃষকদের বাধ্য করা হলো। নৌকা ও ডোঙ্গাগুলি জাপানীরা দখল ক'রে নেওয়ায় কৃষক এবং জেলেরা বিষম কষ্টে পড়লো।

জাপানীদের তক্তার দরকার, তারা গিয়ে গ্রামে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের ঘর ভেঙ্গে কাঠ নিয়ে এলো। গ্রামের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ধরে এনে জোর করে জাপানীরা শ্রমিকেব কাজে নিয়োগ করতে লাগলো। আরাকান রক্ষী বাহিনীর সৈন্যদের দিয়ে মুটেমজুরের কাজ করানো হতো। বোমাবর্ষণের ফলে আরাকানের স্কুলবাড়ীগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তার ফলে সেখানকার সমস্ত স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

জাপানীরা বিদ্যালয়ের জন্যে কোন মজবুত বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। বৃটিশ পক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় এবং 'স্বাধীনতা সংগ্রামের' অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই ধরণের অসুবিধেগুলি ভোগ করতেই হবে, আরাকানের নেতারা গোড়ার দিকে এটাই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশ যখন দেখা গেল যে, যা প্রয়োজন সবই জাপানীরা নির্বিচারে গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে তখন আরাকানের নেতারা বুঝতে পারলেন যে, জাপানীদের কাছ থেকে তাঁরা কি ভূয়া স্বাধীনতাই পেয়েছেন। আরাকানে স্থানীয় শাসনকার্য চালাবার জন্যে প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে যেসব শান্তিরক্ষা কমিটী (Peace Preservation Committees) গঠিত হয়েছিল জাপানীরা সেগুলিকেও অগ্রাহ্য করতে লাগলো। জাপানীদের আদেশ পালনের জন্যেই যেন সেগুলিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আরাকানবাসীরা অগত্যা তাদের জননায়ক উ পিন্নয়াথাইয়ার নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধিকে কতকগুলি দাবী জানিয়ে রেঙ্গুনে "স্বাধীন ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের" কাছে পাঠালো। প্রতিনিধিদলের নেতা আরাকানের জন্যে একজন মন্ত্রী নিয়োগ ও আরাকানের জনকল্যাণের দিকে নজর দেবার জন্যে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করলেন। এখানেই আরাকানের জননায়ক উ পিন্নয়াথাইয়া ব্রহ্মের তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ টের পেলেন এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ তাঁর কাছে আরো বেশি প্রকট হলো। রেঙ্গুনে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, আরাকানের শান্তিরক্ষা কমিটীর (পি-পি-সি) চাইতেও 'স্বাধীন ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের' ক্ষমতা কম। তাঁকে একরকম স্পষ্টতই বলে দেওয়া হলো যে, ব্রহ্মের স্বাধীনতা একটা ছলনা মাত্র; কার্যত সমস্ত ক্ষমতাই জাপানীদের হাতে। বর্মী মন্ত্রীরা বললেন যে তাঁরা আরাকানকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারবেন না।

ব্রহ্মের এই অবস্থা দেখে আরাকানের নেতা ও প্রতিনিধিবর্গ অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত হলেন। স্বাধীনতার খেলনা দেখিয়ে জাপানীরা ব্রহ্মের কাঁধে চেপে বসেছে। এই কপটতার কথা ভেবে জাপানীদের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাঁদের মন ভরে গেল। আরাকানে ফিরে এসে তাঁরা সমস্ত ব্যাপার নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। জাপানীদের কোন আচরণই আর তাঁদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতো না। চতুর জাপানীদের পক্ষে সকল প্রকার অত্যাচার করাই যে সম্ভব এটা তাঁরা মর্মান্তিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাঁরা তখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালালেন। গ্রাম-বাসীদের বলা হলো যে, তারা যেন জাপানীদের অধীনে শ্রমিকের কাজ করতে না যায় এবং শস্যাদি লুকিয়ে রাখে। মুখে মুখেই এই প্রচার চলে। ফলে আরাকানীরা ক্রমশ জাপানীদের অধীনে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করতে অস্বীকার করে এবং খাদ্যাদি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। জাপানীরাও তখন উগ্র মূর্তি ধারণ করে। তারা জোর করে গরুবাছুর কেড়ে নিয়ে গিয়ে জবাই করতে থাকে, শ্রমিকের জন্যে গ্রামে গ্রামে হানা দেয়।

সেমিয়া নামক একটি গ্রামে জাপানীরা শ্রমিকের সন্ধানে যায়। ভয়ে গ্রামবাসীরা গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়; কিন্তু তিনটি হতভাগিনী আর যাবার অবসর পেল না। জাপানীরা তাদের বেঁধে পশুর ন্যায় বলাৎকার করলো। কেবল একটি গ্রামেই নয়, আরাকানের আরো অনেক গ্রামেই এমন কাণ্ড ঘটেছে।

পালেওয়া জেলায় মিং চাউং নামে একটি ছোট নদী আছে। জাপানীরা আরাকানীদের কাঁধে চড়ে এই নদী পার হতো। নিকটবর্তী একটি গ্রামে জাপানীরা একদিন দেখতে পেল যে মাত্র একজন পুরুষ রয়েছে। আর সবাই গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়েছিল। তাকে ধরে

এনে তার কাঁধে একজন জাপানী সৈন্যকে চাপিয়ে দেওয়া হলো। তারপর জাপানীরা সেই অবস্থায় তাকে প্রায় দেড়শ' বার নদীর এপার ওপার করালো। অবশেষে মুমূর্ষু অবস্থায় জলে পড়ে গিয়ে সেই হতভাগ্য প্রাণ হারালো।

জাপানীদের এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের ফলে আরাকানে গেরিলা আন্দোলনের সৃষ্টি হলো। গেরিলাদের তৎপরতার ফলে জাপানীরা একেবারে ক্ষেপে গেল। কেউ 'কমুনিস্ট' বা 'বৃটিশ গোয়েন্দা' বলে সামান্য সন্দেহ হ'লেই তাকে হত্যা করা হতো। সামান্য অপরাধে শ' শ' লোকের জীবন হারাতে হয়। কারো কাছে এক টাকার বৃটিশ নোট পেলেই তাকে বৃটিশ গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করা হতো এবং তার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। আরাকানের গ্রামগুলিতে জাপানীরা সব বীভৎস ভাবে অত্যাচার করতো। একদিন একটি আরাকানী চাষী 'শত্রুর গুপ্তচর' সন্দেহে ধৃত হলো। গেরিলাদের খবর বলবার জন্যে জাপানীরা তার স্ত্রীকে জেরা করতে লাগলো। সে যখন কিছুতেই কিছু বললো না তখন জাপানীরা তার শিশুটিকে চোখের সামনে অত্যাচার ক'রে মেরে ফেললো। জাপানীরা আর একভাবে মানুষকে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ পেত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তার নিজের কবর খুঁড়বার জন্যে আদেশ করা হতো। কবর খোঁড়া শেষ হয়ে এলে সে যখন মাটি তোলবার জন্যে উপুড় হতো তখন জাপানীরা তার মুণ্ডচ্ছেদন করে কাটা ধর আর মুণ্ডটা কবরে ফেলে দিয়ে গোর দিত। রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের হত্যা করবার আরো একটা জাপানী কায়দা ছিল। সেটাকে বলা হতো "সাবমেরিনে চড়া"। যাকে হত্যা করা হবে তার গলায় দড়ি বেঁধে কোন একটি কূপে নামিয়ে দিয়ে একবার তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হতো আবার তাকে টেনে তোলা হতো। জাপানীরা বিদ্রূপ ক'রে বলতো, "ত্যাখ, সাবমেরিনে চড়া কেমন

মজা।" এইভাবে লোকের মৃত্যু নিয়ে জাপানীরা আবার "বিমানে চড়া" খেলাও খেলতো। লোককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দোলনা দেওয়া হতো। কিন্তু এত অত্যাচার করেও আরাকানে জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করা সম্ভব হয়নি।

আকিয়াব জেলায় কোয়াং দাউং গ্রামের ফাসিস্ত-বিরোধী দলের সংগঠক ছিল গামিয়া নামক একটি ২৩ বছরের কিষাণ যুবক। জাপানীরা তার ওপর তিন মাস ধরে অত্যাচার চালায়। হাতে দড়ি বেঁধে তাকে সারাদিন ঝুলিয়ে রাখা হতো এবং সেই অবস্থায়ই জাপানীরা তাকে প্রহার করতো। তারপর তাকে একটি বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে সারা গায়ে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হতো। তার হাতপায়ের নখগুলি প্রায় সবই তুলে ফেলা হয়েছিল। আগুন জ্বেলে তার ওপর তাকে ঝুলিয়ে রাখা হতো এবং তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হতো। গরম জল জোর করে তার মুখে ঢেলে দেওয়া হতো এবং পেট অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে না ওঠা পর্যন্ত এভাবে জল গেলানো চলতো। জাপানীরা তারপর তার পেটেব ওপর একটি বাঁশ ফেলে পা দিয়ে চাপ দিত যাতে মুখ দিয়ে আবার জল বেরিয়ে আসে। অত্যাচারের চোটে সে বাকশক্তি রহিত হয়ে পডতো। জাপানীরা তখন তাকে ওষুধপত্তর দিয়ে সারিয়ে তুলতো এবং তারপর আবার একইভাবে তার ওপর অত্যাচার করতো। এভাবে তিন মাস অত্যাচার চলে। তার সঙ্গে আরো সাত জন ছিল। তাদের ওপরও এই ধরণের অত্যাচার চলে এবং তার ফলে তারা মারা যায়। সে কোন রকমে টিকে যায় এবং তিন মাস পরে মুক্তি পায়। এত অত্যাচার সত্ত্বেও তাদের মুখ দিয়ে জাপানীরা কোন কথা বের করতে পারেনি।

জাপানীদের অত্যাচারে আরাকানে গেরিলাদের সংখ্যা কমে না গিয়ে বরং বেড়েই গেল। কৃষিজীবী, শ্রমিক, কামার, ছুতার প্রভৃতি

থেকে আরম্ভ করে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক পরিচালিত ছাত্রসমাজ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই এসে গেরিলাদলে যোগ দিল। তের থেকে ত্রিশ পর্যন্ত সকল বয়েসের যুবকই গেরিলা বাহিনীতে ছিল। জাপানীরা যখন আরাকান ছেড়ে চলে যেতে থাকে তখন সেখানে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে অস্ত্র পেয়ে চারশ' গেরিলা যুদ্ধ করছিল। জাপানীরা যে সব দা ও তরোয়াল মজুত করে রেখেছিল সেগুলি পেয়ে আরো এক হাজার গেরিলা সশস্ত্র হয়। অস্ত্র পেলেই যুদ্ধে যোগ দিতে পারত এমন আরো চারপাঁচ হাজার গেরিলা প্রস্তুত হয়েই ছিল।

গেরিলারা অনেক সময় ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকতো এবং মেয়েরা এসে তাদের খাবার দিয়ে যেত। গেরিলাদের তৎপরতা প্রায় চারশ' গ্রামে ব্যাপৃত ছিল। জাপানীদের গুপ্ত সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে গেরিলারা মিত্রপক্ষকে অনেক খবর যোগায়। তদনুসারে মিত্রপক্ষের বিমান হানা দিয়ে জাপানীদের বহু ক্ষতি করে। গেরিলারা নিজেরাও যুদ্ধ ক'রে কয়েক হাজার জাপানীকে যমালয়ে পাঠায়। আরাকানে জাপানীদের আত্মরক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল মিয়োহউং। প্রায় বিশ জন গেরিলা গোপনে সেখানকার জাপ-শিবিরে প্রবেশ ক'রে তাদের সরবরাহের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। জাপানীরা তাতে এতটা ভীত হয়ে পড়ে যে তারা সেই জায়গা ছেড়ে চলে যায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে জোর করে শ্রমিকরূপে খাটাবার জন্যে ৫০ জন স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে যায়। জাপানীদের পশ্চাদপসরণের সময় অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই দশটি ডিঙ্গা গেরিলারা ডুবিয়ে দেয় এবং ছ'টি ডিঙ্গা দখল করে।

তারপর আরাকানে মিত্রপক্ষের পূর্ণ অভিযানের সময় উপস্থিত হ'লে গেরিলারা আগেই কয়েকটি শহর দখল ক'রে মিত্রবাহিনীকে যাবার জন্যে আহবান করে। তারা খবর পাঠায় যে, জাপানীরা

আকিয়াব ছেড়ে চলে গেছে। এই খবর পাবার কয়েকদিন পর মিত্রসেনা আকিয়াবে অবতরণ ক'রে দেখে যে সত্যি সেই বন্দর খালি।

বেসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে মিত্রবাহিনী 'বর্মা সিভিল এফেয়ার্স সার্ভিসেস' (সি-এ-এস) সঙ্গে নিয়ে আসে। গেরিলারা তাদের সাদর সংবর্ধনাই জানায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গেরিলাদের গ্রেপ্তার করা হয়, সিমলাস্থিত বর্মা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে 'অবাঞ্ছিত লোকদের' যে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছিল তাতে গেরিলাদের মধ্যে অনেকের নাম ছিল। এক জায়গায় গেরিলারা একটি শহর দখল করে মিত্রসেনাকে সেই শহরে আসবার জন্যে খবর দেয়। বৃটিশ সৈন্যদলের কর্তারা সি-এ-এস প্রদত্ত নামের তালিকা দেখেন এবং তারপর যারা খবর দিতে এসেছিল তাদের আটক করে রাখেন। অথচ তাঁরা খবরটা ঠিক পেয়ে গেলেন যে জাপানীরা কোন দিকে যাচ্ছে।

বৃটিশ পক্ষের এই রকম আচরণের ফলে অবস্থা একটু জটিল হয়ে উঠলো। ধামাধরার দল এবং পুরণো বর্মা পুলিশ বাহিনীর কর্তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে কোনদিন একটি অঙ্গুলিও তোলেননি; অথচ তাঁরাই শেষ পর্যন্ত মুরুব্বি সেজে বসলেন এবং অকাতরে গেরিলাদের ডাকাত আখ্যা দিলেন। অবশ্য আসল ব্যাপারটা বুঝতে সামরিক কর্তাদের বেশি দেরি হলো না। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, আরাকানের যে-জনসাধারণ জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তারা এই সব শয়তানি সহ্য করবে না। একথা বুঝতে পেরে তাঁরা তথাকথিত 'অবাঞ্ছিতদের নামের তালিকা' ছিঁড়ে ফেললেন।

জাপানীরা বিতাড়িত হবার পর আরাকানের দেশপ্রেমিকরা পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করে। স্থানীয় গ্রাম্য কমিটীগুলি মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন করে। এই কাজে নারীরাও যোগ দেয়। চাষের উন্নতির জন্যে কৃষক সংঘ

গঠিত হয়। যুব সংঘসমূহ আবার স্কুলগুলিকে চালাবার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধের দরুণ আরাকানে প্রায় দু'বছর সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল।

জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে আরাকানের দেশপ্রেমিকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, প্রাচীন আমলাতন্ত্র আর তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের আরো দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রহ্মের স্বাধীনতাও আর বেশি দূরে নয়। তারা গর্ব করেই বলে থাকে, "ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবার পর আমরা গণপরিষদ আহ্বান ও আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করব।"

আরাকানের জননায়ক

আরাকানের জাতীয় আন্দোলনের মূলে যিনি রয়েচেন এবার সেই পুরুষসিংহের কথা বলবো। তাঁর নাম উ পিন্নয়াথাইয়া। তিনি পরম পণ্ডিত লোক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। আরাকান বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংঘের তিনি শিক্ষাসচিব এবং আরাকান জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আরাকানে বোধ হয় এমন গ্রাম নেই যেখানকার লোক তাঁর কথা না জানে বা তাঁকে শ্রদ্ধা না করে। আরাকানবাসীদের সুখদুঃখকে তিনি নিজের ক'রে নিয়েছেন এবং সেই জন্যেই গণচিত্তে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দে আরাকানের দু'টি গণপ্রতিষ্ঠানকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। একটি হলো নিখিল আরাকান সংঘ (তাইং লো সাইঙ্গিয়া) এবং অপরটি হলো যুব প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে ছাত্র ধর্মঘট হবার পরই যুব প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব হয়। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে একটি সম্মেলনে তিনি উক্ত দুই প্রনিষ্ঠানকে এক ক'রে আরাকান জাতীয় কংগ্রেস গঠন করতে সক্ষম হলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার করলো। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের জুন মাসে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। রাজনৈতিক কারণে আরাকানে এই প্রথম গ্রেপ্তার। তাঁর বিচারের সময় আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। বিচারে তাঁর প্রতি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো। কিন্তু জনসাধারণ চাইলো তাঁকে ফিরিয়ে পেতে। আরাকানের জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। সাহায্য করলেন একজন ভারতীয় মুসলমান উকিল। তিনি আরাকান জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তিনি আপীলে উ পিন্নয়াথাইয়ার পক্ষ সমর্থন করলেন; ফলে তাঁর কারাদণ্ড কমে এক বছর থেকে নয়দিন হলো।

এর পর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রথমে প্রকাশ্যে এবং পরে গোপনে আরাকানের জনসাধারণকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্যে সংগঠিত করলেন। আরাকান জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা একে একে গ্রেপ্তার হলেন। তিনি এবং আরো কয়েকজন গা-ঢাকা দিয়ে কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে লাগলেন।

এই পণ্ডিতপ্রবর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আরাকানে কি ক'রে জননায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন সে সম্পর্কে কতকগুলি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। তিনি যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন আরাকানের বণিকরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তাঁকে সামাজিকভাবে বর্জন করে। এমন দিনও তাঁর গিয়েছে যেদিন আহারের জন্যে তাঁর দু'আনা পয়সাও জোটেনি। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের জাগাতে লাগলেন। কেবল স্বাধীনতার বাণী দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে তিনি কাজ করে চললেন। আরাকানী শ্রমিকদের বেকারসমস্যা সমাধানে তিনি চেষ্টিত হলেন। বৃটিশ সওদাগরী প্রতিষ্ঠান-গুলি চট্টগ্রাম থেকে সুবিধে মতো শ্রমিক আমদানী করতো। তিনি

পোস্ট অফিসগুলিতে গিয়ে হিসেব নিতেন যে প্রতি মাসে মণিঅর্ডার যোগে কত টাকা আরাকান থেকে বাইরে চলে যায় এবং সেই টাকা দেশে থাকলে তার দ্বারা আরাকানের কত শ্রমিকের অন্নসংস্থান হতে পারে।

কয়েকটি বৃটিশ সওদাগরী প্রতিষ্ঠান আরাকানে সাতটি কাগজের কল খুলতে চায়; কারণ আরাকানে কাগজের কাঁচা মাল বাঁশ প্রচুর পাওয়া যায়। কম মজুরীতে ভারতীয় শ্রমিক আনাবার পরিকল্পনা তারা করে। উ পিন্নয়াথাইয়া তখন এই যুক্তি দেখান যে, বিদেশী মূলধন এবং বিদেশী শ্রমিকের সাহায্যেই যদি কাগজের কলগুলি চালিত হয়, আরাকানের তাতে কি লাভ হবে? তিনি হিসেব ক'রে দেখালেন যে, কলগুলি প্রতিষ্ঠিত হ'লে আরাকানে দৈনিক প্রায় এক লক্ষ ক'রে বাঁশ কাটা হবে। তার ফল দাঁড়াবে এই যে, বাঁশের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাবে এবং আরাকানের গরীব প্রজাদের আর তা কিনবার সাধ্য থাকবে না। অবশ্য তিনি আরাকানে কলকারখানা বিস্তারের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু এভাবে বিদেশী শোষণের দ্বারা আরাকানবাসীদের দুর্গতিকে আরো বাড়িয়ে তোলবার প্রস্তাবকেও তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি এর বিরুদ্ধে আরাকানের জনমতকে এমনভাবে গঠন করলেন যে, শেষ পর্যন্ত বৃটিশ কোম্পানীগুলি তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

বৃটিশ শাসনের কেবল ভাসাভাসা ও মৌখিক নিন্দা করেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। তিনি দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের মুখোস খুলে দিতেন। তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে কুশাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতেন। কোন জায়গায় যদি কোন সরকারী আমলাকে জনসাধারণের শত্রু বলে প্রমাণ করতে পারতেন তবে গ্রামবাসীদের দ্বারা তাকে এমন ভাবে সামাজিক আটক দিতেন যার ফলে কর্তৃপক্ষ সেই আমলাকে বদলী করতে বাধ্য

হতেন। আরাকানের মতো জায়গায়ও তাঁর সভায় সর্বদাই দশপনের হাজার করে লোক উপস্থিত হতো।

আরাকানে জাপানীরা আসবার পর কয়েক মাস পর্যন্ত তিনি বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনায় নেতৃত্ব করেন। জাপানীদের স্বাধীনতার আশ্বাসে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তাই তিনি শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করেননি। শাসন বিভাগের সাহায্যে তিনি কিষাণদের নানাবিধ কল্যাণসাধনে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ বাধবার কয়েক বছর আগে কিষাণদের সমস্ত সোনা আরাকানের জমিদারদের ব্যাঙ্কগুলিতে বাঁধা পড়েছিল। সেগুলি আর কিষাণদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ সোনার দর বেড়ে ভরি তিনশ' টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য করালেন যাতে তারা ৪৫ টাকা ভরিতে সোনা ছেড়ে দেয়। কিষাণরা তখন দলে দলে এসে ব্যাঙ্ক থেকে প্রতি ভরি সোনা ৪৫৲ দামে কিনে নিয়ে যায়। তিনি সেই জনতার আনন্দ দেখে বলেছিলেন, "এমন দৃশ্য জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি।"

গোড়ার দিকে এসব কাজে তিনি তেমন বাধা পাননি; কিন্তু ক্রমশ জাপানীরা তাঁর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তখন প্রতিকার পাবার আশায় রেঙ্গুন যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তথাকথিত স্বাধীন ব্রহ্মের স্বরূপ দেখে অত্যন্ত নিরাশ হন। এর পর থেকেই তিনি জাপ-বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং আরাকানের তরুণ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রহ্মের জাপ-বিরোধী স্বাধীনতা সংঘে যোগদান করে তিনি আরাকানে জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

এখানে আরাকানের প্রতিরোধ-আন্দোলনের আরো দু'একজন নেতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই এই অধ্যায় শেষ করব। প্রথমেই ব্রহ্ম

ফাসিস্তবিরোধী স্বাধীনতা সংঘের আরাকান শাখার নেতা নিয়ো তুনের নাম করা যায়। এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম; কিন্তু রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৩৬ ও১৯৩৮-৩৯ খৃস্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মে যে ছাত্রধর্মঘট হয় তাতে তিনিও একজন নেতা ছিলেন। আরাকান জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনের জন্যে তিনি আরাকানে ফিরে আসেন। তার ফলে আরাকানের কিষাণ সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। জাপানীদের নির্দেশে 'ব্রহ্ম স্বাধীনতা বাহিনী' যখন আরাকানে প্রবেশ করে তখন বা ম' মনে করেছিলেন নিয়ো তুন বুঝি তাঁরই অনুরক্ত। তাই বা ম' তাঁকে আরাকানে দোবামা সিনিয়েথা দলের নেতা নিযুক্ত করেন। তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। উক্ত দলের আরাকান শাখার নেতারূপেই তিনি জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তোলেন।

এর পর নাম করতে হয় ক্রা হ্লা আউং নামক একজন গেরিলা নায়কের। বয়েস তাঁর প্রায় চল্লিশ। তাঁর পেশা ছিল কামারগিরি। শৈশবে তিনি একটি বৌদ্ধ মঠে সামান্য লেখাপড়া শিখেন। তারপর তিনি একজন কৃষিমজুর রূপে জীবিকার্জন করতে থাকেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি সামান্য ব্যবসা শিখেন এবং কামারের কাজে লেগে যান। তখন তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান। বৃটিশ সৈন্যরা যখন আরাকান ছাড়তে আরম্ভ করে এবং জাপানীরা এসে আরাকানে হানা দেয় তখন উ পিন্নয়াথাইয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। জাপানীদের আমলেই যে আরাকান রক্ষী বাহিনী গঠিত হয় তিনি তার সেনাপতিত্ব পান। সেই পদে থেকেই তিনি ব্রহ্ম ফাসিস্তবিরোধী স্বাধীনতা সংঘের নির্দেশ মতো আরাকানে জাপ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলারা আরাকানে যে-যুদ্ধ চালায় তিনিই তাতে অধিনায়কত্ব করেন।

আরাকানের আর একজন তরুণ নেতা হলেন তুং আউং গিঅ। তিনি উ পিন্নয়াথাইয়ার একজন প্রিয় অনুচর। প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় তিনি ব্রহ্ম কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সদস্য হন। কম্যুনিস্ট পার্টির কাজে যুদ্ধের সময় তাঁকে কয়েকবার ব্রহ্মের সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি একবার জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে যান। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে এই কাণ্ড ঘটে। জাপানীরা মেরে তাঁর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দেয়; সর্বাঙ্গ তাঁর ক্ষতবিক্ষত হয়। অবশেষে গ্রামবাসীরা তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত ক'রে দেয়। তিনি তখন অতিকষ্টে জাপানীদের অধিকৃত এলাকা থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন।

আরাকানের যুবশক্তি আজ আর ঘুমিয়ে নেই। যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁরা যে রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়েছেন তার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়; বাইরের সামান্য প্রতিকূল হাল্কা হাওয়ায় তা বিচলিত হবার নয়।



মালয় ও ফিলিপিন

মুক্তিসংগ্রামে মালয়ও যে পিছনে পড়ে নেই এবার সেকথাই বলবো। প্রথমে মালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। মালয়ের শাসনবিভাগ এইরূপ : তিনটি স্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্ট (সিঙ্গাপুর, পেনাং ও মালাক্কা); চারটি ফেডারেটেড মালয় স্টেট (পেরাক, সেলাংগর, নেগ্রি সেম্বিলান ও পাহাং) এবং পাঁচটি আন্‌ফেডারেটেড স্টেট (জোহোর, কেডা, কেলাণ্টন, ট্রেগ্‌গানু ও পার্‌লিস)। সেটল্‌মেণ্টগুলি শাসন করেন একজন গবর্ণর। তিনিই আবার স্টেটসমূহে অর্থাৎ মালয়ের দেশীয় রাজ্যসমূহে বৃটিশ হাই কমিশনারের কাজ ক'রে থাকেন। প্রত্যেক রাজ্যে একজন ক'রে দেশীয় নৃপতি থাকলেও কার্যত সকল ক্ষমতা বৃটিশ রেসিডেণ্টগণের হাতে। লোকসংখ্যা প্রায় ৫৩ লক্ষ ; তন্মধ্যে চীনা ২৫ লক্ষ, মালয়ী ২০ লক্ষ এবং ভারতীয় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার।

মালয়ের টিনের খনিগুলিতে যত শ্রমিক কাজ করে তাদের অধিকাংশই চীনা। এ ছাড়া রবারের চাষ এবং ডকে কাজ করেও বহু চীনা জীবিকা অর্জন করে। মালয়ীদের মধ্যে বেশির ভাগই কৃষিজীবী ও জেলে। খুব অল্পসংখ্যক মালয়ী খনিতে এবং রবারের আবাদে কাজ করে। এক দিকে রয়েচে দরিদ্র কৃষককূল, অপর দিকে রয়েচে সামন্ততান্ত্রিক সুলতানগণ। মালয়ীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একরকম নেই বললেই চলে। মালয়ে চীনা ও তামিল শ্রমিকদের মধ্যে খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা রয়েচে। তাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অনুন্নত মালয়ীদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকেন। এ ব্যাপারে বৃটিশ পক্ষকে সাহায্য করেন মালয়ের দেশীয় নৃপতিগণ।

ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকাংশই কাজ করে বড় বড় রবারের আবাদে। এছাড়া মালয়ে একদল ভারতীয় বণিকও আছেন। মালয়ের প্রধান পণ্য রবার ও টিন। এই রবার ও টিনের ব্যবসাতে রয়েচে সেখানে বৃটিশ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ। এছাড়া সামরিক দিক দিয়েও মালয়ের গুরুত্ব যথেষ্ট ; কারণ ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার পথে রয়েচে সিঙ্গাপুর।

দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে ব্রহ্মের ন্যায় মালয়েরও এক নতুন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে থেকে মালয়বাসীরা অনেক দিন ধরেই শোষিত ও নিপীড়িত হয়ে আসছিল ; কিন্তু মালয় জাপানীদের দখলে যাবার পর তারা একথাও উপলব্ধি করে যে, শোষণ ও অত্যাচারের দিক দিয়ে প্রতীচী ও প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদে কোনই পার্থক্য নেই। এই জন্যেই যুদ্ধের আগে যেমন মালয়ের মুক্তিকামীরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তেমনি জাপ-তাঁবে গিয়ে তাঁরা জাপানীদের বিরুদ্ধেও এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলন কি ভাবে গড়ে উঠলো তারই ইতিহাস এখানে বলছি।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশরা যখন মালয় ছেড়ে চলে এল তখন মালয়ী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে রয়ে গেলেন। তাঁরা অবশ্য জানতেন যে, জাপ-অত্যাচারের প্রধান চাপ পড়বে তাঁদেরই ওপর ; কিন্তু তা জেনেও তাঁরা মালয়ের জনসাধারণকে ত্যাগ করতে পারলেন না। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দ থেকেই মালয়ের কম্যুনিস্টরা ফাসিস্ত-বিরোধী সম্মিলিত দল গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মালয়ে তখন কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী বলে ঘোষিত ছিল। বৃটিশ শাসকগণ কম্যুনিস্ট নেতাদের পেলেই গ্রেপ্তার করতেন, তাদের কাগজপত্র হাত করে নিতেন। ১৯৩৮

খৃস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের এক ফাসিস্তবিরোধী সমাবেশ হয়েছিল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সৈন্য, সাঁজোয়া গাড়ী এবং মেশিনগানের সাহায্যে সেই জনতা ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছিলেন।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপানীরা যখন মালয় আক্রমণ করে তখনও পর্যন্ত সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনীই ছিল। মালয়ের কম্যুনিস্টগণ এবং ফাসিস্ত-বিরোধী দল জাপানীদের প্রতিরোধ করবার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে। মালয়রক্ষার জন্যে কম্যুনিস্টরা ৫০ হাজার মালয়ী সৈন্য সংগ্রহের প্রস্তাব করে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাতে অস্বীকৃত হন। শেষ মুহূর্তে গবর্ণমেণ্ট একশ' তরুণ কম্যুনিস্টকে সৈন্যদলে গ্রহণ করতে সম্মত হন; কিন্তু তাদের কোন সামরিক শিক্ষাই ছিল না। কাজেই যুদ্ধে গিয়ে তাদের অধিকাংশই মারা যায়।

জাপানীরা এ-সবই জানতো। কাজেই তারা মালয়ে প্রবেশ করেই কম্যুনিস্টদের ধরবার জন্যে নানাভাবে ফাঁদ ফেলে। বিশেষ করে চীনা শ্রমিকদের নিকট যারা অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাদের ধরবার জন্যে জাপানীরা খুবই চেষ্টিত হয়। শ' শ' লোককে ধরে জাপানীরা পীড়ন করে ফাঁসীতে ঝুলায়। কিন্তু সব কিছু করেও জাপানীরা কম্যুনিস্টদের সংগঠন নষ্ট করে দিতে সমর্থ হলো না। জাপানীরা মালয়ে এমন ভাবে লুটতরাজ সুরু করে দিল যে লোক তাতে কম্যুনিস্টদের প্রতি আরো বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো। সিঙ্গাপুরে পৌছেই জাপ সৈন্যরা দোকানগুলিতে হানা দিয়ে টাকাকড়ি জিনিসপত্র যা পেল আত্মসাৎ করলো। নারীনিগ্রহ চললো। যে-সব ব্যবসায়ী যুদ্ধের সুযোগে অতিরিক্ত মুনাফা ক'রে ভাগ্যবান হয়ে বসে তারা জাপানীদের কাছে খাতির পেতে থাকে। দেশদ্রোহী গুপ্তচরেরাও জাপানীদের প্রসাদ লাভ করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নেয়। তার ফলে জাপানীদের

বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ ক্রমশই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

জনসাধারণের এই জাপবিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করে কম্যুনিস্টগণ এবং ফাসিস্তবিরোধীদল সংগঠনে বিশেষ জোর দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তারা অনেকটা এগিয়ে যায়। একটি পার্টিজান আর্মি অর্থাৎ জনসেনা গঠিত হয়; তার মূলে থাকে গোড়ার দিকের কম্যুনিস্ট গেরিলাদল। এই কম্যুনিস্ট গেরিলাদল পঞ্চাশটি পিস্তল ও বন্দুক এবং কয়েকটি বিস্ফোরক অস্ত্র পেয়ে জোহোর জাপ-দখলে যাবার অব্যবহিত পরেই সেখানকার চলাচলপথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

মালয়ে সর্বদলের সমন্বয়ে যে জনসেনা গঠিত হয়, মিত্রপক্ষের নিকট জাপানীদের আত্মসমর্পণের সময় দেখা যায় যে তাতে সুশিক্ষিত ও সশস্ত্র ১০ হাজার সৈন্য রয়েচে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের মে মাস থেকে বৃটিশপক্ষ কিছু কিছু অস্ত্র বিমানযোগে মালয়ী জনসেনাকে সরবরাহ করে। এছাড়া জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করেও তারা কিছু অস্ত্র পায়। এর দ্বারাই দশ হাজার সৈন্যকে সশস্ত্র করা সম্ভব হয়।

মালয়ের জনসেনার নাম ছিল জাপবিরোধী সৈন্যদল (**Malayan People's Anti-Japanese Army**—সংক্ষেপে বলা হতো **AJA**)। এর আটটি স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট ছিল; দু'টি জোহোর স্টেটে, একটি নেগ্রি সেম্বিলানে, একটি সেলাংগরে, একটি পেরাকে, দুটি পেনাংএ এবং একটি কেডাতে। জাপানীদের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জাপানীগণ ও বিশ্বাসঘাতকের দলকে গ্রেপ্তার করবার কাজে জাপবিরোধী সৈন্যদলকে নিয়োজিত করেন। সমগ্র মালয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি, ফাসিস্তবিরোধী সম্মিলিত দল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল কাজ করতে আরম্ভ করে, দ্রুত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গড়ে ওঠে;

তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয় সিঙ্গাপুরে জেনারেল লেবার ইউনিয়ন। সকল দল একত্রিত হয়ে বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সভাসমিতির স্বাধীনতা, যে-সব বিশ্বাসঘাতক মালয়ী জাপানীদের সাহায্য করেছিল অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দুর্গত জনসাধারণকে সাহায্যের দাবী উত্থাপন করে। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গেলেন অন্য পথে। মালয়ের যেসব পুলিশ জাপানীদের অধীনে কাজ করেছিল এবং যারা প্রতিরোধ আন্দোলন দমনে জাপানীদের সাহায্য করেছিল, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের চাকরিতে রেখে দিলেন। মালয়ের জনসেনা তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করেছিল; কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি তাদের মুক্তি দিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কখনো কোন বিশ্বাসঘাতককে গ্রেপ্তার করলে মালয়ের লোক বলাবলি করতো যে, মালয়বাসীদের আক্রোশ থেকে রক্ষা করবার জন্যেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শাস্তিদানের জন্যে নয়।

তারপর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মালয়ের জনসেনাকে ক্রমশ ভেঙ্গে দিতে আরম্ভ করেন। তার ফলে মালয়ে বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আর্থিক দিক দিয়েও মালয়ের জনসাধারণ অত্যন্ত কষ্টে পড়ে। বৃটিশ কর্তাদের মুদ্রানীতিই এজন্যে বিশেষভাবে দায়ী। মালয় পুনরায় দখল করবার পর তাঁরা সেখানে অকস্মাৎ জাপানী মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দেন। তাঁরা এক ফতোয়া জারী করেন যে, জাপানী মুদ্রার আর কোন মূল্যই নেই। কার্যত তখন মালয়ে একমাত্র জাপানী মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। মালয় দখল করবার পর জাপানীরা সমস্ত বৃটিশ মুদ্রা, নোট ও সোনা কেড়ে নিয়ে সেখানে জাপানী মুদ্রা প্রচলিত করেছিল। কাজেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যখন সমস্ত জাপানী মুদ্রা বাতিল করে দিলেন তখন মালয়বাসীরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো।

কেবল তাই নয়। জাপানীরা যে-সব স্বর্ণ ডলার ও বৃটিশ মুদ্রা লোকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে ইয়োকোহামা স্পেসী ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় মজুত করে রেখেছিল, জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর সেগুলি আবার বৃটিশ কর্তৃপক্ষেরই হস্তগত হলো। প্রায় দশ কোটি ডলার ও বৃটিশ মুদ্রা এ ভাবে তাঁর পান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল মুদ্রার বিনিময়ে জাপানী নোটগুলি কিনে না নিয়ে তাঁরা সহসা সেগুলিকে বাতিল করে দিলেন। এর ফলে মালয়বাসীদের আর্থিক অবস্থা গিয়ে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে জাপানীরা মালয়বাসীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে যা সঞ্চয় করে রেখেছিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গিয়ে তাই আত্মসাৎ করে বসলেন; মালয়ের জনসাধারণকে তা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার বোধ করলেন না। ব্যবসায়ী শ্রেণীও এতে বিষম অসুবিধেয় পড়লেন। চড়া সুদে বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যবসায় চালানো ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায়ই রইল না। এই আর্থিক দুর্গতির ফলে মালয়ের মালিকশ্রেণীও সুবিধে পেয়ে বসেন। তাঁরা নির্বিচারে শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দিতে আরম্ভ করেন; কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন যে, যত কম মজুরীই দেওয়া হোক না কেন পেটের দায়ে মজুরদের বাধ্য হয়েই কাজ করতে হবে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের তুলনায় ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে মালয়ে জিনিসপত্রের দাম অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু আগের তুলনায় শ্রমিকদের মজুরী যায় কমে। এর ফলে সিঙ্গাপুরে প্রায় তিন লক্ষ লোক অনাহারে মরতে বসে। প্রতি পরিবারের জন্যে মাত্র ১৫ ডলার করে সাহায্যের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু সিঙ্গাপুরে যুদ্ধের পর মাথা পিছু খরচ পড়ে অন্তত ৪৫ ডলার। কাজেই পরিবার পিছু ১৫ ডলার সাহায্যের ব্যবস্থা একটা পরিহাস মাত্র।

মালয়ে যারা রবারের ছোটখাট আবাদ করতো তারাও লোপ পেতে

চলেছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মালয়ে প্রতি পাউণ্ড রবারের দাম ৩৬ সেণ্টে বেঁধে দেন; অথচ সিংহলে এক পাউণ্ড রবারের দাম ৬৫ সেণ্ট। রবারের দাম এত কমিয়ে দেওয়ায় ছোটখাট রবার-আবাদকারীরা ক্ষতি দিয়ে রবার বেচতে বাধ্য হবে এবং তার ফলে তাদের আবাদই উঠে যাবে। বলা বাহুল্য, এই সব ছোটখাট রবারের আবাদ করে দেশী লোক। এক দিকে গেল নগদ টাকা, আর এক দিকে বন্ধ হলো তাদের ব্যবসা। কাজেই ধীরে ধীরে লোপ পাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

বড় বড় রবার-আবাদকারীরা নিশ্চয়ই টিঁকে যাবে। তাদের অধিকাংশই হলো বৃটিশ। জাপানীদের কাছ থেকে যে ৮০ হাজার টন রবার পাওয়া যায় তা দিয়েও তাদেরই সাহায্য করবার ব্যবস্থা হয়। এ ছাড়া তাদের মূলধনেরও অভাব নেই।

তারপর মালয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের চিরাচরিত ভেদনীতিও পুরা মাত্রায়ই চালিয়েছেন। চীনা, ভারতীয় ও মালয়ীদের মধ্যে যাতে সদ্ভাব না থাকে তার জন্যে নানারূপ বৈষম্যমূলক সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে মালয়ের কম্যুনিস্ট পার্টি, ফাসিস্তবিরোধী জনসংঘ এবং সিঙ্গাপুরের জেনারেল্ লেবার ইউনিয়ন আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

জাপানীরা মালয়ে প্রবেশ করে সমগ্র দেশকে এক রকম তচনচ করে। তাদের অত্যাচার সম্পর্কে যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, একমাত্র তুংতিং লেক এলাকায়ই ১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মালয়ের বেসামরিক লোক ১ লক্ষ ৩১ হাজার নিহত ও ৩৮ হাজার আহত হয়। এ ছাড়া প্রায় ৮৩ হাজার নরনারী নিখোঁজ, ৩৫ হাজারেরও বেশি নারী ধর্ষিতা, ধর্ষণের ফলে ৪ সহস্রাধিক নারীর মৃত্যু, প্রায় ৭৩ হাজার বাড়ী ভস্মীভূত, প্রায় ৫ কোটি মণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট এবং ৮৬ হাজারেরও বেশি গবাদি পশু নিহত হয়।

এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলেই মালয়বাসীদের মনে জাপবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। তা থেকেই সেখানে গেরিলাদলের সৃষ্টি। গেরিলাদের সম্পর্কে একটি ঘটনা বিবৃত করেই এই অধ্যায় শেষ করব।

গেরিলাদের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আলোচনা চালাবার জন্যে একদিন একজন জাপানী অফিসার গেরিলাশিবির অভিমুখে যাত্রা করেন। স্থানীয় একজন গুপ্তচর জাপ-অফিসারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। দুর্গম ও বন্ধুর পার্বত্য পথ অতিক্রম ক'রে তারা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। অরণ্যের মধ্যে কিছুপথ অগ্রসর হয়ে তারা দূরে গেরিলাশিবির দেখতে পায়। তাঁবু খাটিয়ে রাইফেল, মেশিনগান, ট্রেঞ্চমর্টার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেরিলারা অবস্থান করছে।

জাপানী অফিসার দূর থেকে চীৎকার করে বললেন, "আমি আপনাদের একজন সুহৃদ, দয়া করে গুলী করবেন না।" কয়েক সেকেণ্ড কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর আরম্ভ হলো গুলীবৃষ্টি। জাপ-অফিসার মাটিতে শুয়ে পড়ে কোন রকমে বেঁচে গেলেন এবং এক ফাঁকে দৌড়ে পালিয়ে অব্যাহতি পেলেন। তিনি হেডকোয়ার্টার্সে এসে খবর দিলেন, "গেরিলারা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর। তারা আত্মসমর্পণ করতে নারাজ।"

এরপর জাপানীরা আর কোনদিন মালয়ের গেরিলাদের সঙ্গে আত্ম-সমর্পণের জন্যে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেনি। যেখানে পেরেছে তারা অস্ত্র নিয়েই মুখোমুখি হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ও ফাসিস্তবাদী উভয়বিধ শাসনব্যবস্থারই তিক্ত অভিজ্ঞতা মালয়বাসীদের হয়েছে। সুতরাং নব্য মালয়ের যে জাগ্রত জনসাধারণ ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তারা যে সাম্রাজ্য-বাদকে নীরবে মেনে নেবে এমন চিন্তা করা ভুল। সমগ্র এসিয়ার

মুক্তি-আন্দোলনে মালয়ও যে পিছনে পড়ে থাকবেনা, তার সাম্প্রতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয়।

ফিলিপিন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফিলিপিনের গেরিলারাও কম সাহসের পরিচয় দেয়নি। যুদ্ধের সময় টোকিও থেকে জাপানীরা ফিলিপিন সম্পর্কে যেসব খবর বেতারে প্রচার করতো তাতে প্রায়ই ফিলিপিনের গেরিলাদের কথা উল্লেখ থাকতো। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাপানীরা ফিলিপিনের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও নিহত কম্যুনিস্টদের এক নামের তালিকা প্রকাশ করে। তারপর সে-বছরই শরৎকালে অস্ট্রেলিয়া থেকে জেনারেল ম্যাকআর্থার ফিলিপিনো গেরিলাদের এক অস্পষ্ট বেতারবার্তা শুনতে পান। তা শোনবার পর থেকে জেনারেল ম্যাকআর্থার সাবমেরিণের সাহায্যে ফিলিপিনের গেরিলাদের অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতে থাকেন। লেইট দ্বীপে মার্কিন সৈন্যরা পুনরায় অবতরণ করবার পর জেনারেল ম্যাকআর্থার বলেন :

> "ফিলিপিনের প্রত্যেক সাম্প্রদায়েরই সুশিক্ষিত সৈন্যরা পৃষ্ঠদেশে থেকে শত্রুকে আক্রমণ ক'রে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে।"

একমাত্র লেইট দ্বীপেই ৪ হাজার গেরিলা ছিল। লুজনে লিঙ্গায়েন উপসাগরের তীরে মার্কিন সৈন্যদের অবতরণের চারদিন আগেই ফিলিপিনো গেরিলারা মার্কিন বিমানের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে জাপানীদের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি অবরোধ করে বসেছিল ; তার ফলে জাপানীরা আর সেখানে স্বচ্ছন্দভাবে সেনা-চলাচলের সুবিধে পায়নি। গেরিলারা ম্যানিলার দিকে যাবার প্রধান রেলপথগুলি উড়িয়ে দেয় এবং সড়কের সেতুসমূহ ভেঙ্গে ফেলে। তারই ফলে জাপানীরা ম্যানিলা রক্ষায় অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং মার্কিন সৈন্যরা দ্রুত ম্যানিলার দিকে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। গেরিলারা ফিলিপিনের রাজধানী উদ্ধারে

সাহায্য না করলে মার্কিন বাহিনীকে সেখানে আরো বেশ কিছুদিন যুদ্ধ করতে হতো।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই একই এলাকায় ফিলিপিনের বীর ফ্রান্সিস্‌কো ফ্লোরডেলেসের গেরিলা বাহিনী মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে তার জন্যে তিনি তাঁর ঘরবাড়ী ও শণের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই গেরিলাযুদ্ধ ফিলিপিনোদের কাছে কিছু নতুন নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করবার পরই ফিলিপিনের সকল রাজনৈতিক দল দেশরক্ষা ব্যাপারে একবাক্যে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট কুইজনকে সমর্থন করে। প্রেসিডেণ্ট কুইজন নির্দেশ দেন যে, কর্তৃপক্ষের সকলকেই সমস্ত ব্যাপারে ফিলিপিনো কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে ফিলিপিনের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে সোস্যালিস্টরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেয়। এই সম্মিলিত দলের নায়ক হন কুইজনের বাল্যবন্ধু বিশিষ্ট শ্রমিক ও কম্যুনিস্ট নেতা ক্রিসান্তো ইভান্‌জেলিস্তা।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রসিদ্ধ বাটান যুদ্ধ শেষ হবার কয়েক-দিন আগে ফিলিপিনের স্বাধীন বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়:

> "স্বাধীনতার জন্যে আমাদের পুনরভ্যুত্থান হবে এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্যে সমগ্র প্রাচ্য গৌরব বোধ করবে।"

ফিলিপিনোদের হৃদয়ে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখে মার্কিন কর্তৃপক্ষও তাদের স্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনতা দানের আশ্বাস না দিয়ে পারেননি। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বেতারে ঘোষণা করেন:

> "ফিলিপিনবাসীদের আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তারা আবার মুক্তি পাবে এবং তাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত

হবে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত জনবল ও সম্পদ নিয়োজিত করতে কোনভাবেই কুণ্ঠিত হবে না।”

জাপানীরা প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ আরম্ভ করবার কয়েকদিন পরেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপর ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন সেনেট এক যুক্ত প্রস্তাবে প্রেসিডেণ্টকে একথা ঘোষণা করবার অধিকার দেয়ঃ

> “ফিলিপিন কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে স্থির করা হলো যে, ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাইর আগেই ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের একটি পৃথক ও আত্মনিয়ন্ত্রিত জাতিরূপে গণ্য করে ফিলিপিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে।”

এখানে বলা দরকার, মার্কিন কংগ্রেসে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে এই মর্মে এক আইন পাশ হয় যে, ফিলিপিনের ওপর মার্কিন কর্তৃত্বের অবসান করতে হবে; তবে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাইর আগে তার অবসান হবে না।

জাপ-কবল থেকে ফিলিপিন মুক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু আজো পর্যন্ত ফিলিপিনোরা পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি। মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন কিনা ঠিক কি—আর করলেও কবে করবেন তারও কিছু নিশ্চয়তা নেই। যুদ্ধ শেষ হবার পর দেখা যাচ্ছে, মার্কিন কর্তারা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকূলেই দাবার ঘুঁটি চালছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে বের করতে তাঁদের অসুবিধে হবেনা। ফিলিপিনোরা জোর করে স্বাধীনতার দাবী তুললে একদিন হয়তো খবর পাওয়া যাবে যে, প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে মার্কিন কর্তারা ফিলিপিনোদের ধরে ঠেঙ্গাচ্ছেন। তেমন অবস্থার উদ্ভব না হলেই মঙ্গল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়া

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এসিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের চরম নগ্ন রূপ প্রকাশ পায় ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ায়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর এই দুই দেশের অধিবাসীরা যখন নিজেদের স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে তখন ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। সব চেয়ে নির্লজ্জতার পরিচয় দেয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। পরের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে বৃটিশ প্রভুরা অকাতরে নিজেদের সৈন্য ও সমরোপকরণ নিয়োজিত করেন। সাম্রাজ্যবাদের মুখোস একেবারে খসে পড়ে।

কথায় বলে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থাকলেও কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন বিপন্ন হয় তখন দেখা যায় অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। এজন্যেই এসিয়ায় যখন জরাজীর্ণ ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং পরোক্ষ ভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাহায্য করতে ছুটে আসে। পূর্ব এসিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ তো আছেই, তাছাড়া এর মধ্যে একটা নীতিগত প্রশ্নও জড়িত রয়েচে। ইন্দোচীন ও ইন্দোনোসিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'লে তার নৈতিক প্রভাব সমগ্র এসিয়ার ওপর পড়বে, অর্থাৎ সমগ্র এসিয়ার মুক্তি-আন্দোলন প্রবলতর হয়ে উঠবে। এসিয়ার পরাধীন দেশগুলি গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করলে তাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যে পুঁজিতন্ত্রের দিকে না গিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকেই যাবে একথা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা ভালোভাবেই জানে। নিছক আদর্শের জন্যে নয়, ইওরোপীয় ও মার্কিন অর্থনৈতিক শোষণ এবং সামরিক আক্রমণ থেকে

আত্মরক্ষার জন্যেই অল্পকালের মধ্যে বেশি শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে এসিয়ার সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার হবে। তার অর্থই দাঁড়াবে ইওরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে নব্য এসিয়ার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্ব। এই পরিস্থিতিতে সমগ্র এসিয়ায় আজ যে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্লক গড়ে ওঠবার সূচনা দেখা দিয়েছে, অঙ্কুরেই তা বিনাশ করতে সাম্রাজ্যবাদীরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইতিহাসের এই দুর্নিবার গতিকে তারা রোধ করতে সক্ষম হবেনা।

এসিয়ায় ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করবার জন্যে যে চেষ্টা চলেছে তার মূলে আরো একটা কারণ আছে। বল্টিক, বল্কান ও মধ্য ইওরোপে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির কাছে বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতি আজ খর্ব। স্পেনের অবস্থা অনিশ্চিত। ফ্রান্সের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি দেখে বৃটিশ প্রভুরা চিন্তিত। কাজেই পশ্চিম ইওরোপে সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে যে একটি ব্লক সৃষ্টির জন্যে বৃটিশ প্রভুরা চেষ্টা করেন তা একরকম ভেস্তে যাবার পথে। কাজেই হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মকে অন্তত বৃটিশ শক্তির হাতে রাখা দরকার। সেখানে একমাত্র পুঁজিবাদীরাই তাদের সহায়। সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত পুঁজিবাদের টিকে থাকা কঠিন, বিশেষ ক'রে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের মতো ক্ষুদ্র দেশে সাম্রাজ্য হারালে দুদিনও পুঁজিবাদ টিকবেনা, সাম্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কেবল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম কেন, ভারতবর্ষকে হারালে বৃটেনেও পুঁজিবাদ কতদিন টিকে থাকতে পারবে সন্দেহ। ফ্রান্সেরও সাম্রাজ্য আছে বলেই রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা কম্যুনিস্টদের হাতে যাচ্ছেনা। কাজেই ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখতে পারলেই পশ্চিম ইওরোপে একটা সোভিয়েট-বিরোধী ব্লক সৃষ্টির ক্ষীণ আশা থাকে। এসিয়ায় ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা

আন্দোলন দমনে বৃটিশ শক্তি যে নির্লজ্জের মতো অগ্রসর হয় এটিও তার একটা কারণ।

মধ্য প্রাচ্যেও বৃটিশ শক্তি একটি সোভিয়েট-বিরোধী দল গঠনের চেষ্টায় আছে। আরব লীগের প্রতি সেই কারণেই বৃটেনের এতটা পৃষ্ঠপোষকতা। ইরাণে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের ফলে একদল লোক সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে নাচানাচি করছে। পূবে চীনের গণতন্ত্র তথা কম্যুনিস্টপ্রভাব বিস্তারের পথরোধ করবার জন্যে আছে মার্কিন শক্তি। ভারতবর্ষকে তো ইংরেজরা খাস তালুক বলেই মনে করে। চারদিকেই আজ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যে সর্বত্র দেখা যাচ্ছে গণশক্তির উত্থান। ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামও সেই জগদ্ব্যাপী গণমুক্তি-আন্দোলনেরই একটি ধারা।

১৯৪৫ খৃস্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের পরই খবর পাওয়া যায় যে, আনামের সম্রাট পদত্যাগ করেছেন এবং সেখানে এক নতুন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাইট নাম' গবর্ণমেণ্ট। আনামীরা ইন্দোচীনের নাম রাখে ভাইট নাম।

আনামীরা একটি সম্মিলিত জাতীয় দল গঠন করে। সেই দলে কম্যুনিস্টরাও যোগ দেয়। দলের নাম রাখা হয় 'ভাইট মিন'। এই দলই ইন্দোচীনে নতুন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করে। নতুন গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তগত করেই দক্ষতার সহিত শাসনকার্য চালাতে থাকে এবং সর্বত্র শান্তি স্থাপন করে। রাজধানী সায়গনে কার্যব্যস্ততা ও নতুন জীবনের সাড়া পড়ে যায়। একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া মিত্রপক্ষের আর সমস্ত বড় দেশেরই পাতাকা সায়গনে উত্তোলিত হয়। ফরাসী পতাকার পরিবর্তে আনামীরা নিজেদের 'ভাইট নাম্ পতাকা' উড্ডীন করে। সেই পতাকা রক্তবর্ণ এবং তাতে পাঁচকোণ-বিশিষ্ট একটি সোনালি তারকাচিহ্ন

বিদ্যমান। মিত্রপক্ষের সৈন্যদের জন্য নগরীর রাজপথগুলি উন্মুক্ত। পথে পথে লোকমুখে ধ্বনি, "৮৩ বছর ধরে আমরা সংগ্রাম করছি। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্। আমাদের দেশের মালিক আমরাই।"

বৃটিশ সৈন্যরা সায়গনে প্রবেশ করলো। প্রবেশের পরই সেখানকার সামরিক ক্ষমতা বৃটিশ সেনানী মেজর-জেনারেল গ্রেসীর হাতে গেল। সায়গনে পৌঁছেই তিনি আদেশ করলেন, কোন পত্রিকা সেখানে প্রকাশ করা চলবে না, কোন সভাসমিতি করা নিষিদ্ধ, মিত্রপক্ষের সৈন্যরা ছাড়া আর কেউ লাঠি তরবারি বা অন্য কোন রকম অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বেরুতে পারবে না। তারপর তিনি আরো আদেশ করলেন যে, ভাইট নাম গবর্ণমেণ্টের অধীন কত পুলিশ ও সশস্ত্র সৈন্য আছে এবং তারা কোথায় অবস্থান করছে ও কি ধরণের কত অস্ত্র আছে সমস্ত খবর মেজর-জেনারেল গ্রেসীকে জানাতে হবে।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণে ভাইট নাম গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লো। তারা আশা করেছিল যে, মিত্রশক্তি এই গবর্ণমেণ্টকে আনামী জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক গবর্ণমেণ্ট বলে বিবেচনা করবে ; কিন্তু কার্যত দেখা গেল তার বিপরীত। যাই হোক, ভাইট নাম গবর্ণমেণ্ট গ্রেসীর হুকুম মেনে চললো ; তবে তাদের হাতে তখনো ক্ষমতা রইলো ; সরকারী বাড়ীগুলি ভাইট নাম গবর্ণমেণ্টের সশস্ত্র সৈন্যরাই পাহারা দিতে লাগলো। কিন্তু প্রতি রাত্রেই দেখা যেতে লাগলো যে, জাপানীরা এবং ভারতীয় গুর্খা সৈন্যরা সশস্ত্র অবস্থায় সায়গনের রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে।

এদিকে আনামীদের হাতে যে-সকল স্থানীয় কারাগার ছিল সেগুলির ভার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিয়ে নিলেন। সেই সব কারাগারে কতক ফরাসী বন্দী ছিল, বৃটিশ কর্তারা তাদের মুক্তি দিলেন। বৃটিশ সৈন্যরা যাবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো। যে-সমস্ত এলাকায়

জাপানীদের শিবির ছিল সেই সমস্ত এলাকা ছাড়া সমগ্র মফঃস্বল অঞ্চল আনামীদের কর্তৃত্বে রয়ে গেল। সায়গনে বেসামরিক শাসনকার্য আনামী গবর্ণমেণ্টই চালাতেন, আর সামরিক কর্তৃত্ব গেল বৃটিশ প্রভুদের হাতে। ফরাসীরা তখনো পর্যন্ত মোটেই আমল পায়নি; অবশ্য সায়গনের কয়েক হাজার ফরাসী চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী সুরে 'এসিয়ার বিদ্রোহীদের' সায়েস্তা করবার কীর্তন গাইছিল; কিন্তু তাদের সুর তখনো পর্যন্ত খাদেই পড়ে ছিল, নিখাদে গিয়ে পৌঁছায়নি। তারপর বৃটিশ কর্তাদের সহায়তা পেয়ে ফরাসীদের সুর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সপ্তমে চড়লো। ইন্দোচীনের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের তাণ্ডব শুরু হলো।

এবার সংক্ষেপে ইন্দোচীনের কিছু পরিচয় দিচ্ছি। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ফরাসীরা ইন্দোচীন জয় করে তাকে এক উপনিবেশে পরিণত করে। এই উপনিবেশের লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ; তন্মধ্যে ২ কোটি ২৯ লক্ষই হলো আনামী ও কাম্বোডিয়ান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এই উপনিবেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত হয়ে শাসিত হতো। প্রথম কোচিন-চীন। লোকসংখ্যা ৪৬ লক্ষ। খাস উপনিবেশ। একজন ফরাসী গবর্ণর শাসন করতেন। কোচিন-চীনে প্রচুর ধান জন্মে। দ্বিতীয় আনাম। লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। ফরাসী আশ্রিত রাজ্য। নামে একজন সম্রাট থাকলেও কার্যত ফরাসী গবর্ণর জেনারেলের আনামী অনুচরবৃন্দই দেশ শাসন করতো। আনামেও প্রচুর ধান ফলে। তৃতীয় কাম্বোডিয়া। লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ। এটাও একটি ফরাসী আশ্রিত রাজ্য এবং একজন রাজা থাকলেও কার্যত শাসনক্ষমতা ছিল ফরাসীদেরই হাতে। চতুর্থ টংকিং। লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষ। নামে আশ্রিত রাজ্য হলেও কার্যত এর শাসক ছিলেন একজন ফরাসী রেসিডেণ্ট। টংকিং-এর রাজধানী হানয়। পঞ্চম লাওস। লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ। খাস

উপনিবেশ। একজন ফরাসী রেসিডেণ্ট শাসনকর্তা ছিলেন। দক্ষিণ চীনের উপকূলবর্তী ফরাসী উপনিবেশ কোয়াং চাউ ওয়াংও ফরাসী ইন্দোচীনের অন্তর্গত। চীনের কাছ থেকে ফরাসীরা এটাকে ইজারা নিয়েছিল। এই উপনিবেশের লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

ইন্দোচীনের জমি অত্যন্ত উর্বর। প্রধান ফসল ধান; তাছাড়া গম এবং ভুট্টাও প্রচুর জন্মে। সোনা, টিন, তামা, রাং, লোহা এবং কয়লাও যথেষ্ট আছে।

ইন্দোচীনবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৪৫ খৃস্টাব্দেই প্রথম নয়; এর আগেও তারা অনেকবার স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছে। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে টংকিং বদ্বীপ এলাকায় এবং উত্তর আনামে এক প্রবল গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে পোল-ট্যাক্সের প্রতিবাদে ইন্দোচীনে এক ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বাংলায় যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে জাতীয় জীবনে এক নতুন চেতনা আসে, ইন্দোচীনের এই আন্দোলন সেখানকার লোকের মনে তেমনই এক নবপ্রেরণা এনে দেয়। কেবল রাজনৈতিক নয়, এই আন্দোলনের ফলে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনেও নবযুগ আসে। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইন্দোচীনে ফরাসীশাসন অবসানের জন্যে কয়েকবার বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র হয়। ১৯২০ খৃস্টাব্দে সেখানে প্রথম একাধিক রাজ-নৈতিক দল গড়ে ওঠে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে ইন্দোচীন কম্যুনিস্ট পার্টি জন্মলাভ করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট পার্টি সেখানকার কিষাণদের সংগঠিত করে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে প্রবল দমননীতির আশ্রয় নেন। ১৯৩৪-৩৫ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা কতকটা ফলবতী হয় এবং তার ফলে ফরাসী ইন্দোচীনে জাতীয় বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গঠিত হয় এবং

একাধিক সংবাদপত্র বেরয়। ইন্দোচীন ঔপনিবেশিক পরিষদে এবং হানয়ের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে কয়েকজন বিপ্লবী নেতা নির্বাচনে জয়লাভ করে আসন পান। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে আবার দমননীতি শুরু হয়। তারপর ইন্দোচীন জাপানীদের দখলে যায়। কিন্তু জাপ-দখলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে গেরিলারা তৎপর হয়ে ওঠে। ইন্দোচীনের জনযোদ্ধারা দু'বার জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দে সেখানকার সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলে এক স্বাধীনতা সংঘ গঠন করে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে এই স্বাধীনতা সংঘই একটি ইস্তাহারে গণপরিষদ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানায় এবং একটি শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী গঠনের জন্যে ইন্দোচীনের সর্বসাধারণকে আবেদন করে। এই স্বাধীনতা সংঘের প্রধান শক্তি ছিল আনাম ও টংকিংএ; তবে সমগ্র ইন্দোচীনেই এই সংঘের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল।

সুতরাং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে জাপানীদের উস্কানী আছে বলে সাম্রাজ্যবাদীরা যে প্রচারকার্য চালায় তা অমূলক। ইন্দোচীনের অধিবাসীরা বহুদিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। তাই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে জাপানী ফাসিস্তবাদ যখন তাদের ঘাড়ে চেপে বসে তখন তারা এসিয়াবাসী বলে জাপানীদেরও রেহাই দেয়নি; তাদের বিরুদ্ধেও তারা গেরিলাযুদ্ধ চালায়। বরঞ্চ ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরাই জাপানের সাহায্য নিয়েছে; তা না হলে জাপানের আত্মসমর্পণের পরও সায়গনের পথে সশস্ত্র বৃটিশ ও জাপানী সৈন্যরা পাশাপাশি থেকে টহল দেয় কি করে!

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর রয়টারের একটি খবরেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়:

"দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া কমাণ্ডের ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেডের

সিগন্যাল শাখার নন্‌কমিশন্‌ড বৃটিশ অফিসারগণ 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার নিকট এক পত্রে জানিয়েছেন যে, পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিনের কাছে তাঁরা নিম্নের পত্রখানি প্রেরণ করেছেন :—

'জাতীয়তাবাদী ভাইট মিনের বিরুদ্ধে আমরা জাপানী ও ফরাসী সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি মনে হয়। কিন্তু এই মিলনের উদ্দেশ্য কি ? জাপানী সৈন্যদের আমরা নিরস্ত্র করছিনে কেন ? ইন্দোচীনে বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা গবর্ণমেণ্টের নীতি সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই।'

বৃটিশ সৈন্যরা সায়গনে পৌঁছাবার পর সেখানে কি অবস্থা দাঁড়ায় আগেই বলেছি। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর সকালবেলা অবস্থার একেবারে পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রত্যূষে প্রায় ৪টার সময় গুলীর আওয়াজ হয়। রাস্তায় জাপানীরা এবং গুর্খারা তখনো টহল দিচ্ছে। কিন্তু রাস্তাগুলি দিয়ে চলেছে লরীতে করে ফরাসী সৈন্যদল। তাদের কাছে সব রকম অস্ত্রই আছে, জাপানী রিভলবার, মেশিনগান, ছোরা এবং বৃটিশ টমিগান। সকাল ৬টা পর্যন্ত মাঝে মাঝে গুলী চললো। ফরাসী সৈন্যরা ভাইট নাম গবর্ণমেণ্টের বাড়ী ও থানাসমূহ দখল এবং সেইসব বাড়ীর লোকজনকে বন্দী করলো। আনামীরা খানিকটা বাধা দিল ; কিন্তু অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে তারা সুবিধে করে উঠতে পারলো না। তাদের পরাজয় হলো। ফরাসী পক্ষের খুব কম লোকজনই হতাহত হলো, কিন্তু আনামীদের বহু লোক হতাহত হলো। তবে আনামীরা এসব জানতে দিল না ; হতাহতদের তারা হাসপাতালে না পাঠিয়ে গোপনে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

বন্দী আনামীদের প্রতি দারুণ অত্যাচার চললো। তাদের হাতজোড় করে বসিয়ে রাখা হতো, নরনারী ও শিশুদের এক সঙ্গে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। সামান্য একটু

এদিক-সেদিক হলেই ফরাসী প্রহরীরা নির্দয়ভাবে তাদের লাথি মারতো ও প্রহার করতো। সব চেয়ে লজ্জার বিষয় এই যে, ফরাসী কর্তৃপক্ষকে যখন একজন বিদেশী সাংবাদিক জিগ্যেস করেন যে, বন্দীদের ওপর এরূপ নির্মম অত্যাচার করা হয় কেন? তখন তার উত্তরে তাঁরা বলেন, "নেটিবদের প্রতি এরূপ করাই আমাদের রীতি। সেটা নতুন নয়, বহুদিন থেকেই এরূপ চলে আসছে।"

ফরাসী কর্তারা বিজয়ী হয়েই ভাইট নাম পতাকা নামিয়ে নিজেদের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। মনে হলো সবই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে; কিন্তু একদিন মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ফরাসী বিভাগের বড়কর্তা কর্নেল সেদিল সাংবাদিকদের কাছে বললেন, "না, গোলমাল এখনো সামান্য কিছু আছে। কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না; ভাইট নাম গবর্ণমেণ্ট আগে যাঁরা চালাতেন তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার সুযোগ দেওয়া হবে; ইন্দোচীনের ভাবী গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা চলবে।" কিন্তু তাঁর কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না; কেননা আনামীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

ফরাসী সৈন্যদের এভাবে আকস্মিক আবির্ভাব ও ক্ষমতালাভের পিছনে যে বৃটিশ সমর্থন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এর সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করে একেবারে ভালো মানুষ সেজে বসলেন। একথা একটি শিশুও বুঝতে পারে যে, যেখানে জেনারেল গ্রেসীর হাতে সমস্ত সামরিক কর্তৃত্ব সেখানে তাঁর অজ্ঞাতে বা অনুমোদন ছাড়া এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে যেতে পারে না।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতাকামীদের দমনের জন্যে যাদের নিয়োজিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে আগে সমরবন্দী ছিল। এছাড়া কতগুলি গুণ্ডা প্রকৃতির ঔপনিবেশিক সৈন্যকেও এই কাজে লাগানো হয়েছিল।

ইন্দোচীন জাপ-কবলে থাকা সত্বেও এদের অনেকেই বন্দীশালার বাইরে ছিল; কাজেই এই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এরা জাপানীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে বেড়াত। সামান্য একটা অংশ ছাড়া ফরাসী ঔপনিবেশিক বাহিনীর সৈন্যরা জাপানীদের বিরুদ্ধে কখনো লড়াই করেনি। অথচ আনামীরা এবং ইন্দোচীনের অন্যান্য অংশের গেরিলারা আগাগোড়া দেশের মুক্তির জন্যে, নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। যুদ্ধের সময় ইন্দোচীনে জাপানীদের সঙ্গের ফরাসীদের যে সখ্য ছিল এই স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের সময় সেটাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ফরাসী সৈন্যবোঝাই লরীগুলিকে জাপানীরা চালাচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ তারাই আবার অভিযোগ করে যে, আনামীদের ভাইট নাম গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষক হলো জাপানীরা। কিন্তু যে ভাইট মিন দল ভাইট নাম গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করে সেই দলের যাঁরা আসল নেতা তাঁরা সবাই আগাগোড়া ফাসিস্তবিরোধী এবং প্রথম থেকেই তাঁরা জাপানীদের বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁদের সাহায্য করতে জাপানীরা অগ্রসর হবে একথা সহজে বিশ্বাস হয় না।

সায়গন ফরাসীরা দখল করলেও ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতেই থাকে। সেখানকার মুক্তিফৌজ শহর ছেড়ে পল্লী অঞ্চলে চলে যায় এবং সেখান থেকে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালায়। এদিকে বৃটিশ প্রভুরা নিরপেক্ষতার জীর্ণ মুখোসটা পর্যন্ত ফেলে দেন এবং সরাসরি সৈন্য ও সমরোপকরণ দিয়ে ফরাসীদের সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীনের স্বাধীনতার দাবীকে ধাপ্পা দিয়ে দাবিয়ে রাখতে না পেরে মারণাস্ত্রের সাহায্যে সেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়।

ইন্দোনেসিয়া

ইন্দোনেসিয়ায়ও ইন্দোচীন-পর্বেরই পুনরভিনয় হয়। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা ডক্টর সুকর্ণকে প্রেসিডেণ্ট করে ইন্দোনেসিয়ায় যখন এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রমাদ গনে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মাভৈ হুঙ্কারে সেখানে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। এখানেও সেই একই সুর তোলা হয় যে, জাপানীদের প্ররোচনায়ই ইন্দোনেসিয়ানরা ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু ইন্দোনেসিয়া বা জাভার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন নয়। ওলন্দাজ কর্তৃত্ব ও বিদেশী শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ইন্দোনেশিয়ানরা বহুদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছে।

ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এক বিরাট এলাকা। এর ক্ষেত্রফল ৭৩৫২৬৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৭ লক্ষ। মালয়ের শেষ প্রান্ত থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ বিস্তৃত। তুলনা করলে দেখা যায়, বোর্ণিও দ্বীপের যে অংশ ওলন্দাজ অধিকারে তার ক্ষেত্রফল প্রায় ফ্রান্সের ক্ষেত্রফলের সমান, আর নিউগিনির ওলন্দাজ অংশ জাপানের চাইতেও বড়। এই বিস্তীর্ণ এলাকার লোকসংখ্যার ৫ কোটি ৯০ লক্ষ লোকই হলো দেশীয় অধিবাসী, প্রায় ২৩ লক্ষ চীনা, ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ইওরোপীয় এবং এসিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে আগত ১ লক্ষ ১২ হাজার। ইওরোপীয়দের মধ্যে অধিকাংশই বাস করে জাভায়, তারপর সুমাত্রায়। অন্যান্য দ্বীপে ইওরোপীয়ের সংখ্যা খুবই কম। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের পরই এই সকল দ্বীপে ইওরোপীয়রা প্রধানত বসবাস করতে আরম্ভ করে। এই দ্বীপপুঞ্জের জমি অত্যন্ত উর্বর এবং খনিজ সম্পদও যথেষ্ট। নিম্নলিখিত জিনিসগুলির জগতে মোট যত

উৎপাদন হয় তার শতকরা এই হারে যোগায় ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ :—

রবার শতকয়া ৩৩ ভাগ, টিন শতকরা ১৬ ভাগ, চা শতকরা ১৬ ভাগ, চিনি শতকরা ৯ ভাগ, চাল শতকরা ৬ ভাগ, বক্সাইট শতকরা ৫ ভাগ, সয়াবিন শতকরা ৩ ভাগ এবং পেট্রোলিয়াম (অপরিশোধিত) শতকরা ২॥ ভাগ।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জাভার স্থানই শীর্ষে। এই দ্বীপের লোকসংখ্যা চার কোটিরও বেশি। শিক্ষার দিক দিয়েও জাভাবাসীরা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে জাভায় তীব্র অসন্তোষ অনেকদিন আগেই দেখা দেয়। জাপানীরা জাভা দখল করবার পরই যে সেখানে লোকের প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে এমন নয়। ১৯২৬ খৃস্টাব্দেই বাটাভিয়ায় একটা ছোটখাট অভ্যুত্থান হয়েছিল। সেই অভ্যুত্থানের মূলে ছিল সেখানকার কম্যুনিস্টদের চেষ্টা। অবশ্য জাভার জাতীয়তাবাদীরাও তাতে যোগ না দিয়েছিল এমন নয়। বিদ্রোহীরা বাটাভিয়ার সমস্ত টেলিফোন লাইন দখল করে বসেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন হয়ে গেল। বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেপ্তার করে নিউগিনির বোভেন দিগোল-এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তাঁরা সেখানে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে লাগলেন।

এই বিদ্রোহেরও আগে গেলে দেখা যায়, ১৯১২ খৃস্টাব্দেই ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর ইন্দোনেসিয়ায় যাঁরা জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের অনেকেই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দীর্ঘকাল নানারূপ নির্যাতন সহ্য করেছেন। ইন্দোনেসিয়ান রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর স্থকর্ণকে দু'বার এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হাতাকে একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। তারপর ইন্দোনেসিয়ান মন্ত্রিসভার প্রচারসচিব

সরিফউদ্দীনও জীবনে কম লাঞ্ছনা পাননি। তিনি একজন কম্যুনিস্ট। তাঁর বয়েস চল্লিশের কম। তিনি বাটাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট। ছাত্রজীবনে তিনি বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন এবং বি-এ পরীক্ষায় পাশ করবার কয়েকদিন পরেই আপত্তিকর ইস্তাহার প্রচারের অভিযোগে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৮ মাস কারাদণ্ড দেন।

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জাপানীরা যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি তখন জাভার সরকারী অর্থনৈতিক বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কম্যুনিস্টরা তখন ফাসিস্তবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে বাধাদানের নীতি সমর্থন করে। সরিফউদ্দীন সেই সময় একটি ওলন্দাজ গুপ্তদলে যোগ দেন। জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রচার করবার জন্যে ওলন্দাজরাই সেই দলের অর্থ যোগাত।

নেদারল্যাণ্ড ইস্ট ইণ্ডিজ অর্থাৎ ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গবর্ণর জেনারেল ভ্যান মুক-এর সঙ্গে সরিফউদ্দীনের এক সময় এতটা সৌহার্দ্য হয়েছিল যে ভ্যান মুক বলেছিলেন, সরিফউদ্দীনের কিছু হলে তাঁর স্ত্রীপুত্রপরিজনকে তিনি নিজে রক্ষা করবেন।

জাভা জাপানীদের দখলে থাকাকালে সরিফউদ্দীন গুপ্ত অবস্থায় থেকে সেখানকার প্রতিরোধ আন্দোলনে নানাভাবে সাহায্য করেন। জাপানী গোয়েন্দারা তাঁকে ধরে ফেলে এবং তাঁর ওপর নানরকম অত্যাচার চালায়। তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়; ইতিমধ্যে জাপানীদের আত্মসমর্পণ করতে না হ'লে জাপানী গুলীতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হতো।

সরিফউদ্দীন একজন উদ্যমশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইন্দোনেসিয়ান মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রভাব যথেষ্ট এবং বামপন্থীদের তিনি প্রতিনিধি।

সরিফউদ্দীনের মতো আরো অনেক নেতা আছেন যাঁরা জাপানীদের বিরুদ্ধে জাভার প্রতিরোধ আন্দোলন চলিয়াছিলেন। সুতরাং জাপানীদের প্ররোচনায় পড়ে তাঁরা ইন্দোনেসিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন একথা প্রচার করা একমাত্র বাতুলের পক্ষেই সম্ভব।

ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে রয়েচে সেখানকার সর্বসাধারণের সমর্থন। তা না হ'লে এই আন্দোলন এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতো না। ইন্দোনেসিয়ান রিপাব্লিকের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যতটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, ইন্দোনেসিয়ান রিপাব্লিকান গবর্ণমেণ্ট তাঁদের নিজেদের 'গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের' আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই দাবী করেন। 'গণরাজ' ও 'রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ' এই দুটি নীতি তার ভিত্তি। ইন্দোনেসিয়ার নতুন শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, জনকল্যাণকর ও প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয় সম্পদে পরিণত করা হবে। নদনদী, ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে এবং জনগণের কল্যাণকার্যেই তা ব্যবহৃত হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইন্দোনেসিয়ার আন্দোলন একদল জমিদার ও পুঁজিবাদীর আন্দোলন নয়, তা জনগণেরই মুক্তিসংগ্রাম। নতুন শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে তাবা স্বাধীনতার আস্বাদ পায় বলেই তা রক্ষার জন্যে তারা সর্বস্ব পণ করে। ওলন্দাজ সাম্রাজ্য পুনর্বহালের জন্যে সুরাবায়া এবং বাটাভিয়ায় বৃটিশ প্রভুরা অকাতরে আধুনিক মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেন, বিমান থেকে বোমা ফেলেন। তা সত্ত্বেও ইন্দোনেসিয়ানরা দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ার ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের গণজীবনে যে মুক্তির

প্রেরণা এসেছে, এসিয়ার পরাধীন দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের মূলেও রয়েচে সেই একই প্রেরণা। স্বাধীন দেশে গণমুক্তির আন্দোলনকে যখন বলপ্রয়োগ ক'রে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয় তখনই বাধে সেখানে গৃহযুদ্ধ; আর পরাধীন দেশগুলি যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি চায় তখনই বাধে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মুক্তিকাম জাতির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। তাই চীনে যখন এক নতুন গণতান্ত্রিক শক্তি পুরাণো অচল ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে উদ্যত তখন সেখানে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। আর ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ায় যখন জরাজীর্ণ ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন তখন তাকে রক্ষার জন্যে দেখা যায় বৃটিশ অস্ত্রপ্রয়োগ। যুদ্ধজয়ের জন্যে যারা ছলনা ক'রে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বুলি আউড়েছিল, আজ যখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী তারই জন্যে দাবী উঠেছে তখন সেই কপটের দল ভীত, সন্ত্রস্ত। কিন্তু বিশ্বের গণমুক্তির এই দাবী দুর্নিবার, সে তার পথ ক'রে নেবেই। তাই দুনিয়ার মানচিত্র দেখে রণজিৎ সিংহেরই মতো আবার হয়তো কেউ বলবে 'সব লাল হো জায়েগা।' সে লাল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতো পৃথিবীর বুকে কলঙ্ক লেপন করবে না, তাজা রক্তের মতো সে লাল আনবে পৃথিবীর মুমূর্ষু মানবের জীবনে নতুন প্রাণ, অফুরন্ত শক্তি ও অনাবিল আনন্দ।



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি (তৃতীয় সং) ৩৲ — পাষাণপুরী ২।৹
জলসাঘর — ৩৲ — তারকা অপর্ণা (যন্ত্রস্থ)
ধাত্রী (যন্ত্রস্থ) মন্বন্তর ৪।৹ — পঞ্চগ্রাম ৩৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দৃষ্টি প্রদীপ ৩৲ — পথের পাঁচালী ৫৲
অনুবর্তন ৪৲ — অভিযাত্রিক ৪৲
কণ্ঠভঙ্কুর ২।৹
তৃণাঙ্কুর ২৷৹

প্রবোধকুমার সান্যালের

শ্যামলীর স্বপ্ন ৪৲ — জলকল্লোল ৪।৹
অগ্নিকা ২৲ — আদি ও অকৃত্রিম ৩।৹

মন্মথনাথ ঘোষের

বাঁকাস্রোত ৪।৹ — অহল্যার স্বর্গ
(দ্বিতীয় সংস্করণ)

গজেন্দ্র কুমার মিত্রের

প্রভাত সূর্য্য ২৷৹ — ঝুমুর ৩।৹
ত্রিয়াশঙ্কর প্রেম (তৃ সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

রামনাথ বিশ্বাসের

অন্ধকারের আফ্রিকা ৩।৹ — পৃথিবীর পথে (যন্ত্রস্থ)

অনুরূপা দেবীর — নিরুপমা দেবীর
মহানিশা ৪।৹ — শ্যামলী ৪।৹
চক্র (যন্ত্রস্থ) — দেবত্র (যন্ত্রস্থ)

[illegible]